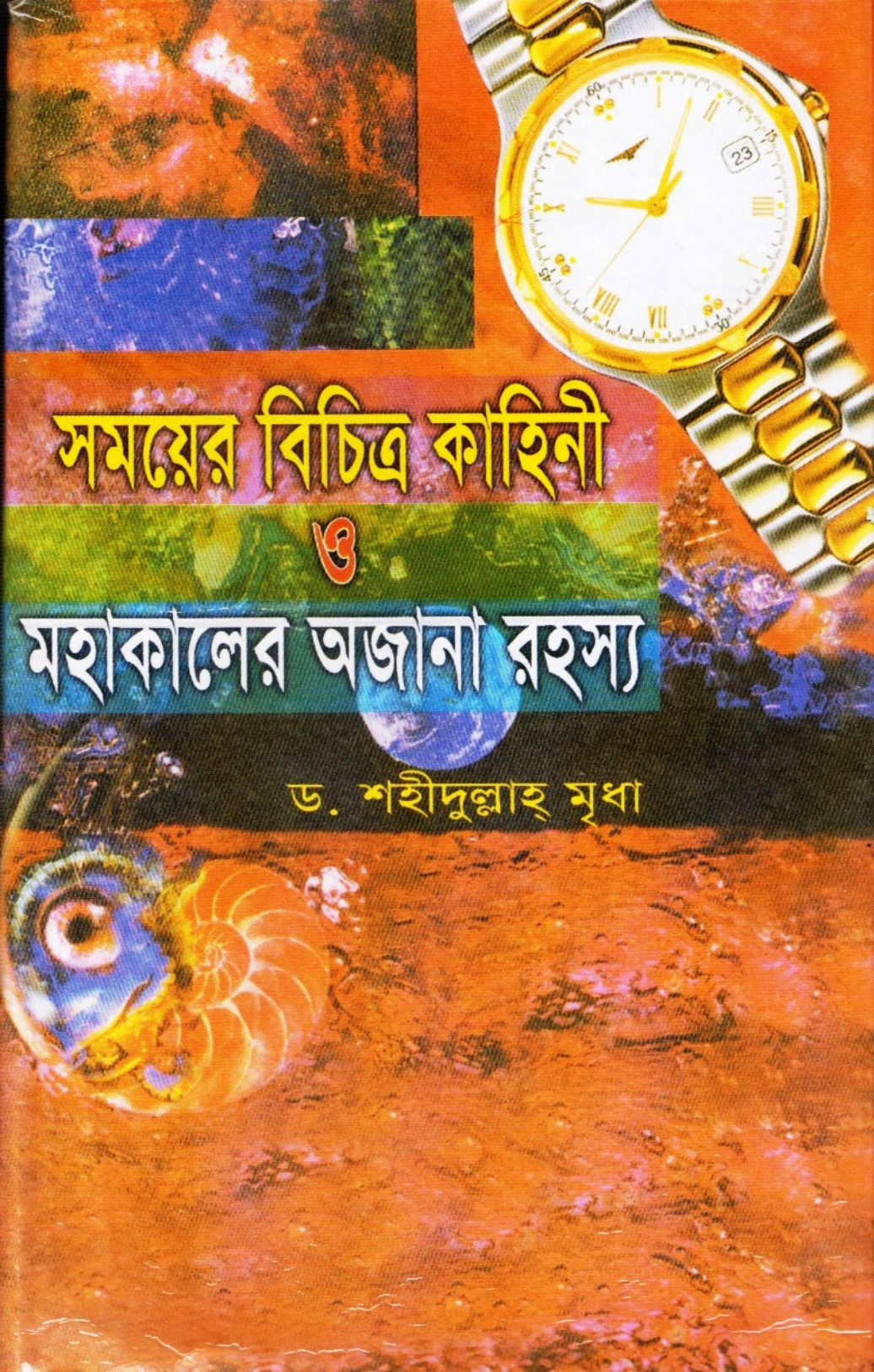
সময়ের বিচিত্র কাহিনী
ও
মহাকালের অজানা রহস্য
ড. শহীদুল্লাহ্ মৃধা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সময়ের বিচিত্র কাহিনী
ও
মহাকালের অজানা রহস্য

ড. শহীদুল্লাহ্ মৃধা

এম. এসসি; এম. ফিল; পিএইচ. ডি (মস্কো)
পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো (ইসি, জার্মানি)
প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা
মেম্বার : নিউইয়র্ক একাডেমী অব সায়েন্স (যুক্তরাষ্ট্র)
ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি ফাউন্ডেশন (কানাডা)

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮৮

প্রকাশক
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৩৮৪৪৩

গ্রন্থস্বত্ব
মৃধা সাবির শহীদুল্লাহ
মৃধা ফাতিমা জোহরা

প্রচ্ছদ
এস. এম. মামুন

কম্পোজ
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন
লক্ষীবাজার, ঢাকা ১১০০

রচনাকাল
৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৮-২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৮
সংযোজনা : ১৬ নভেম্বর-১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

মূল্য : ১২০.০০

Someyer Bichitro Kahini O Mohakaler Ajana Rohosshay (Mysteries of Time) in Bengali by Dr. Shahidullah Mridha. Published by Gyankosh Prokashoni, 38/2-Ka Banglabazar, Dhaka, Bangladesh. Revised Edition : February 2000. Price : Taka 120.00 Only.

পরিবেশক

ঢাকা : জ্ঞানকোষ, সোবহানবাগ; জ্ঞানকোষ, মমতাজ প্লাজা, ধানমন্ডি
নীলক্ষেত : ডলফিন বুক সেন্টার, ফরিদা কর্পোরেশন, ফ্রেন্ডস বুক কর্নার
নিউমার্কেট : বুক ভিউ, বুক মার্ট
চট্টগ্রাম : কারেন্ট বুক সেন্টার, জলসা সিনেমা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রফেসর ড. অঞ্জন কুণ্ডু

সাহা ইনসটিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স
১/এ এফ বিধাননগর, কলিকাতা ৭০০০৬৪

প্রিয় সুজন। ১৯৭৪ সনে মস্কোতে পড়াশুনার সময় আমাদের বন্ধুত্বের শুরু। তারপর দীর্ঘ ২৫ বৎসর সময় কালের ব্ল্যাকহোলে অতলে হারিয়ে গেছে। মস্কভা নদী আর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে; শুধু সেই হারানো দিনগুলির স্মৃতি আজও মানসপটে অটুট রয়েছে। লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসার মিস্‌কিয়েভিচ, অ্যাকাডেমিসিয়ান স্পিরকিন, ব্ল্যাকহোল, রিলেটিভিটি, ট্যাকিয়ন, বিগব্যাঙ সব মিলে মিশে গেছে মহাকালের বুকে। তবুও দূর মহাকাশের মিটিমিটি তারাটির মত জ্বলজ্বল করুক মোদের স্মৃতি (স্বাতী) নক্ষত্রের ম্লান আলোর শুভ দৃষ্টি।

বেঁচে থাক অমর কীর্তি : বন্ধুত্ব, প্রীতি, সৌহার্দ্যতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর হৃদয়ের অপার অনুভূতি—মানবপ্রেম ও নিখাদ ভালোবাসা। আবার দেখা হবে বন্ধু নীহারিকা লোকে জন্ম-জন্মান্তরে, ছায়াপথে—দূরকালের অরন্যছায়াতলে। অপেক্ষা করো। কি পেয়েছিলাম? কতো মূল্যবান বন্ধুত্ব, মূল্যবান প্রেম; সবই চলে যায় তবুও যায় না, রেখে যায় এমন কিছু যা সোনার পাত্রে ধরে রাখার যোগ্য। কতো অমৃতভরা মুহূর্ত এসেছিলো এ দীর্ঘ জীবনে। আজ তা কেবল দূরসৃত কাহিনী-স্বপ্ন। সময়ের তীরে বসে এসব কথা অনেকদিন আগে থেকে ভাবছি এবং যারা আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য, তাদের ভাষা-চিন্তা অনুধাবন করছি। নিত্য শুভার্থী, মৃধা ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে ॥
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি-আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

"পূজা" (৩৩৭)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

All kings and all their favourites,
All glory of honours, beauties, wits,
The sun itself, which makes times, as they pass,
Is elder by a year, now, that it was
When thou and I first one another saw :
All things to their destruction draw,
Only our love hath no decay;
This, no tomorrow hath, not yesterday;
Running it never runs from us away,
But truly keeps his first, last, everlasting day.
from *"The Anniversary"* by *John Donne*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থ পরিচিতি

বাংলাদেশে সময়ের উপর বিষয়বস্তু নিয়ে এটিই প্রথম বই। অন্তত: সময়ের কাহিনী, রহস্য এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতোপূর্বে পশ্চিমে হাজারটির উপর পুস্তক প্রকাশিত হলেও এদেশে একটিও হয়নি।

প্রাচ্যের অধিবাসী আমরা বাঙ্গালীরা সময়ের মূল্য দেইনা, তাই আমরা এত অনগ্রশর। যে জাতি সময়ের মূল্য দেয় তারা সামনে এগিয়ে যায়—উন্নতির চরম শিখরে। তারা সময়ানুসারে কাজ করে, যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেয়, তাই তারা সময়ের ক্রীতদাস হয়ে সময়ের পেছনে দৌঁড়ায়। আর আমরা ঠিক তার উল্টো। ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস সব চাই, তবে তা পরিশ্রম না করে, সময়ের পেছনে না দৌড়িয়ে, কল্পনায় তাই আমরা সময়ের প্রভুর মত নিজেকে ভাবি। সময় যেন আমাদের পেছনে দৌড়োয়।

সময় কার? কারোরই নয়। তবে প্রত্যেকের নিজস্ব সময় রয়েছে। আপনার দেহের প্রতিটি অঙ্গ, কোষের রয়েছে নির্দিষ্ট ঘড়ি। বিশ্বের প্রতিটি পরমাণু ও তার অভ্যন্তরে রয়েছে নিজস্ব ঘড়ি। সবই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে। তারপর থেমে যায়।

এদিকে বিশ্বের সময় যা দেশকালের ভেতরে সম্পৃক্ত রয়েছে তা কিন্তু বিরামহীনভাবে বয়েই চলেছে নদীর স্রোতের ন্যায় কখনও না থেমে। বেহেস্তে সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার কিন্তু মনে হয়, বেহেস্তের বাইরের দেশে সময় অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকবে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিরকালই অনন্তের দিকে অসীম দিগন্তে প্রসারিত হতে থাকবে! দেবলোকে সময় খুব দ্রুত বয়। ওদের মিনিট আমাদের লক্ষ বৎসরের সমান।

সময়ের প্রসারণ, সময়ের জালের ন্যায় বুনন, হাইপার টাইম, সুপারটাইম, অনন্য বিন্দুতে সময়ের হারিয়ে যাওয়া এমনি কত ধরনের যে সময়ের রহস্য রয়েছে।

সময় আলোর গতিবেগের সমান বেগে চলতে পারে, তখন স্থানকে এক রকম দেখাবে, তার গতির নিচের বেগে চললে স্থানের বস্তুজগত অন্যরকম দেখাবে। আর ট্যাকিয়ন গতিতে আলোর গতির চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি দ্রুত চললে পর সময় উল্টোদিকে চলবে এবং আপনি একই সময়ে মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুতে একসাথে উপস্থিত থাকতে পারবেন, একই সাথে প্রতিটি বিন্দু দেখবেন। সেখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। মাত্র একটি সরল লাইন বর্তমান। এমনকি আলোর গতিবেগের সমানে চললেও সময়ের অভ্যন্তরের সব কিছু বেরিয়ে আসবে।

বিগব্যাঙ থেকে স্থানের সঙ্গে কালের জন্ম। শুরু এর যাত্রাপথ। প্রশ্ন হলো এর আগে সময় কোথায় ছিলো? এসব প্রশ্নের জবাব নেই। তা খোঁজা হচ্ছে। এই বইয়ে সে সবের আলোচনা আছে। টাইম ট্রাভেল সম্ভব কিনা? এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাবার সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

পথ আছে কি? আপনি নিজেই একটা বিশ্ব বানাতে পারেন। বহু মহাবিশ্ব পাশাপাশি অবস্থান করছে। এমনকি একটির ভেতর দিয়ে অন্যটি চলেও যাচ্ছে, তবু সংঘর্ষ বাঁধছেনা।

মাত্র দু'বিঘে, দু'কাঠা জমির জন্য বাংলাদেশে কত মামলা, কত খুনোখুনি। অথচ মহাবিশ্বে কত জায়গা পড়ে রয়েছে। সময়ের তালে তালে সেই সব জায়গায় আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে হেঁটেছি।

মানবজাতি এ পর্যন্ত সময়কে নিয়ে যে কত ভেবেছে। তার ঐসব চিন্তার কিছুটা পরিচয় সংক্ষেপে সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য বক্ষ্যমান নিবন্ধে উপস্থাপনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মাত্র উনিশটি (!) অধ্যায়ে আড়াই শতাধিক পৃষ্ঠায় তা বিন্যস্ত করা হয়েছে। পাঠক, আসুন আমরা সময়কে নিয়ে কিছুটা ভাবি, তার রহস্য বুঝতে চেষ্টা করি; তার স্বরূপ উদঘাটন করতে প্রয়াস চালাই। আসুন আমরা সময়কে মূল্য দেই—সময়ের অপব্যবহার না করি। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করি সময়ের রথে দৃপ্তপদে।

সময়ে কাল নিজেই বলে দেবে তার রহস্যের কাহিনীগুলি।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. শহীদুল্লাহ মৃধা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইলেকট্রোকেমিক্যাল এনার্জী টেকনোলজি ল্যাবরেটরী'তে হাইড্রোজেন এনার্জী এবং ফুয়েল সেল গবেষণায় তিনি নিয়োজিত। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ যা মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ তার প্রতিরোধার্থে তিনি রাসায়নিক প্রযুক্তির সঙ্গে জীব প্রযুক্তিগত টেকনিকের সমন্বয় সাধনে উপযুক্ত রসায়ন এবং ফিল্টার তৈরির গবেষণা চালাচ্ছেন।

তিনি 'নিউইয়র্ক একাডেমী অফ সায়েন্স' এবং কানাডাভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল এনার্জী ফাউন্ডেশনে'র এডভাইসরী বোর্ডের একজন সদস্য। তিনি ১৯৯৩ সনে কোরিয়াতে ৫ম আন্তর্জাতিক পাওয়ার কনফারেন্সের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি সেসনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'মার্কিজ হুজ হু ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড' এবং আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউটের 'জীবনী-বিশ্বকোষে' এবং 'বাংলা একাডেমী লেখক অভিধানে' তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ড. মৃধা 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞানকোষের' একজন সংকলক এবং ইসলামী ফাউন্ডেশানের 'ইসলামী বিশ্বকোষ', তুরস্কের 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামের' কন্ট্রিবিউটর স্কলার আর বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির 'ন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অফ বাংলাদেশ' এর বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হচ্ছে—দেশে ৩০টি এবং বিদেশে ৩০টি; জনপ্রিয়-বিজ্ঞান প্রবন্ধের সংখ্যা শ'য়ের বেশি এবং জনপ্রিয় নিবন্ধ শতখানেকের মত। তিনি বহু সংস্থার সম্পাদক, রিভিয়্যুর এবং পত্রিকার বিজ্ঞান লেখক।

ড. মৃধার এ পর্যন্ত ১৫টি বই প্রকাশিত। যেমন : *শতাব্দীর অভিশাপ এইড্‌স; গ্যাসের কথা; হাইড্রোজেন এনার্জী; ফুয়েল সেল টেকনোলজী; মহাস্থবির শীলভদ্র; বঙ্গোপসাগর* (৩ খণ্ড) : *সমুদ্র বিজ্ঞান; জীব সমুদ্র বিজ্ঞান; মানুষ ও ইতিহাস; বোসনিয়া; চেচনিয়া; হোজ্জা নাসিরুদ্দীন; মাধ্যমিক রসায়ন; গ্লাস টেকনোলজী; বাংলাদেশের জলাভূমি* এবং *ডায়াবেটিস কেয়ার উইথ হার্বস*।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই "বঙ্গোপসাগর"—২য় খণ্ডের জন্য (জীব সমুদ্রবিজ্ঞান) তিনি বাংলা একাডেমী আয়োজিত 'হালিমা-শরফুদ্দিন বিজ্ঞান লেখক পুরস্কার' (১৯৯৬) অর্জন করেছেন। পরমাণু শক্তি কমিশনের মুখপত্র 'পরমাণু পরিক্রমা', 'বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট' এবং বিজ্ঞান জার্নাল 'নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশনের' সম্পাদনা-বোর্ডের তিনি সদস্য।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের ২৬ মে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার শ্রীরামপুর গ্রামে শহীদুল্লাহ মৃধার জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে তিনি মস্কো গমন করেন এবং মস্কোর 'রাশিয়ান রসায়ন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' হতে ১৯৮২ সালে ডক্টরেট হন। দেশে ফিরে ১৯৮৩ সালে পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে পিএসও হন।

১৯৯১-১৯৯২ সালে ড. মৃধা ইউরোপীয় কমিশনের পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশীপে জার্মানীর ডারমস্টাড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করেন।

ব্যক্তি জীবনে ককেশীয় স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা নিয়ে মহাখালী পরমাণু কলোনীতে তিনি বাস করেন। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে দশ হাজার বই রয়েছে। তিনি একজন মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধিৎসু এবং পুস্তকাসক্ত ব্যক্তি। ড: মৃধা পেশাগত ও সমাজকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য।

ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে জীবন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন তার গবেষণার বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

প্রাক-কথন

অতীতে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনটিই ভবিষ্যতে ঘটবে এ ধারণা ঠিক নয়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্চিত হয়ে আমি ঘোষণা করি যে আগামীকাল সূর্য উঠবেই, এটা চিরন্তন সত্য নহে—এটা হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোত্থেকে সৃষ্টি হয়েছে? কেমন করে সে তার যাত্রাপথ শুরু করেছে? মহাবিশ্বের শেষ পরিণতিটা কি? আদৌ কি শেষ দিন আসবে? যদি তাই, তাহলে তা কেমনে এবং কবে হবে এসব প্রশ্নের জবাব আজও আমাদের হাতে নাই। সময়ের বিচিত্র কাহিনীতে মহাকালের এই সব অজানা রহস্যগুলির সরল আলোচনা চালাতে প্রয়াস পেয়েছি শুধু। মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সময় বা কাল, মহাকাল, দেশ-কাল; সময় সম্পর্কে প্রাচীন কালে এবং বিংশ শতাব্দীতে কি ধারণা; মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে সময়ের যাত্রা হল শুরু; পরমাণু; কণিকা জগতে সময়ের হালচাল : সময় মাপার নীতি—ঘড়ির ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি সনের জন্মকথা; বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের সর্বশেষ মতবাদ, মহাকাল ও স্টিফেন হকিং এবং সর্বশেষে বর্তমান সময়ে জীববিজ্ঞান ও মনোদর্শনে সময়ের ধারণা দেহছন্দ ও জীবনছন্দ এ সব বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন বিশ্বে সময় সম্পর্কে যেমন কিছু আজব তথ্য এখানে সংযোজিত হয়েছে ঠিক তেমনি গত একদশকে বিকশিত কিছু তত্ত্ব যেমন সময়ের দিক আছে কি, থাকলে কোনদিকে উহার গতি? সত্যিই কি কেউ ব্ল্যাকহোল থেকে ফিরে আসতে পারবে না? এ অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি কি আমাদের মহাবিশ্ব? নিজেই কি একটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করতে পারবেন, এমনি ধরণের কিছু আশ্চর্য্য তথ্যও এতে সংযোজিত হয়েছে।সময় সম্পর্কে আধুনিক কালের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা আলোচিত হয়েছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত "সময় বা কালের" ধারণা সব বিবৃত করা হয়েছে কোন কিছু বাদ না দিয়ে। আমরা চেষ্টা করেছি সময়ের ইতিহাসকে বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ করতে। এটি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ এবং এটি পাঠে চিন্তার খোরাক যোগাবে ও চেতনার ক্ষেত্রকে করবে দেশকালে প্রসারিত। আমাদের জীবনে 'সময়' এক বিরাট জিনিস, সেই সাথে সবচেয়ে কঠিন হল সময়কে জানা বা বুঝা। এ ব্যাপারে সাহায্য করতেই আমরা চেষ্টা করেছি।

পশ্চিমে প্রতি দু'মাসে ১টি করে বই বের হয় সময়ের উপর। ইদানীং কিছু ভালো ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে একটি বইও আমরা পাইনি না বাংলায় না ইংরেজিতে। পত্র পত্রিকায় বই গুলির ওপর সমালোচনা পড়েই বুঝে নিতে

www.pathagar.com

হয়েছে তার বিষয়বস্তু। সময় এদেশেও আবহমান কাল ধরে প্রবাহমান। মহাকাল তার করালগ্রাস এদেশের উপরও প্রসারিত করেছে সেই সৃষ্টিলগ্ন থেকেই, তবুও এদেশের মানুষের কাছে সময়ের ধারণা কেমন রয়ে গেছে, সেটা বুঝতে পারবেন বর্তমান বইটি হাতে নিলেই।

বইটি লিখতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু বই, পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন আণবিক শক্তি কেন্দ্রের লাইব্রেরীয়ান বন্ধুবর সৈয়দ ফজলুল হক, পরামর্শ দিয়েছে অনুজসম সহকর্মী ড. সৈয়দ ছালেহ্উদ্দিন। এ সময়ে আরেক বন্ধুকে স্মরণ না করলেই নয়। কলকাতা সাহা ইনসটিটিউটের গবেষক ড. অঞ্জন কুণ্ডু বহু বৎসর আগে মস্কোতে পড়ার সময় আমাকে এ ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণাটুকু দিয়েছিল। তারপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে 'সময়ের' উপর পড়াশুনা করে গেছি। মহাকাল-মহাবিশ্ব নিয়ে আমার স্ত্রী রোজা কিজিলগুলের উৎসাহ অপরিসীম। আমার ছেলে সাবিরও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে এসব বুঝবার জন্যে। এরা সবাই আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছে বইটি লেখার ব্যাপারে। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ ধরণের বই লেখা যে কত কঠিন এটা এ বইয়ের পাঠকমাত্রই আমার সাথে একমত হবেন। তাই অনেক ভুলত্রুটি রয়ে যেতে পারে ব্যাখ্যা, বর্ণনার সময়ে। পাঠকদের উৎসাহ পেলে পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হবে। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জ্ঞানস্পৃহাকে জাগিয়ে দেয়া আর জিজ্ঞাসু মনকে উদ্দীপ্ত করা। জ্ঞান-বিজ্ঞানই একমাত্র বিষয় যা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েও অভাবগ্রস্ত হয় না কেউই। এই গ্রন্থ রচিত হল সব বয়সের সব মানুষের জন্য।

১৪৯, উত্তর বাসাবো, ঢাকা
২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং

ড. শহীদুল্লাহ মৃধা
পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বহুকাল আগের কথা। তখন এমন একটা সময় ছিল, যখন আমি দীর্ঘকাল এক গভীর আবেগাত্মক অবস্থার মধ্যে ছিলাম। আমার জীবনে তখন বসন্ত এসেছিল এবং আমি ছিলাম দেশ থেকে বহুদূরে মস্কোতে। দেশ স্বাধীন হবার কয়েকমাস পরেই আমি তথায় পাড়ি দিয়েছিলাম। আমি তখন একটা ট্রানজিসন পিরিয়ড অতিক্রম করছিলাম। জ্ঞানের সমুদ্র আমার সামনে খুলে গিয়েছিল। পুরাতন বিশ্বাস এবং নতুন জগতের ভাবধারায় একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আমি ভীত চকিত পদক্ষেপ ফেলে চলছিলাম। ঠিক দু'বৎসর এমন অবস্থাটা চলে। তারপর এলো চুয়াত্তরের সেই গ্রীষ্মকাল। জীবনের নির্দিষ্ট পথ আমি খুঁজে পেলাম। তারপর থেকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি।

সময়ের রথে আমি চড়ে বসলাম। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত করলাম। মহাকালের মায়াজালে নিজেকে জড়ালাম। সেদিন আমার চারপাশে সতীর্থ, বন্ধু, গুরুজন ও শিক্ষক হিসাবে যারা ছিল তাদের মধ্যে (সতীর্থ ছাড়া) অনেকেই ইহলোকে নেই। যারা রয়েছে তারাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যৌবনের সেই দিনগুলি এখন অনেক দূরে। যে অভিজ্ঞতার সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। অতীতের দিনগুলির সাথে বর্তমানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর ব্যবধান। পুরোনো দিনের উচ্ছলতায় এখন ভাঁটা পড়েছে। সেই অনিরুদ্ধ আবেগ হয়েছে নিয়ন্ত্রিত। চিন্তা হয়েছে প্রসারিত। মনের দৃঢ়তার স্থলে এখন সংশয় বাধা বেঁধেছে। চতুর্দিকে দেখছি শুধু মূঢ়তা বেড়ে চলেছে।

মহাকাল তার নিয়মে ঘুরছে ... ঘুরছে পৃথিবী ... হাজার বছর তবুও কেটে গেছে ... না মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। গতিতে জীবন চলছে। 'কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুটছে আয়ু ব্যস্ত পায়, বিদায় নিলে ফিরবনা আর অন্তহীন যে সেই বিদায়। ভাগ্যলিপি মিথ্যা সে নয়, ফুরোয় যা তা ফুরিয়ে যাক। গোরের ভিতর যে জন, সেকি জীবন নিয়ে ফিরবে আর? জীর্ণ ভাঙ্গা সরাইখানার রাত্রি-দিবা দুটি দ্বার। তারি ভিতর আনাগোনা দুনিয়াদারী চমৎকার। রাজার পরে আসছে রাজা সজ্জা কতই বাদ্য ধূম, তুচ্ছ সে সব কয়দিনইবা তার পরেতো সব নিঝুম।'

হায়! ওমর খৈয়ামের কথার বেশ ধরেই বলতে হয় সময় তার নিজের গতিতে নিজের পথেই অবিশ্রান্ত চলে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র। সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতে যায়, তারপর কোথায় যায়? কবে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, কবে হবে শেষ? এমনি সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে জীবনের পঁচিশটি বছর ব্যয় করেছি। কিন্তু সময়ের শুরু বা শেষ খুঁজে পাইনি।

www.pathagar.com

পশ্চিমে হাজারটির উপর বই লেখা হয়ে গেছে সময়ের উপর কিন্তু পূর্বে বাংলাদেশে এখনও একটি বই বের হয়নি। এমনি এক বেদনা-ক্ষোভ থেকে ১৯৮৮ সনে আমি বইটির প্রথমাংশ লিখে ফেলি। তখনও হকিংয়ের বইটি বাংলাদেশে আসেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের এক প্রবীণ অধ্যাপকের কাছে বইটি আছে জেনে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর মাথায় জাগল বক্ষ্যমান বইটি নিজেই লিখে ফেলবার।

১০/১২টি অনুসঙ্গিক বই এবং শতখানেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পড়ার পর ৯০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিটি দাড় করালাম মাত্রা ১৫ দিনে। ১৯৭৪ সন থেকে লব্দ জ্ঞান প্রয়োগ করলাম। মস্কোতে আমার অনেক শিক্ষক তন্মধ্যে প্রফেসার মিসকিয়েভিচ (ইহুদী পণ্ডিত) এবং রুশ অ্যাকাডেমিশিয়ান স্পিরকিন অন্যতম, তাদের ব্যাখ্যা আমার মনে সেদিন এক নতুন জগতের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

মহাবিশ্ব ও মহাকাল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ি সর্বপ্রথম প্ল্যানেটরিয়াম পরিদর্শন করার পর। প্ল্যানেটরিয়ামের আকাশে মহাকাশের চিত্র দেখার পর অন্তর্জগতে ঘটে বিপ্লব। হায়, বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একটা প্ল্যানেটরিয়াম এখনও স্থাপিত হয়নি। এ শহরে নেই একটা স্থায়ী সার্কাস। যুব সম্প্রদায় অবসর সময় কাটাবে কি করে? যাক! মস্কো প্ল্যানেটরিয়ামে ১৯৮১ সনে SETI (Search For Extraterrestrial Intelligence) কনফারেন্সে এসেছিলেন মার্কিন নভোবিজ্ঞানী কার্ল সাগান। রুশ বিজ্ঞানী শ্কলোভস্কি, কার্দাশেভ সহ অন্যান্যদের বক্তব্য শুনে বিমোহিত হয়েছিলাম।

এতসব ব্যক্তি ও তাদের বই থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে 'সময়ের বিচিত্র কাহিনী' লিখে জমা দিলাম আমার পরিচিত প্রকাশনী 'আহমদ পাবলিশিং হাউস'কে। তারা ঠিক ছয় মাস পরে ফেরৎ দিলে এবার দিলাম অগ্রজ প্রতিম মফিদুল হকের 'জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী'তে। '৮৯ সালটা কেটে গেল। '৯০ সালে পাণ্ডুলিপিটা গেল চিত্তরঞ্জন সাহার 'মুক্তাধারায়'। '৯১ তে আমি জার্মানী গেলাম পোস্ট ডক্টরেট করতে। ফিরে আসতে '৯২ এর জুলাই মাস হয়ে গেল। দেশের তিন তিনটি বিখ্যাত প্রকাশনী থেকে পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ আসতে কেটে গেল সাড়ে চার বৎসর।

এবার আমি চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম ব্যাপারটা কি? তারপর ২৬ আগস্ট ১৯৯৩ সনে আমার কর্মস্থলের পাশের বিল্ডিং এ অবস্থিত "বাংলা একাডেমী"তে জমা দিলাম। তারা নিয়মানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের এক অধ্যাপকের কাছে পাঠালেন মতামতের জন্য। বহু কষ্টে তাঁর নিউট্র্যাল মতামত পাওয়া গেল '৯৬ এর জানুয়ারিতে। এবার দরকার দ্বিতীয় রিভিয়্যুর-এর মতামত। ঐ ডিপার্টমেন্টেরই অন্য এক প্রফেসার ৪ মাস পরে সময়ের অভাবের জন্য তা ফেরৎ দেন। এবার তা যায় তৃতীয় অধ্যাপকের কাছে। তিনি আবার পদার্থবিদ্যার চাইতে দেশের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বিধায় পাণ্ডুলিপিটি না দেখেই ফেরৎ দেন। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ ধৈর্য্যের সঙ্গে এবার চতুর্থ অধ্যাপকের কাছে (তালিকানুয়ায়ী) তা পাঠান নিয়মানুসারে। অসংখ্যবার তাগাদা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ আসে 'অমনোনীতে' মতামত নিয়ে এ বৎসরের মার্চ মাসের দিকে। ইতোমধ্যে কেটে গেছে আরও অর্ধযুগ। মাত্র ৯০ পৃষ্ঠা!

www.pathagar.com

এবার মঞ্চপটে আবির্ভূত হলো অনুজপ্রতিম তরুণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক প্রবর, ইংরেজি ভাষা শেখানোর ওস্তাদ-লেখক এস. এম. জাকির হুসাইন। তার অতীব আগ্রহের দরুণ 'জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর' সাঈদ সাহেব। পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করলেন ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯। ২৬ এপ্রিল দিনটি আমার জন্য শুভদিন ১৯৬৮ সন থেকেই। তা আমি কি এখন পশ্চিমী কায়দায় 'জাকির'কে ও 'সাঈদ' ভাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? নাকি প্রাচ্য কায়দায় চুপ থাকব অথবা কথার ফুলঝুরি দিয়ে সাইক্লোন বইয়ে দেব? আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি। আমি কাজে প্রমাণ করব।

সত্তর বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে তিন বৎসর অধ্যাপনাকারী এক ইহুদী ভদ্রলোকের (গিয়ূলা গেরমানুস) গৃহিনী 'রোজা হাজনাচী' (হাঙ্গেরীয়) লিখেছিলেন : বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় জবাবে বললেন, "In Europe, You are slave of Times, In India we are master of Time. We don't run after Time like you, Here Time runs after us". এর উপর মন্তব্য করতে যেয়ে ভদ্রমহিলা লিখলেন : In India, there is nothing visionary here, only dreams, self deceiption and a deep, deep sickness everywhere. I shall be eeaving India soon. I can't live in this chaos any longer. It is a land of half-wits. They say one thing and they do something quite different. For every unintelligible idea they will find an explanation. Thoose who look from the outside call this mythology. Well, at last I have seen for myself-it is only dissention, disunity, and a world-wide self-delusion, which has no control over thoughts and feelings. It's a frangy of masochism. And the Hindus (Bengalee) make a virtue of all that.

It was a time of celebration, and people do not work in India unless it is absolutely necessary. A celebration is a licence for sanctified idleness. Whoever makes no use of it must be mad. There is something in India's climate which takes from men any desire for activity yet at the same time encourages thought. In the heat men forget to act. They mediatate, compare, and the longer they dwell in the realm of thought the further they drift from the physical world, from the positive and negative, the yes or no. Everything is considered as relative. There is no absolute truth on this earth. All is relative. There is nothing permanent, everything changes, and passes away. In India there is a soul in everything. (Fire of Bengal, UPL)

১৯৮৮ সালের পর কোট গেছে এক যুগ। সামনের মাসে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখব। ইতোমধ্যে সময়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আরও মাথা ঘামিয়েছেন। তারা প্রতিসপ্তাহে একটা করে প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। বই প্রকাশ করেছেন। এগুলির যথাসাধ্য

www.pathagar.com

আমি পড়ার চেষ্টা করেছি। আত্মস্থ হয়ত করতে পারিনি। কয়েকশত বই ঘেটে এবং সহস্রাধিক নিবন্ধ অধিগত করে বইটির কলেবর আরও দ্বিগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হল। এর বেশি হলে প্রকাশকের বিপদ। রিস্ক নিয়ে এমনতর অনন্য বিষয়ের নগন্য বই ছেপে পকেটের টাকা খরচ করে রিটার্ন না পাওয়া গেলেত ভারী চিন্তার কথাই। তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলব, এদেশে বাংলা একাডেমী বা অন্য কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকাশনালয় আজ পর্যন্ত সময়ের উপর কোন বই ছাপান্‌নি, ছাপতে পারেননি, ভবিষ্যত জানিনা। একমাত্র ব্যতিক্রম সাইদ আহমদ। এই অসমসাহসী ব্যক্তিটিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটি লিখতে যেয়ে বহুবিধ পত্র-পত্রিকা, বই থেকে আমি তথ্য নিয়েছি, তজ্জন্য সংশ্লিষ্টজনদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ঋণী হয়ে রইলাম। এক্ষেত্রে শাহবাগস্থ আজিজ সুপার মার্কেটের 'বইপত্র'র আরিফ ভাইয়ের ঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ভোলা যায় না ... অবিস্মরণীয়।

আমার বইটির উনিশটি (!) অধ্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সময়ের বিক্ষিপ্ত ধারণাগুলি। ক্যাওয়াস আর কি! ইচ্ছে ছিল অনেক ছবি দেবার। দিলাম না অনেক কিছু ভেবে। পাঠকের কষ্ট আর বাড়ালামনা। তাই মাত্র দুইটা ফর্মুলা রেখেছি নিউটনের ও আইনস্টাইনের। সিরিয়াস পাঠক যে স্বল্পসংখ্যক রয়েছেন, তাদের অনুরোধ করব গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত আড়াইশতের মতো পুস্তক থেকে ৪/৫টি পড়ে ফেলতে।

আমার ধারণা এমন একটি বিষয়ের উপর পুস্তক রচনা করতে ৫০০ পৃষ্ঠার দরকার। অন্যথায় সময়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। পাঠককে সতর্ক করে দিচ্ছি : এই বইটি পড়ার আগে সময়ের রহস্যের ব্যাপারটা আপনাদের কাছে যতখানি গোলমেলে ছিল বইটা পড়ার পর হয়ত আরও বেশি গোলমেলে মনে হবে। কেননা বইটা লেখার পর এ ব্যাপারে আমার নিজেরই ধন্দ বেড়েছে বই কমেনি।

এ জীবনে সময়ের উপর আমি আর কোনো বই লিখবনা। একই নদীর স্রোতে যেমন দু'বার অবগাহন করা যায় না, ঠিক তেমনি ব্যাপার আর কি। আমি কামনা করব, আমাদের কোন তরুণ চিন্তাবিদ আরও মনোজ্ঞ করে, প্রাঞ্জল ভাষায় একটি সহজ ধরণের সময়ের কাহিনী উপহার দেবেন।

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ সময়ের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। সুপ্রাচীন লিপি, গ্রীক দর্শন থেকে প্রতীয়মান হয় যে অনন্ত আর চলন্ত বিশ্ব নিয়ে তারা চিন্তা করত। পৃথিবীর সব ধর্মের মূলেই রয়েছে সময়ের কথা—পরকালের কথা—অন্যবিশ্বের কথা। যদিও গ্যালিলিও এবং নিউটনের সময়েই "সময়" কেবল বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় প্রবেশ লাভ করে তথাপি মাত্র এই বিংশ শতাব্দীতে তা একটি বিষয়ে পরিণত হয়। এ জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আইনস্টাইনের। তাই এই বিশ শতককে আইনস্টাইনের টাইমের শতক ও বলা চলে।

সময়ের উপর রীতিবদ্ধ এবং সর্বাঙ্গীন একটি বই লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। পরিবর্তে আমি বেছে নিয়েছি এমন সব আমার কাছে আকর্ষণীয় বিষয়গুলি যা রহস্যময় মনে হয়েছে। সময়ের নীতিটা ধরার চেষ্টা করেছি। আপেক্ষিকতাতত্ত্ব শতবর্ষের প্রধান তত্ত্ব হলেও এর উদ্ভট ভবিষ্যৎবাণীগুলি এখনও মানুষ সব বুঝে উঠতে পারেনি—বিশেষ করে

www.pathagar.com

আমাদের দেশে। বিজ্ঞানী মহলে এর উপর গবেষণা নিরন্তর চলছে। যে কেউ 'ফিজিক্যাল রিভিয়ু লেটার' জার্নালটা খুঁজলেই এর সত্যতা দেখবেন। এই বইয়ে আইনস্টাইনের বক্তব্যগুলির সোজাসুজি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শেষমেষ মন্তব্য হচ্ছে এই যে We are far from having a good grasp of the concept of time. আপেক্ষিকতাতত্ত্বের পুরো ক্ষেত্রটির অনুধাবন এখনও শতযোজন দূরে রয়েছে। তাই এই থিয়োরীর সাথে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সংযোজন আরো এক শতাব্দীর কাজ।

এই থিয়োরীর 'টাইম ট্রাভেল' ব্যাপারটি মাত্র এক দশক যাবৎ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কেড়েছে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়সের সঙ্গে প্রাচীন গ্যালাক্সিগুলির বয়সের তারতম্য এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রোটনের বয়স নিয়ে ঝামেলাত সবে শুরু হল। 'প্রোটন সাগা' সে এক রোমহর্ষক কাহিনী-ট্যাকিয়ন যানের মতই। সময়ের আগে পেছনে সর্বত্রই আছে সে স্থির হয়ে। বিশ্ব চলন্ত-জীবন্ত-গতিময় আবার একই সাথে দেখা যাচ্ছে সে স্থির-অনড়। কোনরূপে আমরা দেখছি মহাবিশ্বকে, আর অনুধাবন করছি মহাকালকে! প্রাত্যহিক জীবনে যে সময়কে আমরা দেখি-অনুভব করি তা আইনস্টাইনের সময়ের সঙ্গে মেলে না।

সময়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুবই গোলমেলে, ধোঁয়াটে ব্যাপার, একই সাথে তা রহস্যময় এবং আকর্ষনীয় আর মাতালকারী। বইটিতে গাণিতিক তত্ত্ব, জ্যামিতি-চিত্র, প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা, সংখ্যা এসব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপরেও বিষয়বস্তুগুলি সহজ হয়েছে কিনা তা বিচারের ভার পাঠক সমাজের উপর ছেড়ে দিলাম। Time is of your own making, its clock ticks in your head. The momeut you stop thought, time too stops dead. অর্থাৎ আপনি নাইত আপনার সময়ও শেষ। অথচ জগত সংসার সবই চলবে তার আপন সময়ানুসারে। যদি কেউ আমায় জিজ্ঞেস না করে 'সময় কি'? তা হলে আমি জানি তা কি। কিন্তু কেউ এ সম্পর্কে জানতে চাইলেই সেরেছে, সত্যিই সময় কি তা আমার জানা নেই।

গুল, আমরাত Yin-Yang করেছিলাম ছায়াপথের মেঘমালার সেই চূড়ায় গিয়ে। তারপর নিখাদ হীরার রথে চড়িয়ে তোমাকে আমি নিয়ে গেছিলাম সুদূরে—নক্ষত্রমণ্ডলী, মহাকাল আর আলোর ভুবন ছাড়িয়ে অনন্তলোকে।

যে রাতে বুঝলাম সে চিরদিনের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি আকাশের দিকে তাকালাম। ননীতোলা দুধের মতো ফ্যাকাশে আকাশ। পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। মনে হল ওটা লাফিয়ে মহাবিশ্বের কোন সুদূরে চলে গেছে। আমি অনুভব করলাম আমার স্বপ্নগুলো মরে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে; মহাকাল তার দ্রুতগতি পরিবর্তন করেছে—সময় হারিয়ে গেছে।

বনানী পরমাণু শক্তি অফিসার্স কোয়ার্টার
ডি-৩, ঢাকা ১২১২

ড. শহীদুল্লাহ মৃধা
১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অধ্যায় : বিশ্বকোষের ভাষায় সময় বা কাল ২৩

১.১. সংজ্ঞা, সৌর দিবস, নক্ষত্রকাল ও সৌরকাল, ক্যালেন্ডার, চন্দ্রমাস, হিন্দুদের সময় জ্ঞান ২৩

১.২. বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : সময় সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা এবং তার প্রভাব ৩২

২.১. গ্রীক, চীনা, হিন্দু, ইরানী ৩২

২.২. ইতিহাসের দর্শনে একমুখী সময়ের ধারণা ৩৩

২.৩. নিউটনীয় গতিবিদ্যায় সময় ৩৫

তৃতীয় অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার দর্শনে সময়ের ধারণা ৩৭

৩.১. বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও সময় (দেশকাল) ৩৭

৩.২. সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও সময় ৩৯

৩.৩. কালো গহ্বর বা ব্ল্যাকহোল ও সময় ৪০

৩.৪. ব্ল্যাকহোল কি মৃত্যু পরবর্তী আরেক জগৎ নাকি ভগবান বিষ্ণুর চোখের মণি ৪২

চতুর্থ অধ্যায় : মহাবিশ্বের সৃষ্টি—সময়ের রথে যাত্রা হল শুরু ৪৪

৪.১. বিবর্তন তত্ত্ব ৪৫

৪.২. মহাবিশ্বের অপরিবর্তনশীলতা ৪৬

৪.৩. পৌনঃপুনিক বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব ৪৭

৪.৪. অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত ৪৭

৪.৫. মহাবিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৪৮

৪.৬. তিন রূপে মহাবিশ্ব ৪৯

৪.৭. মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে সোভিয়েত মতবাদ ৫০

৪.৮. ক্ষুদে কৃষ্ণ বিবর; মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চেহারা ৫১

৪.৯. মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি ৫৩

পঞ্চম অধ্যায় : মাইক্রো পদার্থবিজ্ঞানে সময়ের ধারণা ৫৫

৫.১. সময়ের অনির্দ্দিষ্টতা ৫৫

৫.২. সুক্ষ্ম কণিকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সময়ের ধারণা ৫৬

৫.৩. আণবিক পদার্থবিজ্ঞানে সময়ের ধারণা ৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : সময় মাপার নীতিসমূহ ৫৮

৬.১. সময় মাপার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ৫৮

৬.২. সঠিক সময় নির্ধারণের প্রচেষ্টা ৫৯

৬.৩. সময়ের বাহন-ঘড়ির ইতিহাস ৬০

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায় : বাংলা ও পাশ্চাত্য সনের জন্ম কথা ৬৬
৭.১. বাংলা সনের জন্মকথা ৬৬
৭.২. ইংরেজি মাসের জন্মকথা ৬৭
৭.৩. সময় সম্পর্কে কিছু আশ্চর্য্য তথ্য ৬৮

অষ্টম অধ্যায় : সময়ের নদীতে একরাশ বুদ্বুদ ও বিশ্বসৃষ্টির থিয়োরীতে সর্বশেষ সংযোজন ৭০
৮.১. সময় তুমি কার? ৭০
৮.২. সার্বজনীন কাল ৭১
৮.৩. বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বে সর্বশেষ অবদান ৭৪

নবম অধ্যায় : মহাকাল ও ষ্টিফেন হকিং ৭৮
৯.১. বিরাট বিস্ফোরণের সাথেই সময়ের জন্ম হয়েছিল ৭৮
৯.২. কৃষ্ণ বিবর থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসতে পারে ৭৯
৯.৩. মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংশ : সময়ের দিক নির্দেশিকা শুধু একদিকে (হকিং মতবাদ) ৮০
৯.৪. মহাবিশ্বের শুরু ৮৩

দশম অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞান ও মনোদর্শনে সময়ের ধারণা ৮৫
১০.১. দেহ ছন্দ ৮৫
১০.২. জীবন-ছন্দ ৮৭

একাদশ অধ্যায় : সময় ও মহাকালের রহস্য এবং মহানবীর মিরাজ ৯০
১১.১. কুরআনে মিরাজ প্রসঙ্গ ৯০
১১.২. মিরাজের সুফীতাত্ত্বিক উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ৯২
১১.৩ অধিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার আলোকে মিরাজ ৯৪
১১.৪ আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে মিরাজ ৯৬
১১.৫. কোয়ান্টামতত্ত্বের নিরিখে সময়, স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রকৃতি ১০৩

দ্বাদশ অধ্যায় : ধর্ম ও বিজ্ঞান ১১৩
১২.১. ধর্মমুখী বিজ্ঞান নাকি বিজ্ঞানমুখী ধর্ম ১১৩
১২.২. কোরআনে প্রাণের প্রসঙ্গ ১১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় : মহাবিশ্বকে আমরা কতটুকু জানি আর মহাকালকে কতটুকু বুঝি ১২৩
১৩.১. মহাকাশে কত হাজার কোটি ছায়াপথ রয়েছে ১২৩
১৩.২. মহাবিশ্বকে আমরা কতটুকু জানি ১২৪
১৩.৩. মহাকালকে আমরা কতটুকু বুঝি ১২৮
১৩.৪ মহাবিশ্ব কেবলই কি একটি শক্তিক্ষেত্র ১৩০
১৩.৫. এডেলম্যানের ডি এন এ কম্পিউটার ১৩২
১৩.৬. আলোর চাইতে দ্রুতগামী সংকেতের প্রমাণ ১৩৩

চতুর্দশ অধ্যায় : কালে কালে মহাকালের বিস্ময়কর তত্ত্বগুলি ১৩৬
১৪.১. স্থান ও কাল নহে, শুধুই স্থান-কাল ১৩৬
১৪.২. অমরত্বের পদার্থবিজ্ঞান : টিপলারের ওমেগা পয়েন্ট থিয়োরী ১৩৭
১৪.৩. বিগব্যাঙ কি সত্যিই ঘটেছিল? ১৩৯
১৪.৪. মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কে নী স্পোলিনের নতুন তত্ত্ব ১৪২

www.pathagar.com

১৪.৫. বহু মহাবিশ্ব ১৪৩
১৪.৬. হকিংয়ের কিছু থিয়োরীর প্রসঙ্গে ১৪৬
১৪.৭. ডাইমেনশন কয়টি? ১১টি এবং এম-থিয়োরী ১৪৭
১৪.৮. সমান্তরাল মহাবিশ্ব ১৪৯
১৪.৯. মহাকালের সৃষ্টি রহস্য ১৫০

পঞ্চদশ অধ্যায় : সময় ভ্রমণ : বাস্তবে নাকি কল্পকথায় ১৫৫
১৫.১. সময়ের পথ ধরে অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়া ১৫৫
১৫.২. সময় ভ্রমণ বিজ্ঞান ১৬৫
১৫.৩. সময় ভ্রমণ কল্পবিজ্ঞান ১৬৯

ষোড়শ অধ্যায় : অচেনা অজানা অদ্ভুত সময়ের কাহিনী ১৭২
১৬.১. সময়ের দিক বা লক্ষ্য ধরে ১৭৩
১৬.২. সময়ের একটি অতিরিক্ত মাত্রা—হাইপার টাইম ১৭৪
১৬.৩. বিমূর্ত সময়ের গণনা হল শুরু ১৭৫
১৬.৪. একটি পরমাণুর পিট-পিটানী দৃষ্টি ১৭৫
১৬.৫. সময় নিয়ে মনের খেলা : চিরস্থায়ী সেকেন্ড ১৭৬

সপ্তদশ অধ্যায় : মজার সময় না সময়ের মজা ১৭৮
১৭.১. ধাঁধা হেয়ালি খামখেয়ালি ১৭৮
১৭.২. স্বাস্থ্য রক্ষায় সময় বিচার ১৭৯
১৭.৩. দিনের কোন সময়ে আপনি কি করবেন ১৮১
১৭.৪. আপনার দেহ-ঘড়ির নানা খবর ১৮৩
১৭.৫ : দেহ-মনের গোপন ঘড়ি ১৮৪

অষ্টাদশ অধ্যায় : সময়ের বিচার ১৯০
১৮.১. আইনস্টাইনের সময় : বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও কাল ১৯০
১৮.২. আইনস্টাইনের সময় : সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কাল ১৯২
১৮.৩. যেখানে সময় উড়ে চলে ১৯৪
১৮.৪. কাল্পনিক কাল ১৯৫

ঊনবিংশ অধ্যায় : মহাকাশ-মহাকাল : সময় থেকে মুক্তি ১৯৭
১৯.১. প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের ধারণায় দেশ-কালের চিত্র ১৯৭
১৯.২. ধর্ম অনন্ত-এর ইতিহাস নেই—সময় চিরন্তন-কালের করাল গ্রাসে ২০০
১৯.৩. ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মার কাল-প্রসরণ নেই ২০২
১৯.৪. মৃত্যু কোথায়? সময়ের শেষ প্রান্তে ২০৪
১৯.৫. সময়ের অনুভূতি আপনার কেমন ২০৫

উপসংহার : সময়ের অসমাপ্ত কাহিনী ২০৬
... সমাধানের অপেক্ষায় সময়ের দশটি সমস্যা ২০৬

গ্রন্থসূচী : ব্যবহৃত ও সহায়ক ২০৯
... ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি
... Recommended Literature

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বকোষের ভাষায় সময় বা কাল

১.১ : প্রাথমিক ধারণা ও অনুভূতি

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সময় বা কাল সম্পর্কে ধারণা নানাভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দার্শনিক, প্রাকৃতিক মনোবৈজ্ঞানিক ও জীববৈজ্ঞানিক। যদিও এ বিষয়ে মতৈক্য স্থাপিত হয়নি তথাপি সচরাচর পরিমাপযোগ্য সময় ও অভিজ্ঞতায় অনুভূত কালের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সময় সম্পর্কে অমীমাংসীত সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে এর বাস্তবতা বা অবাস্তবতা (এর বস্তুনিরপেক্ষতা বা বস্তু সাপেক্ষতার সহিত সংশ্লিষ্ট), কাল এবং অনন্তকাল-মহাকালের মধ্যে পার্থক্য, সবশেষে সময়ে বা কালের প্রকৃতি (বিরতিহীন বা পারমাণবিক)।

মানুষের সাধারণ ধারণা অনুসারে সময়ের বাস্তব সত্ত্বা আছে এবং তা সর্বদা একইভাবে প্রবহমান; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সময়ের মধ্যে এবং পূর্ব ও পরের সময়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়; আর ঘটনাবলীর পূর্ণ সমকালীনতার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়। যাহা হউক এখন অধিকাংশ পদার্থবিদ বিভিন্ন সঞ্চরণশীল মণ্ডলে ঘটনাবলীর সমকালীনতাকে মণ্ডলসমূহের সঞ্চয়ন ও পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (আপেক্ষিক) বলে বিবেচনা করেন।

সময় একটি স্বাধীন সত্ত্বা এই স্বজ্ঞাত অভিমতের বদলে পদার্থবিদ্যায় এ ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে সময় ও স্থান (দেশকাল) হল একটি চর্তুমাত্রিক বিশ্বের দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক। বিভিন্নরূপ কাল পরিমাপের ভিত্তি হল কোন পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটনশীল প্রাকৃতিক ব্যাপার যথা, পৃথিবীর নিজ অক্ষরেখার চারদিকে আবর্তন-এর দ্বারা সৌর সময় পরিমাপ করা হয়, এবং কোন নক্ষত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে নাক্ষত্রিক সময় (sidereal time) পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ঋতু বা চন্দ্রকলাসমূহের পুনঃ আবির্ভাব ও কাল পরিমাপের ভিত্তি স্বরূপ গৃহীত হয়েছে।

সৌরদিবসগুলির দৈর্ঘ্য সমান নয় বলে আধুনিক কালপরিমাপের ভিত্তি হল গড় সৌরদিবস। সূর্যের আপতগতি পশ্চিম অভিমুখী বলে পশ্চিমদিকে প্রতি এক ডিগ্রী দ্রাঘিমার জন্য স্থানীয় সময় হচ্ছে চার মিনিট পরবর্তী। প্রমাণ সময় বা স্টান্ডার্ড টাইম ইংলন্ডের গ্রীনিচস্থিত রাজকীয় মানমন্দির কর্তৃক পরিমাপিত গড় সৌরদিবসের উপর নির্ভর করে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে; ১৮৮৪ সন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রীনিচের দ্রাঘিমাকে ০° শূন্য ডিগ্রীর দ্রাঘিমা বলে স্বীকার করা হয়। পৃথিবীর ৩৬০° পরিধিটিকে পনের ডিগ্রী করে সমান

www.pathagar.com

২৪টি সময়-বলয়ে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেকটি বলয় গ্রীনিচ সময় হতে কোন পূর্ণসংখ্যক ঘন্টার পার্থক্য স্থানীয় সময় দেখায়।

সূর্য যখন কোন স্থানের আকাশে এর আপাত গতিপথের উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে, তখন ঐ স্থানের স্থানীয় আপাত মধ্যাহ্ন এবং যখন উহা গতিপথে আকাশের নিম্নতম বিন্দুতে পৌঁছে তখন স্থানীয় আপাত মধ্যরাত্রি; পরপর দুটি মধ্যরাত্রির মধ্যবর্তী কালটা হল এক আপাত সৌরদিবস; এই সময়ই সূর্যঘড়ি দ্বারা মাপা যায়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পৃথিবী সূর্যের নিকটতম হয় বলে পৃথিবী দ্রুততর গতিতে ঘুরে, জুন ও জুলাই মাসে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব সর্বাধিক বিধায় তখন পৃথিবী তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে সঞ্চরণ করে।

এ কারণে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের সময় সকল ঋতুতে সমান হয় না। অধিকন্তু সূর্যের আপাত গতি সৌর অয়ন পথে এবং এই পথ খ-বিষুবের সঙ্গে একটি কোণ ২৩.৫০° করে থাকে; সূর্য যখন অয়নান্ত বিন্দুদ্বয়ের নিকটে থাকে (যখন সূর্য বিষুব রেখার সমান্তরাল চলে) তখন দিবারাত্র বড় হবার প্রবণতা দেখায়, আবার বিষুব বিন্দুদ্বয়ের নিকট পৌঁছলে দিবারাত্র ক্ষুদ্রতর হবার প্রবণতা দেখায়। এ কারণেই গড় সময়ের প্রচলন হয়েছে। সৌরদিবসের দ্বিপ্রহর ফেব্রুয়ারি মাসে গড় সৌর দ্বিপ্রহরের প্রায় ১৫ মিনিট পরে এবং অক্টোবরে প্রায় ১৬ মিনিট আগে হয়। প্রমাণ-সময় গড় সৌরদিবস অনুসারে পরিমাপ করা হয়।

কালপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, এর আদিও নেই, অন্তও নেই। আমরা চর্মচক্ষে সে গতি দেখতে পাই না, কারণ কালের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কিন্তু কাল আছে এবং তা নিত্য। দেশ বা স্পেসের কোনও স্থানে যখন কার্যকারণ শৃঙ্খলায় ঘটনাবলী ঘটে যায় তখন তাদের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে উপলব্ধি হয় যে ঐগুলি কালের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কালই ঘটনার নিয়ন্ত্রক এবং কালের পটভূমিকায় যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনা ঘটে থাকে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ দেশের এই তিন মাত্রা এবং কালের একটি মাত্রা নিয়ে বিজ্ঞানী মিনকভস্কির চতুর্মাত্রিক জগৎ গঠিত। কিন্তু দুই ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়কে মাপতে হলে মানদণ্ড চাই, চাই সময়ের একক।

কয়েকটি নৈসর্গিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের কালজ্ঞান জন্মে, যথা—দিবা ও রাত্রির পুনরাবর্তন, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির আবর্তনচক্র এবং বাৎসরিক ঋতুপর্যায়। প্রথমটির কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি, দ্বিতীয়টির কারণ চন্দ্রের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ও তৃতীয়টির কারণ পৃথিবীর স্বীয় কক্ষে বার্ষিক গতি। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সূর্যের অবস্থিতির জন্যই এ ঘটনাগুলি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

জ্যোর্তিবিদের গণনায় নাক্ষত্রকাল বা সাইডিরিয়াল টাইম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মানুষের নৈমন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজন হয় সৌরকালের। নাক্ষত্রকাল গণনায় প্রকৃতপক্ষে কোনও নক্ষত্রের আপাত আবর্তনকাল না ধরে ভূ-চক্রের আদি বিন্দুর আবর্তনকাল ধরা হয়; এ বিন্দুটি বাসন্ত বিষুববিন্দু (ভার্নাল ইকুইনক্স)। সূর্যের এক পাক ঘূর্ণনে হয় এক সৌরদিবস, ইহা নাক্ষত্রদিবস অপেক্ষা কয়েক মিনিট বেশি। ঘড়ি ধরে দেখলে দেখা যাবে যে :

www.pathagar.com

পৃথিবীর আবর্তনকাল = ২৩ ঘ. ৪৬ মি. ৪.১ সে.
এক নাক্ষত্রদিবস = ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪.০৯১ সে.
এক মধ্যম সৌরদিবস = ২৪ ঘ. (মীন সোলার ডে)

বাসন্তবিষুব-বিন্দুর পশ্চাৎ-চলনের (প্রিসেশন) জন্য এক নাক্ষত্রদিবস পৃথিবীর আবর্তনকাল হতে সামান্য কম।

এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয় কাল হল এক সৌরদিবস; কিন্তু এ কাল পরিমাণ বৎসরের সব দিনে সমান থাকে না, এর কারণ পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণকারী বার্ষিক গতিটি সমগতি বিশিষ্ট নয় এবং পৃথিবীর কক্ষতলীয় ক্রান্তিবৃত্তটি (ইক্লিপটিক) বিষুবরেখার (সিলেসটিয়াল ইকোয়েটার) সহিত সমতলে নেই, এদের মধ্যে গতির পরিমাণ ২৩°২৭'। এ কারণে পৃথিবীর কক্ষগতির গড় নির্ধারণ করে মধ্যম সৌর সময়ের হিসেব করা হয়েছে। মোটামুটি ৩৬৫.২৫ দিনে বৎসর ধরে একদিনের গড় গতি হল ৫৯/৮°২৫', অর্থাৎ ১ ডিগ্রির সামান্য কম। এই মধ্যম সৌর সময়কে ভিত্তি করে আমাদের সাধারণ ঘড়ি সময় নির্দেশ করছে।

বাস্তব সূর্য বিষমগতি, কিন্তু মধ্যম সৌরকাল নির্দেশক অবাস্তব সূর্য সমগতি। সূর্যঘড়ি (সান ডায়াল) বাস্তব সূর্যের গতির সময়-নির্দেশক। এই দুই সময়ের অন্তরকালকে বলে 'কাল-সমীকরণ' বা ইকোয়েশন অফ টাইম। কাল-সমীকরণ কয়েক মিনিটের সময়ের তফাত, তা কখনও ধনাত্মক, কখনও ঋণাত্মক। বৎসরে মাত্র চারদিন উহা শূন্য হয়, অর্থাৎ ঐ চারদিন সূর্যঘড়ি ও সাধারণ ঘড়ির সময় একেবারে মিলে যায়।

উক্ত নাক্ষত্র ও সৌর উভয় সময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সময় নির্দেশ করে। দ্রাঘিমাংশ ১৫ ডিগ্রি ব্যবধানে থাকলে ১ ঘন্টা সময়ের ব্যবধান হবে। গ্রীনিচ সময় থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সময় ৬ ঘন্টা বেশি অর্থাৎ গ্রীনউইচে মধ্যাহ্ন ১২টা হলে ঢাকায় তখন বিকেল ৬টা।

সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাকে বলে এক নাক্ষত্র বৎসর; এর অর্থ-ভূচক্রস্থিত এক নক্ষত্র (ধরা যাক মঘা নক্ষত্র) হতে পুনরায় সেই নক্ষত্রে সূর্যের আপাত প্রত্যাবর্তনকাল এক নাক্ষত্রবর্ষ, কিন্তু ঐ চক্রের বাসন্তবিষুব-বিন্দু হতে পরবর্তী ঐ বিন্দু স্থান পর্যন্ত গমন-সময় হল এক ঋতুবর্ষ বা সায়নবর্ষ (ট্রপিক্যাল ইয়ার)। বিষুব বিন্দুটি নক্ষত্রের মত স্থির থাকলে নাক্ষত্রবর্ষ ও সায়নবর্ষ সমপরিমাণ হত, কিন্তু ঐ বিন্দুটি বৎসরে মোটামুটি ৫০' সরে যাওয়ায় সায়ন বর্ষমান ২০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড কম হচ্ছে। খ-মেরু ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর চারদিকে বৎসরে একটি ৫০' কোণ অঙ্কিত করে ঘুরছে এবং তার চারদিকে এক পাক ঘুরে আসতে সময় লাগবে ২৬০০০ বৎসর।

নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে উক্ত মৃদুমন্দ গতি আর একটি কাল গণনা সূচিত করছে। মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণীত হয়েছে অনেকটা অয়ন চলনের হার গণনা থেকেই। এতদ্ব্যতীত সূর্যের এক অনুসূর (পেরিহেলিয়ন) হতে সেই অনুসূরে ফিরে আসতে একটু বেশি সময় লাগে, কারণ অনুভূর একটা পূর্বদিকে বাৎসরিক গতি আছে যার ১১ ২৫' হচ্ছে অবস্থান। এই প্রত্যাবর্তনকালকে বলে 'ব্যতিক্রান্ত বৎসর' বা অ্যানোম্যালিস্টিক ইয়ার। নিম্নে বর্ষমানগুলির পরিমাণ দেয়া গেল :

www.pathagar.com

সায়নবর্ষ : ৩৬৫.২৪২১৯৫৫ দিন = ৩৬৫ দি. ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৫.৭ সে.

নাক্ষত্রবর্ষ : ৩৬৫.২৫৬৩৬২৫ দিন = ৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ৯ মি. ৯.৭ সে.

ব্যতিক্রান্তবর্ষ : ৩৬৫.২৫৯৫৫০০ দিন = ৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ১৩ মি. ৪৫.১ সে.

আর্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের সূর্য সিদ্ধান্ত মতে বৎসর হচ্ছে

: ৩৬৫.২৫৮৭৫ দিন = ৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ১২ মি. ৩৬ সে.

টলেমির মতে : ৩৬৫.২৫৬৮১৩ দিন = ৩৬৫ দি. ৬ ঘন. ৯ মি. ৪৮.৬ সে.

ওমর খৈয়ামের মতে : ৩৬৫.২৪২৪ দিন (অপসল হিসেব থেকে ০,০০০২ দিন বেশি—ফলে ৫০০০ বৎসরে ১ দিনের তারতম্য ঘটবে আর বর্তমান হিসেব মতে প্রতি ৩৩৩৩ বৎসরে ১দিন ভুল হবে; দেখা যায় খৈয়ামই সবচেয়ে বেশি ঠিক)

নাবিক-পঞ্জিকায় বর্তমানে যে 'এফিমেরিস সময়' ব্যবহৃত হচ্ছে তা উক্ত সায়নবর্ষের বা ৩১৫৫৬৯২৬ সেকেন্ডের এক ভাগকে 'এফিমেরিস সেকেন্ড' ধরে, একেই মৌলিক সময়ের একক ধরা হয়েছে। এ হিসেবে এক 'এফিমেরিস দিবস' হল ৮৬৪০০ (২৪ × ৬০ × ৬০) সেকেন্ড। এফিমেরিস সময়ের সমান হচ্ছে সর্বজনীন সময় + কালশোধন। এ কালগণনার আদিবিন্দু হল ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখের বেলা দুপুর (সর্বজনীন সময় বা এফিমেরিস সময়)। নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতি বৎসরে দৈনন্দিন কালশোধন দেয়া থাকে। উভয় সময়ের পার্থক্য কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

লৌকিক ব্যবহারের জন্য বর্ষ পূর্ণসংখ্যাসূচক ৩৬৫ দিনের, চতুর্থ বৎসরে একটি অতিরিক্ত দিন ধরে ৩৬৬ দিন করা হয়। উহাই অধিবর্ষ বা লিপইয়ার। সায়নবর্ষের অতিরিক্ত ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৬ সে. চারি বৎসরে জমা হয়ে ২৩ ঘ. ১৫ মি. ৪ সে. হয়; একে ২৪ ঘ. ধরে অধিবর্ষে ১ দিন বেশি করা হয়। এই সংশোধনে প্রায় ৪৫ মি. অতিরিক্ত ধরায় আর একটি সংশোধন আবশ্যক। পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সংশোধন প্রচলিত করান। যেসব বর্ষ ৪ দ্বারা বিভাজ্য সেগুলি অধিবর্ষ। কিন্তু ৪০০০, ৮০০০, ১২০০০, ... বর্ষ ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলেও অধিবর্ষ নহে। অবশ্য অন্যান্য শতাব্দীর শেষ বর্ষ ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে সেগুলি অধিবর্ষ বলে বিবেচিত হয়। এই সংশোধনে অনেকটা কালশোধন সম্পূর্ণ হল।

চন্দ্রের ঘূর্ণনকাল হতে মাসের উৎপত্তি হয়েছে এজন্য চন্দ্রকে বলে 'মাসকৃৎ'। এক অমাবস্যা হতে পরবর্তী অমাবস্যার পূর্বদিন পর্যন্ত কালকে 'চান্দ্রমাস' বা লুনেশান্ বলে। সাধারণত, চান্দ্রমাসের মান ২৯ দিন. ১২ ঘ. ৪০ মি. ২.৮ সে. ধরা হয়। পঞ্জিকার প্রধান কার্য চান্দ্রবৎসর ও সৌর বৎসরের সমন্বয় সাধন। ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বেদাঙ্গজ্যোতিষে ৬২টি চান্দ্রমাস ও ৬০টি সৌরমাসের কথা বলা আছে। চান্দ্রমাস আসন্ন ২৯.৫৩ দিনে ধরিলে ৬২ চান্দ্রমাসে হয় ১৮৩০.৮৬ দিন; এবং বৎসরে ৩৬৬ দিন ধরিলে ৫ বৎসরে দিন

www.pathagar.com

সংখ্যা হয় ১৮৩০। এই দুই অতিরিক্ত মাস হল 'মলমাস' (ইন্টার-ক্যালারি মান্থ)। এই পাঁচ বৎসরের যুগ আরম্ভ হত উত্তরায়নারম্ভ অমাবস্যায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্র সংযোগে।

সৌর বৎসর ৩৬৫/৩৬৬ দিনে হওয়ায় এবং চান্দ্রবৎসর ৩৫৩/৩৫৪/৩৮৩/৩৮৪ দিনে হওয়ায় কি সৌর কি চান্দ্র যে কোনও পঞ্জিকা অনুসারে দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় নির্ণয় করা দুরুহ হয়ে পড়ে, এ জন্য যোশেফ স্ক্যালিজার (১৫৪০-১৬০৯ খৃ:) ১৫৮২ সনে এক প্রণালীর উদ্ভাবন করলেন যাতে বিশিষ্ট ঘটনাসমূহ দিন সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে। তিনি ৪৭১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের ১লা জানুয়ারিকে কালের আদিবিন্দু (জিরো আওয়ার) ধরে পরবর্তী ৭৯৮০ বৎসর কালকে 'জুলীয়কাল' বললেন এবং জুলীয় দিবসে ঘটনাবলীর তারিখ নির্দেশ করলেন। এ হিসাবে :

কল্যব্দ : ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দ : জুলীয় দিবস ৫৮৮৪৬৫

শকাব্দ : ১৫ মার্চ ৭৮ খৃষ্টাব্দ : জুলীয় দিবস ১৭৪৯৬২১।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দে অর্থভট প্রথম এরূপ কাল গণনাকে 'অর্থান' বলে গেছেন। তিনি আর একটি যুগের কথা বলে গেছেন, তার নাম মহাযুগ। ৪৩,২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ। সূর্য সিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগের চারিভাগ এরূপ সত্যযুগ (১৭,২৮,০০০ বছরে), ত্রেতা যুগ (১২,৯৬,০০০ বছরে), দ্বাপর যুগ (৮,৬৪,০০০ বছরে) ও কলিযুগ (৪,৩২,০০০ বছরে) অর্থভটের মতে এক মহাযুগের দিনসংখ্যা ১৫৭,৭৯,১৭,৮০০। ইহাকে ৪৩,২০,০০০ দিয়ে ভাগ করলে অর্থভটের পূর্বোক্ত বর্ষমান পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কালকে চারিটি 'যাম' বা 'প্রহরে' ভাগ করত এবং রাত্র ভাগকেও অনুরূপ ভাগে বিভক্ত করত। অষ্টপ্রহর বা যামে ২৪ ঘন্টার এক অহোরাত্র। দণ্ড যন্ত্রের বা নোমনের সাহায্যে আর একটি বিকল্প বিভাগ প্রচলিত ছিল। ১ মুহূর্ত $= \frac{১}{১৫} \times$ দিবাকাল, অনুরূপভাবে রাত্রির ১ মুহূর্ত হত $\frac{১}{১৫} \times$ রাত্রকাল।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাসন্তবিষুব-সংক্রান্তি ও জল বিষুব সংক্রান্তি ভিন্ন বৎসরের অন্য কোনও দিনে 'দিন-রাত্রি' সমপরিমাণ হয় না; এজন্য দিবাভাগের একটি যাম বা মুহূর্ত রাত্রভাগের যাম বা মুহূর্তের সমপরিমাণ নয়/বাসন্ত-বিষুব ও জলবিষুব দিবসদ্বয়ে প্রহরদ্দির কাল-পরিমাণ নিম্নরূপ :

১ প্রহর বা যাম $= \frac{১}{৮} \times$ ২৪ ঘ. $=$ ৩ ঘ. ০ মি.

১ মুহূর্ত $= \frac{১}{১৫} \times$ ১২ ঘ. $=$ ০ ঘ. ৪৮ মি.

বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালে এরূপ অহোরাত্র বিভাগ প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্তজ্যোতিষের কালে (৩০০-১২০০ খৃ:) কালবিভাগ নিম্নপ্রকার ছিল :

অহোরাত্র বা সূর্যোদয় হতে সূর্যোদয় কাল ৬০টি দণ্ডে বা ঘটিকায় বিভক্ত; প্রত্যেক দণ্ডে ৬০টি পল এবং প্রতি পলে ৬০টি বিপল। অতএব ১ দিবস $=$ ৬০ দণ্ড। ৩৬০০ পল $=$ ২১৬০০০ বিপল এবং $\frac{১}{৬}$ পলে $=$ ৪ সেকেন্ড $=$ ১ 'প্রান'

৬০ কলায়	১ অনুপল
৬০ অনুপলে	১ বিপল $=$ ০.৪ সেকেন্ড
৬০ বিপলে	১ পল $=$ ২৪ সেকেন্ড
৬০ পলে	১ দণ্ড $=$ ২৪ মিনিট

www.pathagar.com

২.৫ দণ্ডে	১ ঘন্টা বা হোরা = ৬০ মিনিট
৭.৫ দণ্ড	১ প্রহর = ৩ ঘন্টা
৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে	১ দিবারাত্র = ২৪ ঘন্টা
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে	১ মাস = ৩০ দিনে
২ মাস	১ ঋতু
৬ ঋতুতে	১ বৎসর
২ অয়নে	১ বৎসর
৩৬৫ দিনে	১ বৎসর
১২ বৎসরে	১ যুগ
৭১ যুগ বা ৮৫২ বছরে	১ মন্বন্তর = ১ মনুর কাল
১৪ মন্বন্তরে বা ১১,৯২৮ বছরে	১ কল্প = ১০০০ মহাযুগ

হিন্দু মতে, বর্তমানে ৭ম মনুর কাল চলছে, এর ২৮ মহাযুগের তিন যুগ–সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর শেষ হয়ে কলির যুগ চলছে। ১৩৯৫ বাংলা সনের ১লা বৈশাখে কলির ৫০৯০ কল্যব্দ শুরু হয়েছে।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাযুগ অপেক্ষাও বৃহত্তর যুগ কল্পিত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক এক কল্পে সৃষ্টি করে থাকেন। ব্রহ্মার ১ দিন হচ্ছে ১ কল্প। ৪ যুগ মিলে হয় ১ মহাযুগ। হিন্দুদের হিসেবে ৪,৩২,০০০-৫,০৯০ = ৪,২৬,৯১০ বছর পরে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার যুগ পরম্পরায় হাজার বার যখন ঘুরে এ চক্র শেষ হবে তখনই ব্রহ্মার হবে ১ দিন বা ৪৩২ কোটি বছর। মহাবিশ্ব ধ্বংস করবেন ব্রহ্মা এবং বিশ্রাম নেবেন ১ রাত্র অর্থাৎ আরও ৪৩২ কোটি বছর।

পরদিন জেগে আবার সৃষ্টিকার্যে মন দেবেন। এভাবে যাবে ১০০ বছর–আমাদের হিসেবে ৩১১ ট্রিলিয়ন ৪০ বিলিয়ন বৎসর। স্মর্তব্য, ১০০ কোটিতে ১ বিলিয়ন এবং ১০০০ বিলিয়নে হয় ১ ট্রিলিয়ন। ১০০ বছর পরে এ ব্রহ্মার মৃত্যু হবে। ব্রহ্মার রাজত্ব শেষ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস, অসীম মহাকালের বুকে এ খেলা চলছে অবিরত। কিছুই স্থায়ী নয়, স্মৃতিরা কেবল ঘুরে ফিরে আসে আর হাসি-কান্নায় জল পড়ে, পাতা নড়ে। আকাশের তারকারাও সবাই একদিন অলখে যায় গো ঝরে।

তিব্বতের লামাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কানতিয়া, তানতিয়াতে লেখা আছে দেবতাদের রাজত্বকালের হিসাব। প্রথম স্বর্গে পৃথিবীর ৫০ বৎসরের সমান হচ্ছে ১ দিন ১ রাত। এরকম ৫০০ বছর এখানে বেচে থাকার পর (আমাদের হিসেবে ৯০ লাখ বছর) ২য় স্বর্গে উন্নীত হবেন। সেখানে পৃথিবীর ১০০ বৎসর হচ্ছে ১ দিন রাত্রির সমান। এ স্বর্গে ১০০০ বছর বাঁচবার পর (মানুষের ৩ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর) তৃতীয় স্বর্গে যাবেন। ওখানে ২০০ বছর সমান ১ দিবারাত্রি। ২০০০ দেববর্ষ বাঁচার পর (১৪ কোটি ৪০ লাখ মানববর্ষ) চতুর্থ স্বর্গে ৪০০ বছর এবং ৪০০০ দেববর্ষ (৫৭ কোটি ৬০ লাখ মানববর্ষ) অতিক্রম করার পর পঞ্চম স্বর্গে ৮০০ বছর সমান ১ দিবারাত্র হিসেবে ১০,০০০ দেববর্ষ (২ শত ৩০ কোটি ৪০ লাখ মানববর্ষ) এবং সবশেষে ১৬০০ বছরে ১ দিবারাত্র হিসেবে ১৬০০০ দেববর্ষ সমান ৯ শত ২১ কোটি ৬০ লাখ মানববর্ষ বাঁচবেন তারা।

www.pathagar.com

এ ধরণের হিসেব দেখলে আমাদের ক্ষুদ্রতাই প্রতীয়মান হয়। ১০০ বছরের মানবজীবন মাত্র ১ মুহূর্তের বলে মনে হয়।

প্রাচীন সভ্য মানুষের কাল পরিমাপক যন্ত্র ছিল দণ্ডযন্ত্র (নোমন), সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি (ক্লেপসিড্রা)। বর্তমান যুগের কালপরিমাপক যন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ১. ক্লকঘড়ি বা হাতঘড়ি ২. ক্রনোমিটার ৩. স্টপওয়াচ ৪. কোয়ার্টজ ঘড়ি ৫. অ্যামোনিয়া ক্লক ৬. আণবিক ঘড়ি ৭. বৈদ্যুতিক ঘড়ি। এ সম্পর্কে পরে আমরা আলোকপাত করব।

ভূতাত্ত্বিক সময় জানতে হলে ইউরোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষয়ের হার নির্ণয় করে সময় নির্ধারণ করা যায়।

এখন দেখা যাক দার্শনিকরা তাদের নিরাসক্ত নির্বিকার ভাব নিয়ে সময়কে কিভাবে দেখেন?

১.২ : বিভিন্ন দার্শনিক মত ও সময়

বিভিন্ন দার্শনিক মতে কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনাদি ও অনন্ত মহাকাল নবদ্রব্যের অন্যতম। এই মহাকালের প্রত্যক্ষ্য হয় না। আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রভৃতি শব্দ যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করে থাকি। এই সকল শব্দ প্রয়োগের অসাধারণ কারণ রূপে মহাকাল অনুমিত হয়ে থাকে। কোনও ক্রিয়াদ্বারা অবিচ্ছিন্ন কাল খণ্ডকাল নামে অভিহিত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, পূর্বকালীন, পরকালীন প্রভৃতি বিশেষকগুলি কাল বুঝাতে প্রযোজ্য মহাকালে নহে।

সাংখ্যমতে, মহাকাল বলে কিছু নেই। তথাপি প্রকৃতির সকল পদার্থ সম্বন্ধেই অতীত, বর্তমান শব্দগুলি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। এ সকল শব্দ দ্বারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝতে হবে। সুতরাং সাংখ্যমতে কাল হচ্ছে পদার্থের অবস্থা মাত্র। তথাপি এ অবস্থা বস্তুর একটি সত্য ধর্ম।

মায়াবাদী শংকর কালকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তা সৃষ্ট পদার্থ, অতএব নিশ্চয়ই খণ্ডকাল, অনাদি মহাকাল নহে। কোনও কোনও মায়াবাদী মহাকালের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাকে অবিদ্যারই নামান্তর বলে মনে করেন। কেহ কেহ আবার একে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার অনাদি সম্বন্ধরূপে গণ্য করেন। সকল মায়াবাদীই কালকে জগতের ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র মনে করেন।

কালের বাস্তবতা সম্বন্ধে মায়াবাদের যে মত, তার সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট ও হেগেলের মতের সাদৃশ্য আছে। তাদের মতে, কালের কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই। কান্ট মনে করেন, কাল হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংবেদন-শক্তিরই একটি স্বকীয় আকার। রূপ-রসাদি পদার্থ যখন কোনও জ্ঞাতার ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, তখন জ্ঞাতা হতে ওদের উপর এই কালিক আকার আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার মতে কালের জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ বাস্তব সত্যতা নেই।

ইংরেজ দার্শনিক আলেক্সান্ডার কালকে পারমার্থিক সত্য পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি কালকে দেশ হতে পৃথক করে দেখেন নি। তার মতে, দেশ ও কাল একই পদার্থের দুদিক এবং ঐ পদার্থকে তিনি দেশ-কাল নামে অভিহিত করেছেন। এই

www.pathagar.com

দেশ-কাল হচ্ছে চেতন ও অচেতন সমগ্র জগতের প্রকৃতি বা মূল উপাদান। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য অপর কোনও দর্শনেই সম্ভবত: কালকে এতখানি প্রাধান্য দেয়া হয়নি।

আইনস্টাইন কালকে দেশের চতুর্থ মাত্রা বলে মনে করেন। কাল দেশ সাপেক্ষ। স্থান থাকলে কালও থাকবে। স্থান বা দেশ ধ্বংস হলে কালের অস্তিত্ব নিরর্থক। অবশ্য এটা ব্যাপক অর্থেই বুঝায়। এ· মতে নিরপেক্ষ সমকালীনতা বলে কিছু নেই। দ্রষ্টারা পরিপ্রেক্ষিত বা ফ্রেম এর রেফারেন্স উল্লেখ না করলে বিভিন্ন ঘটনা সমকালীন কিনা তা অনির্ণেয়।

ফরাসী দার্শনিক ব্যার্গস কালকে সদ্‌বস্তু বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি কালের সাপেক্ষতাবাদ মানেন না। কাল যে দেশেরই একটি দিক, তাও তিনি অস্বীকার করেছেন। কালের প্রকৃত বিরূপ হচ্ছে সাক্ষাৎ অনুভূতিতে উপলব্দ নিত্য-সৃজনশীল অবিচ্ছিন্ন গতিমত্তা।

ঘটনার ভিতরে থেকে সময়কে দেখার এক দৃষ্টিভঙ্গী আর বাইরে থেকে সময়কে অবলোকন করা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় মতামতটি হচ্ছে মায়াবাদীদের বা 'ফিলসফারস অব দ্যা মেনিফোল্ড'। প্রথম দলের অনুসারীদেরকে বলা হয় 'প্রসেস ফিলসফারস'। তারা ভবিষ্যতকে অনির্দিষ্ট, অতীতকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন। দ্বিতীয় দলের মতে ভবিষ্যতকেও পরিবর্তন করা যায় না অতীতের মতই।

মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেই মানুষ সময়কে উপলব্ধি করতে শিখেছে সভ্যতার আদি যুগ থেকেই। সবকিছুরই যে শেষ আছে, মানুষ যে অমর নয় এটা সে বুঝার পর থেকেই তার চেতনা জগতে ঘটে গেছে এক বিপ্লব। সময় সম্পর্কে ধারণা মৃত্যুর সঙ্গে ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত।

জরোস্ত্রানিজম, জুডাইজম, খৃষ্টধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করা হয় মৃত্যুর সাথে সাথেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না—সামনে রয়েছে পুনরুত্থান এবং চিরকালের জন্য স্বস্ব বাসস্থানে গমন।

অপরদিকে বৌদ্ধ, অরফিক, পিথাগোরাস, প্ল্যাটোবাদী ও হিন্দুরা মনে করে মানুষের পুর্নজন্ম রয়েছে। চিরতরে আত্মার মুক্তি সাধন নির্বান না হওয়া পর্যন্ত অসংখ্যবার (হাজার হাজার) জন্ম নিতে হবে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ রূপে। নবজন্মে কিছুই মনে থাকে না স্মরণ শক্তির দুর্বলতার জন্য। এ দলের মতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হবার পর আবার শুরু হবে আমাদেরি নিয়ে। আমরা শত শত কোটি বছর আগে যে যেভাবে জীবনযাপন করেছি নতুন প্রজন্মেও তেমনি দিন কাটাব। অর্থাৎ ভাগ্য একই রকম থাকবে। একটা চেইনের মত চলবে।

দুপক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে–তবে কে যে ঠিক তার প্রমাণ কোনদিনই মিলবে না। মহাকালের বুকে রয়ে গেছে তার জবাব। মানুষের ক্ষুদ্র ধারণা শক্তি দিয়ে এ প্রশ্নের **জবাব গত ৭ হাজার বছরেও যাওয়া যায়নি এবং সামনেও পাওয়া যাবে না।** কারণ মৃত্যুর পর কেউ আর কোনদিন ফিরে আসেনি জানাতে যে মৃত্যু পরবর্তী জগৎ বলতে সত্যিই কিছু আছে কিনা।

তাই আমাদের সব আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়টাকে ঘিরে। সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের গর্ভে চলতে থাকে এই

www.pathagar.com

একমুখী চিন্তাবিদদের এবং দ্বিতীয় দলের চক্রাকারে ফের শুরুর মতাবলম্বীদের মাঝের দ্বন্দ্ব নিয়েই বিকশিত হচ্ছে দর্শন, বিজ্ঞান।

চীনামতে স্ত্রী প্রকৃতি 'ঈন' ও পুরুষ প্রকৃতির 'ইয়াং' নিয়ে মহাজাগতিক সময় বয়ে চলছে। পজিটিভ, নেগেটিভ, প্রোটন, ইলেকট্রনের এই ধারণা নিয়েই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজত্ব।

বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে সময় সম্পর্কে বেশ জ্ঞান লাভ করেছে। মুসলিম দার্শনিক ইবনে খলদুন চতুর্দশ শতাব্দীতেই 'চক্রাকারে পুনরাবর্তন' দর্শনে আস্থা প্রকাশ করেন। মিশরের ফারাওরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে মমী করত নিজেদের দেহকে। সময়কে ধরে রাখার এই প্রয়াস ছিল অবজ্ঞাপ্রসূত।

ভগবদগীতায় বলা আছে বিশ লাখ পাঁচ হাজার বছর আগে মনু নিজের পুত্র ও শিষ্য পৃথিবীর শাসনকর্তা মহারাজ ইক্ষ্বাকু-কে 'ভগবদগীতা' শোনান। বর্তমান মনুর রাজত্বকাল ত্রিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ বছর—এর মধ্যে গত হয়ে গেছে ১২ কোটি চার লক্ষ বছর। মানুষের সমাজে গীতা প্রচলিত রয়েছে নাকি বিশ লাখ বছর ধরে। পাঁচ হাজার বছর আগে শেষ বারের মত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'গীতা'র ব্যাখ্যা দেন।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'য় বলা আছে, বিশ্বে চুরাশি লাখ ধরণের (জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ) জীবন রয়েছে। এদের মধ্যে চার লক্ষ প্রকারের হচ্ছে মানবজীবন। এ চার লক্ষ মানব জীবনে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের মানুষ: সভ্য, অসভ্য, আস্তিক, নাস্তিক, শ্রমিক, রাজা, উঁচু-নিচু . . . ইত্যাদি। মানুষের মৃত্যুর পর কর্মফল অনুযায়ী সে এক এক পশু, বৃক্ষ, পতঙ্গের রূপ ধরে জন্ম গ্রহণ করে—ভাল কাজ করলে উন্নততর জীব হিসেবে জন্মায়। অন্যথায় নিচু কুলে জন্ম অবধারিত।

সোজা কথায় প্রত্যেককেই তার কর্মফল ভোগতে হয়। এমনি করে চুরাশি লাখ বার জন্ম নেবার পর তার জীবচক্রের হাত থেকে মুক্তি লাভ ঘটতে পারে যদি ঐ জন্মে কোন সুকৃতি তার থাকে। সাধু জীবনযাপন করলে পর বা পরের জন্য জীবন দিলে পরই কেবল আত্মার মুক্তি ঘটবে। আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বলোকে পাড়ি জমাবে। সেখানেও রয়েছে ৭টি লোক (আবাসস্থল, গ্রহ বিশেষ)। সর্বোপরি রয়েছে ব্রহ্মলোক।

হিন্দুশাস্ত্রে এবং তিব্বতীয়দের "মৃতের পুস্তকে" আমরা পুনর্জন্মে আস্থা দেখতে পাই। বৌদ্ধমতে জীব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মে জন্মে রোগ, শোক ও নানা রকমের দুঃখ ভোগ করে। আরও খারাপ হ'ল—মানুষ এ জন্মে ভাল কাজ করলে মহাপুরুষ বা দেবতা হয়ে পরজন্মে জন্মগ্রহণ করে এবং এ জন্মে মন্দ কাজ করলে নিকৃষ্ট ধরণের মানুষ কিংবা নিকৃষ্ট প্রাণী যথা : কাক, শিয়াল, কুকুর, গাধা ইত্যাদি হয়ে জন্মে।

বৌদ্ধদের অবশ্য ভাল কর্ম করলে আর জন্ম নিতে হয় না। অর্থাৎ তারা নির্বান লাভ করে। ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "পুর্নজন্ম প্রকৃতির বিধান। বিভিন্ন ধরণের জীবনের বিকাশের সঙ্গে পুর্নজন্মের সংযোগ রয়েছে।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সময় সম্পর্কে প্রাচীন (বিজ্ঞানপূর্ব) ধারণা এবং তার প্রভাব

২.১ : গ্রীক, চীনা, হিন্দু ও ইরানী মতবাদ

বৃক্ষের গায়ে যৌবন আসে প্রতি বৎসর, কিন্তু মানুষের যৌবন একবার গত হলে আর আসে না ফিরে, দেহের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে আসে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন শেষ হয়ে যায়, জীবনের ঘড়ি স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা জানার পর মানুষ সময় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে সে অনেক হাজার বছর আগে।

যদিও এমন কোন প্রমাণ মানবজাতির হাতে নেই, যে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়। তথাপি এটা জরোয়াস্ট্রীয়ান, জুডাইজম, খৃস্টীয় এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করা হয় মৃত্যুর পরপারে অন্য জগতে মানুষ চিরজীবন বাস করবে। মানুষ জন্ম নেয় একবার মরবেও একবার। তারপর অসীমকালের জন্য পুনর্জাগরণ ঘটবে এমন একদেশকাল দর্শী ধারণার বাইরে রয়েছে দ্বিতীয় মতটি : বৌদ্ধ, অরফিকরা, পিথাগোরাসের মতাবলম্বী বা এবং প্লেটোবাদীরা মনে করে যে মানুষ জীবজন্তু বারে বারে চক্রাকারে জন্ম নেবে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সৃষ্টি ধ্বংসের সময় সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তারপর আবার জন্মাবে, এরকম করে লক্ষকোটি বছর ধরে মহাবিশ্বে জীবনের বিকাশ চলতে থাকবে। হিন্দুরা আরো এক ধাপ এগিয়ে বিশ্বাস করে যে বিশ্ব ধ্বংসের আগে মানুষ চুরাশি লাখ বার জন্ম নেবে।

গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস ও এমফিডোক্লস (খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ–৫ম শতাব্দীতে) বুদ্ধের মতই নাকি পূর্বজন্মে কি ছিলেন তা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। তারা প্রচার করেন এ রকম পুনর্জন্ম বহুবার ঘটবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নির্বান, মুক্তি বা মোক্ষলাভ না ঘটবে। শুধু সময়ের আবর্তনে সব ঘুরবে। মানুষ তার চতুষ্পার্শে প্রকৃতির মাঝে চক্রাকারে ঋতুতে ঋতুতে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেই এসব ধারণায় উপনীত হয়েছিল।

মানুষের এ অভিজ্ঞতা এবং সময়ের পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন হয়েছে। খৃস্টপূর্ব ৫ম–৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীয়ান-গ্রীক দার্শনিক পারমেনিডেস, জেনো প্রচার করেন যে শুধুমাত্র যুক্তিই চিরসত্য। অভিজ্ঞতার চাইতেও বাস্তবতার যুক্তি মূল্যবান। তাই বাস্তবতা হচ্ছে একক এবং চিরস্থায়ী। তাই সময় হচ্ছে মনের ভুল।

ভারতীয় মায়াবাদীরাও মনে করতেন যে এ জগতে সময় জীবন সবকিছুই হচ্ছে মায়া, ফাঁকি। খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ইরানী ধর্ম প্রচারক জরোথ্রস্ট প্রচার করেন যে স্বল্পকালীন মানবজীবনে দুঃখ কষ্ট পাবার পর রয়েছে মৃত্যুর পর অনন্তজীবন–শেষ বিচার হবে

www.pathagar.com

সবাইকে তার কর্মফলের জন্য হিসেব দিতে হবে, তারপর মিলবে তার পুরস্কার। এখানেই শেষ হবে সময়ের। সময়হীন মহাকালের এক বিরতির ঘোষণা হবে তখন। ফেরাউনের মিশরে, ইহুদীরা, খৃস্টানরা এবং মুসলমানরা এতে বিশ্বাসস্থাপন করেছে।

চীনারা, হিন্দুরা ও গ্রীকরা মনে করে যে সময় ধাপে ধাপে ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত হয়। প্রথমে 'ইন' বা নিষ্ক্রিয় স্ত্রীরূপের প্রকৃতি রাজত্ব করে এরপরে 'ইয়াং' বা পুরুষ প্রকৃতি রাজত্ব করে। চূড়ান্ত সীমায় যাবার পর তাদের লয় শুরু হয় এবং দ্বিতীয়জন তার রাজত্ব শুরু করে। তেমনি দিন-রাত্রি, শুভ-অশুভ, সাদা-কালো তাদের সময় অতিবাহিত করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

ইটালীয়ান গ্রীক দর্শনের গতিহীন সময়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন 'এমফিডোক্লস'। তিনি বলেন চারটি পদার্থ (মাটি, বায়ু, পানি, আগুন) এবং 'ভালবাসা' ও 'শত্রুতা' নিয়ে বিশ্বজগৎ বয়ে চলছে। প্ল্যাটো তার এ ধারণাকে বিকশিত করেন নব পর্যায়ে যে, দেবতারা মহাশূন্যকে পরিচালনা করেন; স্টার্ট দেওয়ান এবং তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। একেবারে বারোটা বাজার একটু আগে তারা হস্তক্ষেপ করেন। এভবেই চলতে থাকে সৃষ্টি। পর্যায়ক্রমে এ কাজ তারা করে থাকেন।

হিন্দুরাও এ মতে পৌছেছে। তাদের 'কল্প' পরিবর্তন, ব্রহ্মার দিন-রাত্রি এ ধারণারই পরিচায়ক। মায়া সভ্যতার ধারকরাও এরকম ধারণা করত। হিন্দুরা ও 'মায়া'রা খুব নিখুতভাবে তাদের 'কাল' গণনা করে এসেছে। এটাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সময় সম্বন্ধে তাদের এই বিস্ময়কর জ্ঞান বিংশ শতাব্দীতেও অভাবনীয়।

প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টোটল মনে করতেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মতই মানবসমাজ ও ছন্দে ছন্দে ভাল-মন্দের আধিপত্যে গড়বে, ধ্বংস হবে আবার শুরু হবে।

প্রাচীন মিশরীয় ও চীনা সভ্যতার উদয় এবং ক্ষয় এ রকম চক্রাকারে ঘটেছিল। সাম্প্রতিককালে ইটালীর ইতিহাসবিদ গিয়ামবাতিস্তা ভিকো গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রাচীন গ্রীক রোমান সভ্যতার মতই বিভিন্ন সময়ের চক্রে বর্তমানের পশ্চিমা সভ্যতার উন্নতি ঘটছে।

জার্মান বিজ্ঞানী অসওয়াল্ড স্পেনগ্লার বিভিন্ন সভ্যতায় একটি তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে প্রত্যেকটি সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে আবার জাগে।

২.২ : ইতিহাসের দর্শনে একমুখী সময়ের ধারণা

'সব শুরুর শেষ আছে', এ ধারণা থেকেই বলা হয় সময়ের শুরুও যেমন আছে, তার শেষও তেমনি আছে। আর এমনি ধরাবাঁধা সময়ের কথা কল্পনা করা যায় ঠিক তখনি যদি কোন সময়হীন শক্তি সময়ের এই ঘড়িটাকে চাবি দিয়ে চালু করে দেন, তাহলে তিনিই পারবেন এর গতিকে বন্ধ করতে। কিন্তু তাকে থাকতে হবে সময়ের বাইরে। এমনি এক ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করতে হয়েছে মানবজাতিকে সেই প্রাচীনকালে। যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, সময় দিয়ে তার কিছুই আসে যায় না। এমনি এক ঈশ্বর

www.pathagar.com

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সাজান মনের আনন্দে। তিনিই জীবজগতের জন্য সময়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের জন্য নবী পাঠান। তাদেরকে সাবধান করে দেন ধ্বংসের কথা বলে। সোজা কথায়, প্রত্যেকের সময় নির্ধারিত, এটা শেষ হবেই হবে। সুতরাং সময় থাকতেই মানবজাতিকে সচেতন হতে হবে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তার আদেশ নিষেধ অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে। মোটামুটি এটাই হচ্ছে সব ধর্মের সার কথা।

বিংশ শতাব্দীর অপর এক দার্শনিক কার্ল জাস্পার সময়ের "অক্ষ বয়স" বিন্দু বের করেছেন এভাবে—ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক যখন কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, জোরাস্ত্র, ডিয়াটেরো ইসাইয়া এবং পীথাগোরাস জন্ম নেন প্রায় একই সময়ে। এ অক্ষ-বিন্দুকে যীশু খৃস্ট এবং হজরত মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত বর্ধিত করলে এর সার্থকতা বোঝা যায়। এ সময়টাকে বলা হয় মানবচেতনার শীর্ষবিন্দু যখন চরম শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এটা ছিল সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু সর্বশক্তিমান কালের আওতার বাইরের ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছোড়া হয়েছে যুগে যুগে।

কোন কিছুর বাইরে শুধু শূন্য থেকে সময়ের সৃষ্টি হয়েছে এটা কল্পনা করা বেশ কষ্টসাধ্য। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি না করে শুধু বস্তুজগতকে বিন্যস্ত করে থাকেন বা সাজান তাহলে বুঝতে হবে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন সত্ত্বার অধিকারী বস্তুর বেপরোয়া ধর্মের কথা স্বীকার করে নিতে হয়। প্ল্যাটো তার 'টাইমাস' বা 'সময়' প্রবন্ধে ঈশ্বরকে এমনভাবেই উপস্থাপিত করেছেন এবং 'শয়তান' বা 'দুষ্ট প্রকৃতিকে' এর মাঝে ঢুকিয়েছেন। জরোস্ত্র জগৎকে দেখেছেন 'মন্দ দেবতা' ও 'ভাল দেবতার' মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুদ্ধের কালকে ধরেছেন সময় হিসেবে। যদিও তার মতে সবশেষ 'ভাল দেবতাই' জিতবেন। তথাপি তিনি বলতে চাচ্ছেন যে ঈশ্বরকে যুদ্ধ করেই জিততে হবে, এটা আপনাআপনি 'ফ্রিলাঞ্চ' হবে না তার জন্যে। এ ধারণা থেকেই ইহুদী ও খৃস্টানরা 'শয়তানের' ধারণা ধার নিয়েছে।

ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী থেকে জরোস্ত্রর এ ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সত্য চিরদিনই শেষ পর্যন্ত জিতে থাকে। মানবজাতির উদ্ধারের জন্য একজন ত্রানকর্তা বেরিয়ে আসেন এবং কিছুকালের জন্য হলেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন—শান্তির রাজত্ব শুরু হয়-চলতে থাকে মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি-বিকশিত হয় সমাজ সংস্কার, সংস্কৃতি। ডারউইনের "যোগ্যতমের উর্ধ্বতন" এ সূত্রের কথাই বলে। এমপিডক্লোসের দর্শনকে বাড়িয়ে নেন লুসিপাস ও ডেমোক্রিটাস—তারা পদার্থের আণবিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছেন। বাস্তবতাকে বর্ধিত করেন চোখের আগে পরে অণুর কল্পনা পর্যন্ত, এটা আড়াই হাজার বছর আগে একটা বিরাট বিপ্লব বৈকি। ডেমোক্রিটাস ও ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ সময় যে নিত্য, বাস্তব এটার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হেরাক্লিটাস মনে করতেন 'সংগ্রামই হচ্ছে জীবজগতের বিকাশের জন্য অপরিহার্য উপাদান'। বিরুদ্ধতা, সংগ্রাম, অস্বীকৃতি হচ্ছে উন্নতির মোটিভ শক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক হেগেল এ মতবাদকে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'সংশ্লেষক' এবং 'প্রতিসংশ্লেষণে'র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, টানাপোড়নের ঠেলায়ই ফল

www.pathagar.com

হিসেবে বেরিয়ে আসে প্রগতির শক্তি। হেরাক্লিটাসের দর্শনকে কার্ল মার্ক্সই তার বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব সমস্যায় রূপান্তরিত করেন এবং প্রমাণ করেন যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। এ সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী এটা মার্কস এবং তার অনুসারীদের দৃঢ়বিশ্বাস।

আজকের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে যে, ইতিহাস খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সময়ও দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষের চিন্তার জগতে সময়ের ধারণা বদলে গেছে। ধরতে গেলে পালেওলিথিক যুগের সর্বোচ্চ সীমায় আজ থেকে ৩০,০০০ বছর আগেই সময়ের দ্রুত চলা শুরু হয়। বিরাট বিরাট লাফে মানবজাতি এগিয়ে চলছে সামনে। কৃষির প্রসারের সঙ্গে মানবসভ্যতা এক নতুন রূপ নিয়েছে। গত দু শতাব্দী ধরে মানুষ প্রকৃতির গুপ্ত সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। নবী বা ধর্ম প্রচারকেরা সময়ের চরম সীমার কথা যা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা মনে হয় গনিয়ে আসছে। পৃথিবীর শেষদিন বা 'রোজ কেয়ামত' আজ আর কেবল বিশ্বাসের ব্যাপার নয়—এটা পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ফসল।

চারশত বৎসর আগে ফ্রান্সের নস্টারডামুস ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন ১৯৯৯ সালের ৭ই জুলাই আণবিক যুদ্ধে মানবজাতি ধ্বংস করবে নিজদেরকে। এ বৎসর ঐদিন এই ব্যাপারটি ঘটেনি, বলা হচ্ছে হিসেবে ভুল ছিলো, ব্যাপারটি ঘটবে সামনে। ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ এডগার কেইসী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক—অশিক্ষিত কিন্তু বেশ চমকদার সব তথ্য দিয়ে গেছেন স্বপ্নাবেশে—যা নিয়ে আজও গবেষণা চলছে) এরকম অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে গেছেন মানবজাতির বিজ্ঞানে উন্নতির বিষয়ে যা তার সময়ে ছিল অবাস্তব। তারা সময়কে অতিক্রম করে গেছিলেন।

২.৩ : নিউটনীয় গতিবিদ্যায় সময়

নিউটনীয় গতিবিদ্যায় সময়কে পরম বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থাৎ অনুমান করা হয় যে সব জড়কাঠামোর দর্শকের কাছে যথাযথভাবে মেলানো ঘড়ি আছে এবং একই ঘটনার সময় সব দর্শকের কাছে একই। প্রত্যেকটি জড়কাঠামোর সর্বত্র এই ধরণের মেলানো ঘড়ি আমরা রেখে দিতে পারি। কোন ঘটনার সময় তার নিকটবর্তী ঘড়ি থেকে জানা যাবে। নিউটনের পরম সময়ের অর্থ এই যে প্রত্যেক প্রসঙ্গ—কাঠামোর সর্বত্র আমরা স্থায়ীভাবে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারি। কোন ঘটনার সময় এইসব ঘড়িতে একই সময় পাওয়া যাবে।

আইজাক নিউটন 'আপেক্ষিক', 'মনে হয়' এবং 'সাধারণ সময়' থেকে 'পরম সময়'কে বিচ্ছিন্ন করেন তার বস্তুর 'গতির সূত্র' দিয়ে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য, গ্যালাক্সি এরা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল। পৃথিবীর গতিপথের অসম অবস্থার জন্য ঘূর্ণনের সময়ের তারতম্যের দরুন 'আপেক্ষিক' ও 'পরম' সময়ের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। নিউটনের দেশ-কালের পরম আধিভৌতিক ধারণাকে জার্মান দার্শনিক এমানুয়েল কান্ট বিকশিত করেন। যেকোন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে কোন স্থানের বিন্দুতে (দৈশিক) এবং কালিক (সময়) মুহূর্তে সংঘটিত হতে হবে। কোন বস্তুরই স্থান ও কালের বাইরে থাকার উপায় নেই।

www.pathagar.com

তবে দেশ ও কাল আমাদের সংবেদন বা অভিজ্ঞতার উপাত্তের অংশ নয়। এরা আবার অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারণাও নয়। কান্টের মতে, এরা ইন্দ্রিয়স্বজ্ঞা বা প্রতক্ষণের প্রাক-সিদ্ধ আকার। আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দেশ ও কালকে মনের সামনে উপস্থিত করে না। আমাদের মনই যাবতীয় সংবেদনকে দেশ ও কালের পরিচ্ছদে সজ্জিত করে। এ জন্যই দেশ ও কালের জ্ঞান প্রাক-সিদ্ধ বা প্রত্যক্ষ-পূর্ব, প্রত্যক্ষোত্তর নয়। এ জ্ঞান না থাকলে কোন সংবেদনই প্রতীতিতে পরিণত হতে পারে না। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের দেশকালের জ্ঞান হয় না, বরং দেশ-কালের কল্যাণেই অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়।

দেশ ও কাল যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব, এ কথাটি কান্ট পরাতাত্ত্বিক ও অতীন্দ্রিয় এই দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। হেগেলের মতে, দেশ ও কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার একটি গভীর শর্ত ও নিয়মের দ্বিবিধ প্রকাশ। আর এ নিয়মটি হলো কার্যকারণ নিয়ম। বস্তুজগতের অসংখ্য বস্তু ও ঘটনার কোনটিকেই কারণ ছাড়া প্রত্যক্ষ করা যায় না।

শত শত দার্শনিকের এ রকম দার্শনিক বচন রয়েছে দেশ ও কাল সম্পর্কে। এখন আমরা দেখব বিংশ শতাব্দিতে সময়ের ধারণার কি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে তার ধারা বর্ণনা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার দর্শনে সময়ের ধারণা

৩.১ : বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও সময় (দেশকাল)

যে কোন ঘটনার সময়ের কথা আমরা যখন বলি তখন ঘটনার প্রসঙ্গ কাঠামোয় মিলিয়ে নেয়া ঘড়ি দিয়ে মাপা সময়ের কথাই বলি। দুটি জড়কাঠামো পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবিশিষ্ট। কোন ঘটনার সময়ের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রসঙ্গ কাঠামো আমাদের জানা প্রয়োজন কারণ তা না হলে সময়ের কোন অর্থ হয় না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের আগে আমাদের ধারণা ছিল যে সময় একটি পরম রাশি এবং তা বস্তুর উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এ ধারণা ভিত্তিহীন কারণ সময় মাপার জন্য যে ঘড়ি আমরা ব্যবহার করি তা মেলানোর জন্য যুগপৎ বা একই সময়ের ধারণা ব্যবহার করতে হয় এবং তা হচ্ছে আপেক্ষিক।

সময়ের পরমত্ব যদি আমরা বাদ দেই তবে আপেক্ষিকতার নীতি এবং আলোর গতিবেগের ধ্রুবত্ব এই দুইয়ের সঙ্গে যে আপাতবিরোধ তা আর থাকে না। সময়ের ধারণা প্রত্যেকের নিজের ঘড়ি থেকে নেয়া এবং দুই সময়কে এক ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই জন্যই প্রত্যেক জড়কাঠামোর দর্শক তার নিজস্ব দৈর্ঘ্য মাপার দণ্ড এবং সময় মাপার যন্ত্র ব্যবহার করে আলোর যে গতিবেগ পায় তা বিশ্বব্যাপী ধ্রুবসংখ্যা। দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক, সময়ও আপেক্ষিক শুধুমাত্র আলোর গতিবেগ একটি জড় কাঠামোয় নিরপেক্ষ ধ্রুবরাশি। **আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের এটাই মূলভিত্তি।**

মহাবিশ্বে কোন বস্তুই স্থির নয়। সবাই ঘুরছে। তাই সব গতিই হচ্ছে আপেক্ষিক। একের তুলনায় অন্যের গতিবেগই হচ্ছে আপেক্ষিক গতি। কোনও বস্তুর নিজস্ব গতি বলে কিছু নেই। ঐ থেকেই তত্ত্বটার নাম আপেক্ষিকতাবাদ।

পৃথিবী সূর্যকে, সূর্য ভেগা নক্ষত্রের দিকে গ্যালাকটিক সিস্টেমকে ঘিরে পাক খাচ্ছে; গোটা গ্যালাকটিক সিস্টেম আবার আবর্তিত হতে হতে একদিকে ছুটে চলেছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গতির ছন্দে আবদ্ধ, কেউ স্থির নেই। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই। কোন কিছুই গতিহীন হতে পারে না। সবাই চলেছে পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক বেগে। স্থান ও কাল পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রতিটি বস্তু এই অপরিবর্তনীয় আইন মেনে চলে। সময় ধ্বংস হলে স্থানের অস্তিত্ব লোপ পায়। স্থান ধ্বংস হলে সময়ের ধারণাও আর থাকে না। কেন এটা এমন হয় তা কেউ জানে না।

www.pathagar.com

আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা হল এই যে কোন জাগতিক বস্তু গতিবৃদ্ধি করতে করতে আলোর গতির সমান হতে পারবে না, বা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার। এ সূত্রে আরো বলা আছে গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর 'ভর'ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার শক্তিরও বৃদ্ধি হয়; কারণ, একই গতিসম্পন্ন দুটি বস্তুর মধ্যে যদি একটার ওজন (ভর) বেশি হয় তবে সেটি বেশি শক্তিশালীও হয়। আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখলেন—ভর-বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে সেটার পরিমাণ ভর-বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর গতির বর্গের গুণফল। এ থেকে আরো সিদ্ধান্তে আসা গেল যে কোন বস্তুর সম্পূর্ণ ভরকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আইনস্টাইন তার ঐ ক্ষুদ্রতম সমীকরণ সূত্রে $E = mc^2$ প্রমাণ করেন। যেখানে E হচ্ছে শক্তির পরিমাণ, m হচ্ছে ভর এবং c যথারীতি আলোর গতি।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তিনি বললেন, কণা মাত্র বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ধারণাতীত শক্তির জন্ম দেয়া যাবে। আপেক্ষিকতাবাদ আরও কলছে—আপেক্ষিক গতির বৃদ্ধির সঙ্গে সময়ের ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। এতদিন ধরে আমরা জানতাম 'কাল' যেন একটি প্রবহমান নদী—যার গতি অপরিবর্তনশীল। যে মুহূর্তটি অতিক্রান্ত তাকে আর কিছুতে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আইনস্টাইন এই ধারণাটার মূলেই কুঠারাঘাত করলেন। আর্দ্রা নক্ষত্র-পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে। (প্রতি সেকেন্ডে আলো ১ লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলতে চলতে ১ বছরে (৩৬৫ দিন × ২৪ × ৬০ × ৬০ যত দূর যাবে (৫৩.৮৮×১০^{১২} মাইল) ততটুকু দূরত্বকে ১ আলোক বর্ষ বলে।) সেখানে বসে যদি কোন দর্শক আজ, এই মুহূর্তে ঢাকা শহরকে দেখতে পায় তবে সে দেখতে পাবে নবাব শায়েস্তা খানকে। কারণ ঐ সময় পৃথিবী থেকে যে আলোকরশ্মি রওয়ানা হয়েছিল আজই তো তা আর্দ্রা-নক্ষত্রে পৌঁছালো। আর্দ্রার নক্ষত্রের বদলে দর্শকটি যদি থাকে এন্ড্রোমিডা-গ্যালাক্সিতে তাহলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে কোন 'মানুষ'কে দেখতে পাবে না—মানুষ তখনও আসেনি পৃথিবীতে। দেখতে পাবে ম্যামথ আর স্যাবর টুথেড্ খড়্গ-দন্ত বাঘদের। তাহলে কেমন করে বলি অতীতের মুহূর্তটিকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনা যাবে না?

সময় শ্লথগতি হওয়ার বিষয়ে আর একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একটি রকেটে করে পাঁচজন যাত্রী নিয়ে স্বাতী নক্ষত্রের দিকে রওয়ানা দিন। **স্বাতী নক্ষত্র 'বুটিশ' মণ্ডলে এবং তার দূরত্ব তেত্রিশ আলোকবর্ষ**। ধরা যাক, রকেটের গতিবেগ আলোর গতির খুব কাছাকাছি। তাহলে ঐ গতিবেগে ছুটলে আমাদের কল্পিত রকেটটি তেত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ে ঐ স্বাতী নক্ষত্রে পৌঁছবে। তৎক্ষণাৎ সে একই গতিবেগে পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হলে **ছেষট্টি বছরের** কিছু পরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

যেহেতু রকেটের গতিবেগ ছিল আলোর গতির কাছাকাছি, তাই নভোচারীদের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় অনেক ধীর গতিতে চলেছে। ওদের কাছে এই ছেষট্টি বছর সময়কাল হয়তো এক মাসের বেশি মনে হবে না। তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে তাদের তরুণী পত্নীরা পলিতকেশা বৃদ্ধা। আর দু বছরের ছেলে ওদের চেয়ে চল্লিশ বছরের বড় দেখাবে।

www.pathagar.com

মোটকথা, এ যাবৎকাল 'সময়' সম্বন্ধে আমরা যে ধারণাটা পোষণ করে এসেছি সেটাই ভ্রান্ত। 'কাল' কোন একমুখী সমগতিতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান স্রোতের মত নয়। 'কাল' হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অঙ্গ, যার অপর অঙ্গ হচ্ছে 'স্থান'। স্থান ও কাল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত।

আপেক্ষিকতাবাদ থিয়োরী বলছে, কোন দুটি বিন্দুর দূরত্ব বোঝাতে 'সময়'-এরও একটা ভূমিকা আছে। আইনস্টাইন জানালেন, দূরত্ব মাপা যাবে দুটি বিন্দুর নয়, দুটি ঘটনার যে দুটি ঘটনা ঘটেছে ত্রি-মাত্রিক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) স্থানিক দূরত্বে এবং এক-মাত্রিক (একদিকে) সময়ের ব্যবধানে। টেনসর ক্যালকুলাসে এ ধরণের অঙ্ক কষা হয়।

৩.২ : সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও সময়

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে অভিকর্ষ শক্তির ব্যাখ্যা আছে ভাল করে। আমরা ইতিপূর্বে যা আলোচনা করেছি তা হল বিশেষ আপেক্ষিক থিয়োরী—বিশেষ বিশেষ সমস্যার জবাব।

একটি গোলাকার বস্তুর (পৃথিবী, তারা) পৃষ্ঠদেশে কোন ঘটনার 'সময় ও স্থান' যদি বৃত্তাকারে আগের অবস্থানে ফিরে আসে তবে এজন্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেমন ঘটবে, তেমনি ঘটনাকে এমনভাবে বৃত্তে স্থাপন করা যাবে যাতে ঐ ঘটনা আর ঘটবে না। সাধারণ আপেক্ষিক সূত্রে বলা হয় অভিকর্ষ ক্ষেত্রে সময় ধীরে বহে। অভিকর্ষের শক্তিতে স্থান বেকে যাওয়াতে কালও তার গতি হারায়। পাহাড়ে উঁচু নিচু ১ মাইল পথ চলা আর সমতল স্থানে ১ মাইল পথ চলার যে পার্থক্য অনেকটা এরকমই ঐ থিয়োরীতে বলা হয়েছে। পাহাড়ে ১ ঘন্টায় ১ মাইল গেলে মনে হবে অনেকক্ষণ ধরে পথ চলছে পথিক। পথ শেষ হচ্ছে না।

নিউটনের ধারণা—সূর্য অভিকর্ষের টানে পৃথিবীকে টানছে বলেই পৃথিবী ক্রমাগত তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, এ ধারণাটাই ভুল। আইনস্টাইন বললেন—আসলে সূর্যের ভর তার সন্নিকটস্থ স্থান-কাল সম্পৃক্ত বিশ্বকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে; আর সেই বক্র মহাকাশে পৃথিবীর ঐ ভাবে চলা ছাড়া উপায় নেই। সোজা কথায় মহাকাশে যেখানে যেখানে বড় বড় নক্ষত্র আছে, গ্যালাক্সি আছে, সেখানেই মহাকাশ একটু বেঁকেছে বা তুবড়েছে। এখানে 'মহাকাশ' মানে শুধু স্থানবাচক মহাশূন্য নয়, স্থান ও কালের সম্পৃক্ত বিশ্বাকাশ। মহাকাশের তো উপর-নিচ নেই, তাই তুবড়েছে বা টোল খেয়েছে না বলে ফুলে উঠেছে বললেও ভুল হয় না।

অভিকর্ষ ক্ষেত্র যদি খুব শক্তিশালী হয় তা হলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। কোন তারকা ধ্বংস হয়ে গেলে পর যখন কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয় (এ প্রসঙ্গে পরে আমরা আসব) তখন এর ভিতর থেকে আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণবিবর উৎসের তারাটির কেন্দ্র থেকে ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের (critical radius) মধ্যে কোন বস্তুকে আসতে অসীম সময় লেগে যাবে—এটা বাইরের কোন দর্শকের কাছে মনে হবে। কিন্তু বস্তুটির নিজের কাছে সময় লাগবে সামান্য মুহূর্ত মাত্র। কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরে স্থান ও কাল বেকে যায়।

www.pathagar.com

৩.৪ কালো গহ্বর বা কৃষ্ণবিবর (ব্ল্যাক হোল)

সাম্প্রতিককালে জ্যোর্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে নিয়ে বেশ উত্তেজনাকর আলোচনা চলছে তা হল ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সূর্যের ভরের সমান বা তার দেড়গুণ পর্যন্ত ভর বিশিষ্ট তারাগুলি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে যখন সব হাইড্রোজেন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলে, তখন এদের কেন্দ্রের বিক্রিয়াজনিত বিকিরণ চাপ কমে যেতে থাকে; ফলে মহাকর্ষ ও বিকিরণ বলের পার্থক্য বাড়তে থাকে। মহাকর্ষ বলের ঠেলায় কেন্দ্রের পদার্থ আরো সঙ্কুচিত হয় এবং বিকিরণ চাপে বাইরের গ্যাসীয় আবরণ বাড়তে বাড়তে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রটি তখন সাদা বামন তারায় পরিণত হয়; এ অবস্থায় তারাটির আয়তন আগের আয়তনের একশত ভাগের একভাগে পরিনত হয়।

তারাটির কেন্দ্রকণার ঘনত্ব এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, মহাকর্ষ চাপে পরমাণুর কেন্দ্রকণার ইলেকট্রন আবরণ ভেঙে পড়ে, এক সময় জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তারাটির ভিতরের তাপ বিকীর্ণ হতে থাকে এবং সে তাপও একদিক নিঃশেষ হয়ে যায়। তারাটি শীতল কালো বামন বা বেটে তারায় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় যদি একটি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের আড়াইগুণেরও বেশি থেকে যায়, তাহলে কোন প্রাকৃতিক শক্তিই ঐ নক্ষত্রটিকে আর এর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অভিকর্ষ বলের চাপে নক্ষত্রটি ক্রমাগত গুটিয়ে যেতে থাকবে—আয়তন ক্ষুদ্র থেকে আরো ক্ষুদ্রতর হবার দিকে এগিয়ে চলবে দ্রুত গতিতে। কেন্দ্রের দিকে ধ্বসে পড়তে থাকা তারার আয়তন যত কমে আসবে এর অভিকর্ষ বলের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বাড়বে। আবার অভিকর্ষের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, নক্ষত্রের ধ্বসও তত দ্রুত বাড়তে থাকে।

আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে বলেছিলেন যে একটি নক্ষত্রের আলো সূর্যের পাশ ঘেষে যাবার সময় সূর্যের জোরালো অভিকর্ষের টানে আলোক রেখাটি বেকে যাবে-সোজা কথাটা হল এই যে, অভিকর্ষের প্রভাবে ক্ষেত্র বক্রাকৃতি লাভ করে; শুধু ক্ষেত্রও নয়, সময়ের গতিও মন্থর হয়ে আসে, সময়ও যেন বক্রতা লাভ করতে থাকে। কোন অভিকর্ষ বল যত জোরালো হতে থাকবে এর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র ও সময়ের বক্রতাও তত বেড়ে চলবে।

এ জাতীয় একটা পরিস্থিতি যত চলতে থাকবে, নক্ষত্রটির অভিকর্ষের মাপটাও বিরাট হয়ে উঠবে। ধ্বসে পড়ার সর্বশেষ পর্যায়ে নক্ষত্রটির অভিকর্ষের মাপ এমন এক চরম মাত্রায় (critical stage) গিয়ে পৌঁছল যে, ক্ষেত্র ও সময়ের বক্রতাও তার সর্বোচ্চ মাত্রাকে গেল ছাড়িয়ে, আলোও তার উৎসের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ল।

সময়ের গতি হয়ে পড়ল চূড়ান্তভাবে স্তব্ধ। বাইরের জগতের সঙ্গে বস্তুটির সমস্ত যোগাযোগের সূত্র হারিয়ে গেল। মহাবিশ্বের কোল থেকে বস্তুটি যেন চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য বস্তুটিই হল কৃষ্ণবিবর। সূর্যের তিনগুণ ভর বিশিষ্ট একটি নক্ষত্রের ব্যাস যখন অভিকর্ষবলজনিত সংকোচনের প্রভাবে মাত্র ১৭ কিলোমিটারে এসে দাঁড়ায়; তখন মহাবিশ্ব থেকে বস্তুটির পুরোপুরি অন্তর্ধান ঘটে। ঐ বস্তুটির ভিতরে কি ঘটনা ঘটে, তা আমাদের জানার উপায় নেই ! কেননা আলো বা বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে কোন সংকেতই ঐ বস্তুটি থেকে আমাদের কাছে পৌছায় না। এক বিরাট অন্ধকারের জগতের ভেতর তলিয়ে বসে আছে এই অতি ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্রটি, তাই এর নাম কৃষ্ণবিবর। কোন মানুষ তার নিকটে গেলে রকেটে চড়ে সেখান থেকে সে আর কোনদিন ফিরে আসতে

www.pathagar.com

পারবে না। কোন সিগনালও পাঠাতে পারবে না সে। কোনো সিগনালই মহাকর্ষ বল কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাকে একটা কালো গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখা যাবে। তারপরে সে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমাদেরই ছায়াপথেই নাকি দশ কোটি কালো গহ্বর অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, কালো গহ্বর পর্যায়েই মহাকর্ষজনিত সংকোচন শেষ হয়ে যায় না। এরপর কালো গহ্বরও ক্রমাগত সঙ্কুচিত হতে হতে প্রায় শূন্য আয়তনের পদার্থে পরিনত হয়। অত্যাধিক ভর বিশিষ্ট তারার সৃষ্ট কালো গহ্বর, নিজ মহাকর্ষ চাপে এত বেশি সঙ্কুচিত হতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত একটা পরমাণুর আকার ধারণ করে এবং একটা গাণিতিক বিন্দুতে পরিনত হয়। কালো গহ্বরের কেন্দ্রে অবস্থিত এই অতি ক্ষুদ্র, অতি সঙ্কুচিত বস্তুকে 'এককত্ব' (singularity) বলা হয়। এই এককত্ব, কালো গহ্বর দ্বারা বেষ্টিত। মাঝখানে কয়েক কিলোমিটার জায়গা সম্পূর্ণ খালি। কোন বস্তু সে জায়গার মহাকর্ষ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।

একটি কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রে Singularity রূপী একক বিন্দুতে চাপ, বস্তুর ঘনত্ব এবং ক্ষেত্রও সময়ের বক্রতা সবই পৌঁছায় প্রায় এক অসীম অঙ্কে। সেখানে প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমিত ক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব দাঁড়াতে পারে কয়েক লক্ষ কোটি টন। পদার্থ যে সেখানে সত্যি কি অবস্থায় রয়েছে, তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই; কারণ বর্তমানের কোন জ্ঞান, সূত্র দিয়ে এটা অনুধাবন করা যায় না।

একটি কৃষ্ণ গহ্বরের ভেতর যদি আমরা যাবার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে একটি শীর্ণ আলোক বৃত্তকে (Photon Sphere) কৃষ্ণ গহ্বরটির ওপর পরিক্রমারত অবস্থায় আমরা দেখতে পাব। তারপরই আমরা প্রবেশ করব ঘটনারূপী দিগন্তের বৃত্তের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সর্বশেষে, এক সেকেন্ডের এক লক্ষ ভাগ সময়ের মধ্যে আমরা কৃষ্ণ গহ্বরের একেবারে কেন্দ্রের ওপর (Singulaity) গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ব—যেখানে ক্ষেত্র ও সময়ের এক অসীম বক্রাকৃতির মধ্যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব যেন একবারে লোপাট হয়ে বসে আছে। সোয়ার্তচাইল্ড নামে এক পদার্থবিদ এই তত্ত্বের ক্ষেত্র সম্পর্কিত সমীকরণগুলোর সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন। যার উপর ভিত্তি করে কৃষ্ণ গহ্বরের মডেল নির্মাণ করা হয়। এটা হচ্ছে এমন একটি বস্তু, যা রয়েছে স্থির অবস্থায়, চেহারাটা যার বর্তুলাকৃতি, আপন অক্ষের চারপাশে যে ঘূর্ণমান নয় এবং যার কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। এখন প্রশ্নটা হল এমন একটা কৃষ্ণগহ্বর আকাশে কেমন করে খুঁজে পাওয়া যাবে? কালো গহ্বরের পাশে যদি কোন তারা থাকে, তাহলে কালো গহ্বরের আকর্ষণে সেই তারা থেকে পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে, কালো গহ্বরের চারপাশে একটা চাকতির আকারে জমা হতে থাকে এবং কালো গহ্বরের ভিতরে গিয়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এক্সরে বিকিরণ করতে থাকে। এতেই কালো গহ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়। ১৯৯০ সনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশে হাবল দূরবীন স্থাপন করার পর ঐটির সাহায্যে এ পর্যন্ত কয়েক ডজন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা গেছে।

অন্যদিকে একটি আবর্তনশীল কৃষ্ণ গহ্বরের চারপাশে ক্ষেত্র ও সময়ের ধর্মাবলী কিরূপ নেবে, তা ১৯৬৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী রয়, পি, কার সমাধান করেন। এটা

www.pathagar.com

একটা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। এ জাতীয় একটি কৃষ্ণগহ্বর আমাদের বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারে অজানা অসংখ্য বিশ্বের। যোগাযোগের মাধ্যম হল White holes বা শ্বেত গহ্বর। এদেরও রয়েছে কেন্দ্রবিন্দু বা Singularity এবং ঘটনারূপী দিগন্ত বৃত্ত (event horizon)। অন্য বিশ্ব থেকে বস্তু বা শক্তি এই শ্বেত গহ্বরের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারে বা সোজা কথায় চালান হয়ে আসতে পারে। শ্বেত গহ্বর হল মহাবিশ্বের বস্তু এবং শক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন উৎস। শ্বেত গহ্বরের ভেতর থেকে জোরালো তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি সৃটি হচ্ছে।

কোন বস্তু কালো গহ্বর থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে এসে পড়লে, মহাকর্ষ বলের প্রভাবে বস্তুটিতে জোয়ার দেখা দেয়। এই দূরত্বকে কালো গহ্বরের জোয়ার ব্যাসার্ধ (tidal radius) বলে। বস্তুটির পদার্থ কালো গহ্বরের দিকে স্ফীত হয়ে উঠে এবং সেদিকে অগ্রসর হয়ে তার চারদিকে চাকতির মত জমা হতে থাকে এবং ঘুরতে ঘুরতে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়, যেখান থেকে সারাসরি কালো গহ্বরের ভিতরে গিয়ে পড়ে। এই জায়গাটিকে ঘটনা দিগন্ত (event horizon) বলে। সুতরাং দেখা যায় যে জোয়ার ব্যাসার্ধের বাইরে থাকলে বিপদের আশঙ্কা নাই। 'ঘটনা দিগন্তের' ভিতরে ক্রমে পড়লে আর রক্ষা নাই, একেবারে অতল কালো গহ্বরের ভিতর গিয়ে পড়তে হবে। প্রত্যাবর্তনের কোন আশাই থাকবে না একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কালো গহ্বর সাধারণ তারার চাইতে অনেক অনেক ছোট এবং সংখ্যায়ও কম। তাই তাদের সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল। কোন মহাশূন্যযানের চালক যদি কোন কালো গহ্বরের ঘটনা দিগন্তে গিয়ে পৌঁছোয় তাহলে সে তার মহাশূন্যযান সমেত সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় অতি ক্ষুদ্র এককত্বে বা কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুবে না, বরং এককত্বের চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

একটি গর্ত আবর্তিত হচ্ছে, এটা ভাবাই যায় না। প্রকৃত পক্ষে এর অর্থ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় এককত্ব কোন কিছুকে তার নিজের দিকে আকর্ষন করে না? বরং অনবরত পাশের দিকে আকর্ষণ করে। ফলে বস্তুটি কুণ্ডলিতভাবে গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করে। বস্তুটি যখন গহ্বরের যথেষ্ট ভিতরে এককত্বের নিকটে গিয়ে পৌঁছায়, তখন তার পার্শ্ববেগ বস্তুটিকে এমন কেন্দ্রাতিগ বল প্রদান করে যে, সেটা এককত্বের মহাকর্ষ বলের সাথে সমতায় উপনীত হয়। এই অবস্থায় তার আর কেন্দ্রের এককত্বে পৌঁছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভয় থাকে না তবে আমাদের এই বিশ্বে ফিরে আসারও সম্ভাবনা থাকে না।

কালো গহ্বরের তত্ত্বে আরো বলা হয় যে, বস্তুটির এই নিরাপদ আশ্রয়, অন্য বিশ্বের অনুরূপ অংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে। সেই অংশে অন্য বিশ্বের সাদা গহ্বরের কেন্দ্র অবস্থিত। এটি কালো গহ্বরের সম্পূর্ণ বিপরীত। কালো গহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ভিতরে গিয়ে পৌঁছলে বস্তু কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে থাকে। আর সাদা গহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ভিতরে পড়লে, বস্তুটি বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩.৪ : ব্ল্যাকহোল কি মৃত্যুর পরবর্তী আরেক জগৎ নাকি ভগবান বিষ্ণুর চোখের মণি।

ব্ল্যাক হোল নিয়ে দূরকল্পনার শেষ আর নেই। কোন নভোচারী যদি গ্যালাক্সির গহীনে যেতে যেতে প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে সিগন্যাল পাঠাতে থাকে . . . হঠাৎ যদি সে

www.pathagar.com

কৃষ্ণবিবর বা মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়া এমন কোন অন্ধকার তারার সোয়ার্চশিল্ড ব্যাসার্ধের ভিতরে এসে পড়ে তখন পৃথিবীতে তার বন্ধুরা আতঙ্কের সঙ্গে দেখবে যে, নভোচারীর সিগন্যাল আর প্রতি সেকেন্ডে আসছে না, আসছে অনেক দেরী করে এবং মাঝে মাঝে . . . তারপর ঘণ্টার পরে, বৎসর পরে, শতাব্দী পরে . . . তারপর কোনদিন আর কোন সিগন্যাল আসবে না। আর ঐ দিকে নভোচারী নিজের ঘড়ি দেখে প্রতি সেকেন্ডেই পাঠিয়ে যাচ্ছে সিগন্যাল।

এ রকম ক্ষুদে তারা শুধু অভিষ্ট বলের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। এ উদাহরণটাকে তুলনা করা যেতে পারে জীবন থেকে মৃত্যুতে গমন করার সঙ্গে। পৃথিবীর লোকদের কাছে ঐ নভোচারী মৃত, সে আর ফিরে আসবে না কোনদিন। আর নভোচারী নিজে কৃষ্ণ বিবরে চিরদিনের জন্য বন্দী হয়ে পড়ল। এখানে তার মৃত্যু নেই। যুগে যুগে **দার্শনিকেরা বলে গেছেন মৃত্যু হচ্ছে জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমন করা মাত্র**। এটাই এখানে প্রমাণিত হচ্ছে। জ্যোর্তিবিদদের কাছে সোয়াৎশ্লীডের ব্যাসার্ধ পর্যন্তই দেশ-কালের সীমানা তারপর কৃষ্ণ বিবরের ভিতরে সাইকোবাইওলজিক্যাল বাস্তব চেতনা নভোচারীর অবস্থান—'অহং' এর শেষ আবাসস্থল ঐ এককবিন্দু। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা খুব উঁচু ধরণের উদাহরণ হচ্ছে বক্ষ্যমান তত্ত্বটি।

নভোচারী ঘটনা দিগন্তে ঢুকার সময় শেষবারের মত কলসীর কোণার উপর দিয়ে বাইরে যখন তাকাবে সে দেখবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের শেষ পরিণতি-ভবিষ্যত, আর পিছন পানে ফিরলে দেখতে পাবে বিশ্বের অতীত। কয়েক মুহূর্তের ভিতর তারপর সে কৃষ্ণবিবরের গহন অতলে হারিয়ে যাবে চিরদিনের মত। এটাই হচ্ছে মানবজীবনের শেষ ট্রাজেডি—**মহাকালের অজানা রহস্য। সময় তার বিচিত্র যাত্রাপথে চলতে শুরু করার পর শুধু এখানে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে-স্তব্দ হয়ে যায় তার গতি। মৃত্যু ঘটে তার।**

মহাপ্রলয়ের পর একবার মার্কন্ডেয় পণ্ডিত বের হলেন বিশ্ব পরিভ্রমণে। সমুদ্রে পানির উপর ভাসমান এক বিরাট পুরুষকে শয়ান দেখে তিনি তার নাভী দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখেন সেখানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহাল তবিয়তে বর্তমান। ঐ পুরুষটি ছিল স্বয়ং নারায়ণ-ভগবান বিষ্ণু। মার্কণ্ডেয়র প্রশ্নের জবাবে বিষ্ণু জানান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস। কালের হাত থেকে ব্রহ্মারও রেহাই নেই। বিষ্ণু আরও দেখালেন নিজের চোখের কালো মনির ভিতর দিয়ে ঢুকে আবার বের হলেন তিনি। মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন ভগবান বিষ্ণুর চোখের ভিতর যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ দ্বার। বিষ্ণুর (লর্ড কৃষ্ণ স্বয়ং-তার এক রূপ) চোখের কালো মনিটুকু কি কোন ব্ল্যাক হোল? ঐ ব্ল্যাক হোল দিয়ে ঢুকে তারপর অন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উপনীত হওয়া যায়? ভগবান বিষ্ণু আরো দেখিয়েছিলেন তার পেটের ভিতরে এরকম অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে সীমাহীন সেই বিশ্বে জীবজগৎ রয়েছে সবই চলছে মহাকালের অমোঘ নিয়তি অনুসারে ধ্বংশ হচ্ছে, তারপর সৃষ্টি, বিবর্তন—এ খেলা মায়ার খেলা। বুঝতে বেজায় কষ্ট।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময়ের রথে যাত্রা হল শুরু

মার্কিন বিজ্ঞানী গ্যামো বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ২ × ১০^{২৩} মাইল। হিসেবটা আনুমানিক অবশ্যই। এই মহাবিশ্বে তারাজগত বা গ্যালাক্সির মোট সংখ্যা কত, তা জানার কোন উপায়ই নেই। আলোক দূরবীনের সাহায্যে এ পর্যন্ত হাজার কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সবচেয়ে জোরালো আলোক দূরবীনের নাগালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন বা এক লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি থাকার সম্ভাবনা। এবং এখানেই শেষ নয়। বর্তমানে আমরা টেলিস্কোপের সাহায্যে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দেখতে পারি।

এমন সব তারাজগৎ ও আবিষ্কার হচ্ছে সেখান থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লেগে গেছে ১৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। সুতরাং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বয়স অবশ্যই ১৫ বিলিয়ন বৎসরের বেশি বৈ কম নয়। বিশ্বজগতের সৃষ্টির সাথে সাথেই অবশ্য সময়েরও সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে তার যাত্রাপথ শুরু করেছিল সেই উষালগ্নে।

এই বিশাল মহাবিশ্বের জীবন নাট্যের শুরু করে কোথায়, কিভাবে এবং শেষ পরিণতি তার কি—এ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। মহাবিশ্বের সৃষ্টির ব্যাপারে দুটি তত্ত্ব রয়েছে বর্তমানে। একটি হলো স্থিতাবস্থাশীল তত্ত্ব (Theory of the evolving universe), অপরটি হলো স্থিতাবস্থাশীল তত্ত্ব (Steady state theory of the universe)।

এই মহাবিশ্ব যে প্রসারিত হয়ে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্নটা হল, এই প্রসারণের ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কবে? সময়ের রথে চড়ে আমরা যত পেছনের দিকে যাব দেখব তারাজগতেরা আজকের তুলনায় পরস্পরের অনেক কাছাকাছি ছিল। এভাবে পেছোতে পেছোতে আমরা সত্যিই এমন একটা সময়ে পৌঁছে যাই, যখন গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের ঘাড়ের উপর চড়েছিল। সেটা কবে?

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী আনুমানিক দু'হাজার কোটি বা ২০ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু ও শক্তি এক অতি ক্ষুদ্র আয়তনের (Zero volume) মধ্যে জড়ো হয়েছিল। গোটা মহাবিশ্বটাই ছিল যেন একটি একক বিন্দু বা Singularity যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪.১ : বিবর্তন তত্ত্ব

দু'হাজার কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সব বস্তু ও শক্তি এক মহাডিম্বের (Cosmic egg) ভিতর ভরা ছিল। কিন্তু এরা এলো কোত্থেকে, কে এদের সৃষ্টি করল কেন ও কিভাবে এবং সবাই এক জায়গাতেই বা জড়ো হলো কেন, এসব প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব আমাদের জানা নেই।

মহাডিম্বের ভিতরে সব পদার্থ ছিল শক্তি বা বিকীরণের আকারে। ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় ঐ বিকীরণপুঞ্জের ভেতরের তাপ দাঁড়িয়েছিল বহু লক্ষ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। শক্তির ঐ গোলকটির ব্যাস ছিল ২৭০ কোটি কিলোমিটার। এক বিপুল চাপের মধ্যে থাকার ফলে ঐ শক্তিপুঞ্জের ঘনত্ব ছিল এত বেশি যে, ওর প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষেত্রে শক্তির ওজন দাঁড়িয়েছিল দশ কোটি টন।

শক্তিরূপী ঐ মহাডিম্ব কতদিন ধরে একই অবস্থায় ছিল তা কারুর জানা নেই। হঠাৎ একদিন ওর মধ্যে বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিপুল শক্তি ওদের বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে চারদিকে ছুটল। ঐ বিস্ফোরণ থেকেই নাকি সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের। একেই বলা হয় বিগ ব্যাংগ (Big Bang) বা বিরাট বিস্ফোরণ বা মহাধ্বস। এ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন বেলজিয়ামের লেমেইতার ও আমেরিকার বিজ্ঞানী গ্যামো (রুশ অভিবাসী)।

বিস্ফোরণের সময় মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ চুম্বক বল, প্রবল কেন্দ্রকণীয় বল ও দুর্বল কেন্দ্রকণীয় বল, প্রকৃতির এই চারটি মৌলিক বল একত্রীভূত ছিল। বিরাট বিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পরে মহাকর্ষ বল অন্য তিনটি বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় মহাডিম্বের তাপমাত্রা ছিল $১০^{৩২}$ কেলভিন, ভর ছিল $১০^{৪৬}$ টনের কয়েক গুণ।

বিস্ফোরণের $১০^{-৬}$ সেকেন্ড সময়ে বিশ্ব প্রায় সৌরজগতের আকার ধারণ করে, তাপমাত্রা হয় $১০^{১৩}$K. এই নিম্ন তাপে কোয়ার্ক যুক্ত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি করে। পদার্থ ও প্রতি-পদার্থ পরস্পরকে ধ্বংস করে। সৌভাগ্যক্রমে পদার্থের পরিমাণ সামান্য বেশি ছিল। সেই অতিরিক্ত পদার্থ থেকেই বর্তমান বিশ্বের সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হয়েছে।

তিন মিনিটের সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল $১০^{৯}$K অর্থাৎ একশ কোটি ডিগ্রী কেলভিন। প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকণা গঠন করে। এভাবে ১ লক্ষ বৎসর কেটে যায়। তারপরে কেন্দ্রকণার সঙ্গে ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করে। পদার্থ থেকে বিকিরণ পৃথক হয়ে যায়, **আলো মহাশূন্যে চলতে আরম্ভ করে**।

তাপ কমে আসার ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুদের গড়ে ওঠা সম্ভবপর হল। প্রথমে হাইড্রোজেনের জন্ম হল। তারপর হিলিয়াম, লিথিয়াম ও অন্যান্য হাল্কা জাতের মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা। গড়পড়তা তাপমাত্রা যখন আরো নেমে এল, ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা তখনই সৃষ্টি লাভ করল। বিস্ফোরণের আধঘন্টার মধ্যেই হাল্কা ও ভারী সব ধরণের মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা গড়ে উঠেছিল, তবে ওরা সবাই ছিল গ্যাসীয়রূপে।

মহাডিম্বের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটার পর দীর্ঘ তিনকোটি বছর ধরে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের ছুটে চলার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের আয়তনও প্রসারিত হয়ে চলল। মহাডিম্বের আভ্যন্তরীণ সঞ্চিত তাপের মাত্রা যখন নেমে এল গড়পড়তা আশি ডিগ্রি ফারেনহাইটে,

www.pathagar.com

তখন ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা—যারা ছিল গ্যাসীয়রূপে, ওরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে কঠিন বস্তুর ধূলো-কণাদের গড়ে চলল।

বিশাল আকারের ধূলো আর গ্যাসের মেঘে ধীরে ধীরে ভরে উঠল মহাবিশ্ব। চারদিকে ছিল শুধু সীমাহীন অন্ধকার আর পরম শীতলতা। আলো ছিল না কোথাও—নক্ষত্রদের সৃষ্টি হয়নি তখনো। সেই অন্ধকারের মধ্যদিয়ে ধূলো আর গ্যাসের বিরাট মেঘগুলো শুধু অবিশ্রান্তভাবে বাইরের দিকে চলেছিল ছুটে।

এরপর পঁচিশ কোটি বছর ধরে আর একটি ঘটনা ঘটতে লাগল। গ্যাসের মেঘগুলোর মধ্যে একদিন শুরু হল নিজেদের অক্ষের চারপাশে চরকিবাজির মত ঘুরপাক খাওয়ার কাজ। আর তারই ফাঁকে চারপাশে ছড়ানো ধূলোর মেঘগুলোকে যেন শুষে নিয়ে ওরা নিজেদের আয়তন বাড়িয়ে চলল।

যে বিশাল চেহারার ধূলো আর গ্যাসের মেঘগুলো এভাবে গড়ে উঠল, ওরা আবার ভেঙ্গে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা ছোট ছোট বহু আবর্তের সৃষ্টি করে বসল। ঐ মেঘগুলোর এক একটির দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ।

ঘনত্ব ও চাপ বাড়তে বাড়তে একদিন ঐ সব ধূলো ও গ্যাসের চক্রের কেন্দ্রে তাপের পরিমাণ যখন দু'কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট এসে পৌঁছল, তখন হঠাৎ জ্বলে উঠল তাপ-পারমাণবিক চুল্লীটা ওরা পরিণত হল নক্ষত্রে। অসংখ্য নক্ষত্রের সৃষ্টি যেমন এভাবে ঘটতে লাগল, তেমনি তৈরি হতে থাকা বহু নক্ষত্রেকে নিয়ে ধূলো ও গ্যাসের এক একটি বিরাট মেঘ আলাদা আলাদা গ্যালাক্সিরূপে গড়ে উঠল।

জন্মলগ্ন থেকে তারাজগতগুলোর ঐ যে বাইরের দিকে ছুটে চলা, তা আজও চলছে অবিচ্ছিন্নভাবে। চলছে নক্ষত্রের জীবনের সৃষ্টি চক্র। ক্রমাগত প্রসারিত হতে হতে সমগ্র মহাবিশ্বই একদিন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছবে, যেদিন বস্তুর ঘনত্ব নেমে আসবে এক নিম্নতম অঙ্কে এবং বস্তুহীন মহাবিশ্ব সমগ্র শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে এক পরম শীতলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন এক **মহাকালের কোলে ঢলে পড়বে**।

৪.২ : মহাবিশ্বের অপরিবর্তনশীলতা

ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী হয়েল, গোল্ড ও বন্ডি এই দ্বিতীয় তত্ত্বের প্রবক্তা। তারা বললেন, এই মহাবিশ্বের কোন আদি নেই, কেন্দ্র নেই, অন্ত নেই—এ যেন এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এ অতীতেও যেমন ছিল। বর্তমানেও তেমনি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। মহাবিশ্বে সময় ও ক্ষেত্র দুইই অনন্ত। প্রসারণের ফলে মহাবিশ্বের তারাজগতেরা একদিন অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে ঠিকই। জড়ের ঘনত্ব তাতে কমে চললেও জড় কিন্তু অবিরামভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেনের পরমাণু প্রতিনিয়ত মহাকাশ জুড়ে তৈরি হয়ে চলেছে অসংখ্য পরিমাণে। ওদের সমবায়ে আবার গড়ে উঠে নতুন তারাজগত। বিশ্ব সম্প্রসারণের ফলে ছায়াপথসমূহ দূরে অপসারিত হওয়ায় যে স্থান শূন্য হচ্ছে, সেখানে এই নব সৃষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা নতুন ছায়াপথের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে জড়ের ঘনত্ব সর্বত্র সমানই থাকবে। মহাবিশ্বের চেহারার মধ্যেও মোটামুটি কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

www.pathagar.com

এই স্থিতাবস্থা বা অবিরাম সৃষ্টি তত্ত্বে কোন 'মহাজাগতিক, অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিগোলক ছিল না'। এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার অন্যতম মূল সূত্র 'ভর-শক্তির নিত্যতারূপ' বা Conservation law of mass-energy কে খণ্ডন করে বসল। জড়বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে ভরে, কিন্তু nothingness বা কিছু না থেকে কিভাবে জড় তৈরি হতে পারে এ প্রশ্নের জবাব এই তত্ত্বের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। মহাবিশ্বে জড় কিভাবে, কি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার নয়। এতে অবিরাম সৃষ্টি তত্ত্ব সঠিক নয় বলেই মনে হয়।

৪.৩ : পৌনঃপুনিক বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব

বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আরো একটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। একে দোলায়মান বা পৌনঃপুনিক (oscillating) বিশ্বতত্ত্ব বলে। স্থিতাবস্থা তত্ত্বের মত এ তত্ত্বেও বলা হয় যে, বিশ্বের কোন আদি নেই, কোন অন্তও নেই। তবে বিশ্ব চিরকাল একই অবস্থায় থাকে না। বর্তমানে বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, এই সম্প্রসারণ শুরু হয় একটা বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে। এই সম্প্রসারণ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসবে। এমন এক সময় আসবে যখন মহাকর্ষ বল সম্প্রসারণ বলের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে, বিশ্ব সঙ্কুচিত হতে থাকবে এবং এক সময় ধসে পড়বে। এভাবে আবার সেই অতিক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিগোলকে পরিণত হবে, আবার বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে, আবার বিশ্বে বিবর্তন চলতে থাকবে। আবার একই ঘটনা শৃঙ্খলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। বিশ্ব বিরাট বিস্ফোরণও বিরাট ধসের ভিতরে দোলায়মান থাকবে।

১৯৬৪ সালে হয়েল ও ভারতীয় বিজ্ঞানী নারলিকার এই নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তারা বললেন, মহাবিশ্বের চেহারাটা সর্বত্র সমান নয়। এখানে তারাজগত ও তারাজগতের দল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেও ছড়িয়ে নেই। এরকম একটি বিশ্বে আবার সর্বত্র জড় সৃষ্টির কাজ চলছে না, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পকেট বা ক্ষেত্রের মধ্যেই সেটা ঘটছে। গ্যালাক্সির চারপাশে জোরালো অভিকর্ষ বলযুক্ত ক্ষেত্রেই জড় পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে। মহাবিশ্বের যে সব জায়গায় জড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, ওদের চারপাশে গড়ে ওঠছে সৃষ্টিক্ষেত্র বা Creation field. কোয়াসারের মধ্যে জড়ের ঘনত্ব কিভাবে এক বিপুল অঙ্কে পৌঁছাচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব এই নতুন তত্ত্ব দিতে পারেনি। এরপর এ ধারণার পরিবর্তে একটি স্পন্দনশীল বিশ্বের ধারণাই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। এ হল এমন একটি মহাবিশ্ব, যার বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ। এই মহাবিশ্ব ক্রমিকভাবে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং এক একটি প্রসারণে ও সঙ্কোচনের কাল ফল ৮ কোটি বছর। এভাবে ৪২ বিলিয়ন বৎসর ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হবে। তারপর আসবে সঙ্কোচনের পালা-সবশেষে বিগ ব্যাংগ-আবার সৃষ্টি আবার প্রসারণ . . .।

৪.৪ : অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত

আমরা যখন মহাবিশ্বের অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে দৃষ্টিকে প্রসারিত করি তখন আমরা সময়ের রথে চড়ে অতীতের দিকেই এগিয়ে চলি। তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ উভয়েই নির্দেশ করে যে,

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব যে পদার্থ দিয়ে গঠিত, এক হাজার কোটি বৎসর পূর্বেও বিশ্বে সেই পদার্থই অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল, বিশ্বের ব্যাস ছিল মাত্র $১০^{-২৮}$ সেন্টিমিটার, ভর ছিল $১০^{৪৬}$ টনের কয়েক গুণ। বর্তমান মতবাদ হচ্ছে, বিস্তৃতি আরম্ভের ১০ কোটি থেকে ১০০ কোটি বৎসরের ভিতরেই ছায়াপথসমূহের সৃষ্টি হয়ে গেছে।

বিরাট বিস্ফোরণের ১০ লাখ বৎসর পরে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল ৫০০০°K, বর্তমানে হচ্ছে ২.৭°K অর্থাৎ মাইনাস ২৭০°। এটা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন যে, এককত্ব (Singularity) বা শূন্য সময়ের নিকটবর্তী সময়ে, আমাদের জানা পদার্থ বিদ্যা কোন বিষয়ের কোন প্রকার ব্যাখ্যা দিতে সম্পূর্ণরূপে অপরাগ। এই অবস্থায় আমরা এমন একটা জগতে প্রবেশ করি, যেখানে প্রাচীন ধারণা ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব, বিশ্বের অবস্থার বর্ণনা দিতে অক্ষম। আমাদের সাধারণ দৃশ্য বৃহৎ বস্তুর (macroscopic) জগতে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা না করেই, মহাকর্ষ ক্ষেত্র বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু আমরা ক্রমে যতই ছোট মাত্রার পদার্থের বিষয় বিবেচনা করতে থাকি (microscopic), ততই এমন একটা অবস্থার কাছে আমরা পৌঁছাই, যে অবস্থা আর স্বীকার করে নেয়া যায় না।

যতই এককত্বের নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম পরিবর্তন এত বেশি হয় যে পদার্থবিদ্যার বিধিসমূহ প্রয়োগ করা আর সম্ভবপর হয় না। একটি কল্পিত অসীম ঘনত্বের, অনন্ত ক্ষুদ্রায়তনের বিশ্বের বিস্তৃতিতে এই মাত্রায় পৌঁছায়, শূন্য সময়ের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময় পরে, তখন ঘনত্ব হয় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫×১০^{৯৩} গ্রাম। বিশ্বের বয়স $১০^{-৪৩}$ তখন সেকেন্ড হয়ে গেছে। বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল তখন $১০^{৩২}$K। এই সময়ে বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী অদ্ভুত কণা, প্রতি কণা ও তীব্র বিকিরণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এই কণাসমূহ ফোটন সৃষ্টি করে। এই কণা ও ফোটনের পিণ্ড বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শীতল হতে থাকে। ১০০ সেকেন্ডে তাপমাত্রা $১০^{৯}$K এ হ্রাস পায়, ১০০ সেকেন্ড করে ১০ লাখ বছর ধরে বিশ্বের বিস্তৃতি চলতে থাকে এবং তাপমাত্রা ৫০০০°K ডিগ্রিতে নেমে যায়। এই সময়ে আয়নিত গ্যাস গঠন হয়। তারও পরে তাপমাত্রা আরও কয়েক হাজার ডিগ্রি কমে গেলে নিউট্রাল হাইড্রোজেন গঠন হয়-সাথে সাথে পদার্থ ও বিকিরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪.৫ : মহাবিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যত

বর্তমানে দুটি ধারণা প্রচলিত আছে। তা হল :

(১) বিশ্ব হয়, অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। সম্প্রসারণের বেগ কমতে থাকবে, কিন্তু বিশ্ব উন্মুক্ত থাকবে। আর না হয়,

(২) সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং বিশ্ব নিজের উপরে ধ্বসে পড়ে অতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হবে বা বিশ্ব বন্ধ হয়ে যাবে। এই দুই বিকল্পের কোনটি কার্যকরী হবে, তা নির্ভর করবে বিশ্বের গড় ঘনত্বের উপরে। বিশ্বের ঘনত্ব একটা সন্ধিমানের বেশি হলে মহাকর্ষ বল সম্প্রসারণ বলের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং বিশ্ব অবশেষে ধ্বসে পড়বে।

www.pathagar.com

বিশ্বের গড় ঘনত্বের সন্ধিমান হল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ২ × ১০$^{-২৯}$ গ্রাম। বিশ্বের গড় ঘনত্ব এই সন্ধিমানের (Critical value) চেয়ে বেশি হলে বিশ্বের পরিণতি বিরাট ধ্বংস। আর কম হলে বিশ্ব সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। বিশ্বের সমস্ত প্রকার স্তর বিষয় জানা থাকলে গড় ঘনত্ব নির্ণয় করা যেত এবং অন্তিম অবস্থায় বিশ্ব কেমন হবে, বিরাট ধ্বংসের শিকার হবে, না ক্রমাগত সম্প্রসারণে সমস্ত তেজ হারিয়ে তাপের অভাবে বিশ্বের মৃত্যু ঘটবে, তা বলা যেত।

বিবর্তনশীল বা স্থিতাবস্থাশীল মহাবিশ্বের দুটি ধারণার মধ্যে কোনটি সঠিক, তা বিচারের জন্য কোয়াসারকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, কোয়াসার থেকে আসা আলোর বর্ণালীর লাল রঙের প্রান্তে যে বর্ণচ্যুতি (red shift) আমরা ঘটতে দেখি তা কোয়াসারের বিপুল বেগের জন্যই ঘটে। এতে বোঝা যায় যে, এই মহাবিশ্বের সুদূর অঞ্চলেই কোয়াসারের সংখ্যা অনেক বেশি, আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে আদৌ কোন কোয়াসার নেই। অর্থাৎ, সুদূর অতীতে মহাবিশ্বের সমগ্র অঞ্চল জুড়েই কোয়াসার যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। সোজা কথায় মহাবিশ্বের চেহারাটাই ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। আর আমরা বিবর্তনশীল মহাবিশ্বেই বাস করছি ধরে নিতে হবে।

১৯৭০ দশকের গোড়ায় হয়েল তার স্থিতাবস্থাশীল তত্ত্বকে রক্ষা করার জন্য এক নতুন কথা বললেন। মহাকাশে কোন মহাজাগতিক বস্তুর অভিকর্ষের প্রভাবে চারপাশে ক্ষেত্র ও সময়ের পরিমাপের মধ্যে যে বক্রতার সৃষ্টি হচ্ছে তা যেন এক একটি গর্তের মত। এই গর্তের মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে আলোর বর্ণালীর লাল রংয়ের প্রান্তে যে বর্ণচ্যুতি ঘটে তার মধ্য দিয়ে **সময়ের গতির মন্দীভবনের** (ধীরে চলার) ছবিটাই ধরা পড়েছে। কোয়াসাকে আলোর বর্ণালীর লাল রঙের প্রান্তে যে বর্ণচ্যুতি ঘটছে তা যদি কোয়াসারের ভর বা অভিকর্ষ বলের জন্যই ঘটে থাকে তাহলে বলা যায় যে কোয়াসাররা আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে, দূরে নয়। মহাবিশ্বের চেহারাটা কাছে ও যেমন, দূরেও তেমনি। অভিকর্ষজনিত এই বর্ণচ্যুতির নাম দেয়া হয়েছে gravitational red shift, আর জ্যোর্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ণালীর লাল রঙের প্রান্তে যে বর্ণচ্যুতি তা Cosmological red shift নামে পরিচিত। যাক হয়েলের ধারণাটি শেষ পর্যন্ত টিকেনি।

৪.৬ : তিনরূপে মহাবিশ্ব

বিগ ব্যাঙের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হবার পর মহাবিশ্বের চেহারাটা তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলেছে তা জানা নেই। কেননা প্রথম বিস্ফোরণের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি জমা ছিল তা অজ্ঞাত। এবার আমরা তিন সম্ভাবনার কথা বলব।

প্রথমত মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তে বিস্ফোরণের ধাক্কাটা শক্তির মাঝে যদি যথেষ্ট জোরালো না হয়ে থাকে, তা হলে তারাজগতের বলে প্রসারণের ধাক্কায় অনেক দূরে গিয়ে হাজির হবে ঠিকই, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারণের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তু আবার একই জায়গায় গুটিয়ে আসতে থাকবে। গ্যালাক্সিগুলোর আলোর বর্ণালীর লাল রঙের প্রান্তে বর্ণচ্যুতির জায়গায় সেটা ঘটবে নীল রঙের প্রান্তে। তারপর দশ

www.pathagar.com

হাজার কোটি বছর বাদে মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুর গুটিয়ে আসা পিণ্ডটার মধ্যে বিগ ব্যাঙের মতই আর একটি বিস্ফোরণ ঘটে বসবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনার রূপটা হতে পারে এ রকম মহাবিশ্বের প্রাথমিক বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের মধ্যে হয়তো যে পরিমাণ শক্তি নিহিত ছিল, তার সাহায্যে তারাজগতের দল পরস্পরের অভিকর্ষ বলের টানকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। এরকম একটি অবস্থায় মহাবিশ্ব গুটিয়ে গিয়ে আবার একটি প্রাথমিক বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে না। বরং সুদূর ভবিষ্যতে, তারাজগতের দল যখন পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় এক অসীম দূরত্বে গিয়ে হাজির হবে, তখন ওদের ছুটে চলার বেগটাও কমতে কমতে একদিন স্তব্ধ হয়ে আসবে।

তৃতীয় সম্ভাবনাটা হল এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্নে হয়তো বিস্ফোরণের শক্তি ছিল এতটাই জোরালো, যার সাহায্যে তারাজগতের দল পরস্পরের অভিকর্ষের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার মত যথেষ্ট বেগ অর্জন করতে পেরেছিল। এমনকি সুদূর ভবিষ্যতেও পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমাগতই দূরে সরে যেতে থাকবে। অর্থাৎ কিনা মহাবিশ্ব ক্রমাগতই প্রসারিত হতে থাকবে।

১৯৭৫ সালে বিখ্যাৎ গনিতজ্ঞ এলিস জানালেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তে Singularity বা একটি মাত্র বিন্দুতে সমস্ত বস্তুর জড়ো হওয়া জাতীয় একটি ঘটনা থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক আগে থেকে সৃষ্টি লাভ করা কোন মহাবিশ্ব থেকে বস্তু হয়তো দিগন্ত পেরিয়ে আমাদের মহাবিশ্বে পৌঁছোচ্ছে। এর চাপ, তাপ, ঘনত্ব অসীম অঙ্কে আকার কোন প্রয়োজন নেই। সোজা কথায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় বিগ ব্যাঙ জাতীয় কোন ঘটনাই ঘটেনি।

চিরবিদ্রোহী হয়েল ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে আরও একটি বিপ্লবী তত্ত্ব হাজির করে বসলেন। তার নতুন মতে মহাবিশ্ব নাকি প্রসারিত হচ্ছে না। আসলে যে মাপকাঠি দিয়ে আমরা সবকিছু পরিমাপ করছি, সময়ের ব্যবধানে তার দৈর্ঘ্যটাই নাকি পালটে যাচ্ছে অর্থাৎ যে আলোকবর্ষ নিয়ে আমরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক দূরত্বকে পরিমাপ করছি। তার দৈর্ঘ্যটাও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট হতে থাকবে। মহাবিশ্বের বয়স যতো বড় হতে থাকবে, তত দুটো তারাজগতের মধ্যকার দূরত্ব আলোকবর্ষের মাপে বেড়ে চলবে। এর স্বপক্ষে পরীক্ষামূলক প্রমাণ কিছু নাই।

৪.৭ : মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে দুটি সোভিয়েত মতবাদ

সোভিয়েত এস্তোনিয়ার (এতদিনে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে গেছে ১৯৯১ সনে, এস্তোনিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র এখন) বিজ্ঞানী জান আইনাস্টো অসীম বিশ্বের ধারণাকে অমূলক বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন বিশ্বের কোন সীমানা নেই, আকার নেই ইত্যাদি মতামত বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন আর সত্য নয়। দেখা গেছে মহাবিশ্বের একটা বিরাট অংশে কোন গ্যালাক্সি নাই—বেশ জায়গা খালি। নতুন তথ্য থেকে জানা যায় গ্যালাক্সিগুচ্ছেরাও একটা বিরাট মৌ-কলোনীর কোঠায় দেয়ালে ঘেষে অবস্থান করে। এরকম একটা কোঠার একদিকের দৈর্ঘ্য (প্রস্থ, উচ্চতাও তদ্রুপ) হচ্ছে ১০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। মনে হচ্ছে দু দেয়ালের মাঝে আর গ্যালাক্সিগুলো অবস্থান নেয় না। এ জায়গাগুলি খালি। এরকম বেশ

www.pathagar.com

কিছু খালি জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে। ৩০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে কোন গ্যালাক্সি নাই, এরকম একটা শূন্যস্থান পাওয়া গেছে। একটি বিন্দু থেকে তিন দিকে তিনটি সরলরেখা ধরে এগোলে দেখা গেছে যে ৫০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত মহাকাশে গ্যালাক্সিপুঞ্জ রয়েছে, তবে তারপর ৮০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত আবার খালি। তারপর আবার তারকাজগতের ভিড়। এরকম চিত্র।

মহাবিশ্বের মহামৌচাকের এক একটি কোঠার ব্যাসার্ধ গড়ে ১০০-২০০ মেগাপারসেক (মেগা = মিলিয়ন = ১০ লাখ) ছায়াপথগুলো দিয়ে কোঠার দেয়ালগুলি গঠিত। মাঝে যেখানে মৌমাছিটা থাকার কথা, ওই জায়গাটাই খালি। এরকম গঠন দেখে মনে হচ্ছে কোঠাটাই আগে তৈরি হয়েছিল, তারপর গ্যালাক্সিগুলো উদ্ভূত হয়। বিশ বিলিয়ন বৎসর আগে খুব দ্রুত মুহূর্তের মধ্যে (সময়হীন বিরামকাল) ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন, বেরিয়ন এবং অন্যান্য কণিকাগুলি জন্ম নেয় বিরাট বিস্ফোরণের পরপরই। আজও আমরা প্রসারণশীল বিশ্বে বাস করছি। আবার হবে সঙ্কোচন, বিন্দুতে উপনীত হবে মহাবিশ্ব, আবার বিস্ফোরণ। এ সবের পিছনে কারণটা হল পদার্থের ঘনত্ব।

সোভিয়েত (তথা রুশ) পদার্থবিদ মারকভ এক নতুন থিয়োরীতে বলেন যে, ক্ষুদ্রবস্তুর (কোয়ান্টাম ধারণার) পর্যায়ে বিশ্ব অসংখ্য পরিবর্তনশীল বিশ্ব নিয়ে গঠিত। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এক জটিল পর্যায়ের যা দেশ-কালের সংজ্ঞা দিয়ে বোঝা যায় না। এ ধরণের বিশ্বের গঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নাই। এতে বলা হয় যে একটি ছোট বস্তু বিরাট এক বিশ্বকে ধারণ করতে পারে। একটি ইলেকট্রন যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশ, তেমনি আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ বিশেষ। ফল দাঁড়ায় এই যে এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (একটি সিস্টেম) অন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করতে পারে তাতে কারোরই কোন অনিষ্ট হয় না—তাদের পারস্পারিক সম্পর্কটাই এমন জটিল শক্তি দিয়ে পরিবেষ্টিত। মেগাকসমিক এবং মাইক্রোকসমিক পর্যায়ে এইসব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলি পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং এক মহাঐক্যের তানে জীবন বয়ে চলেছে। কি দুঃসাহসিক কল্পনা যে একটি ইলেকট্রন, প্রোটন বা পিনের ডগার মধ্যে হাজার কোটি আলোক বৎসরের এক একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে আছে। মজার কথা পদার্থবিদ্যার কোন সূত্রই এই ধারণার বিরোধিতা করে না।

৪.৮ : ক্ষুদে কৃষ্ণগহ্বর

ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং (জন্ম ১৯৪২) এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত থেকেও (বিটিভির রিপ্লেজ 'বিলিভ ইট অর নট' প্রোগ্রামে তাকে দেখানো হয়েছিল গত বন্যার (১৯৮৮) সময়) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতথ্য নিয়ে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেন যা আইনস্টাইন পরবর্তী যুগে যুগান্তকারী বলে পরিচিত। হকিং সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব।

স্টিফেন হকিং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রথম লগ্নে কিছু বিচিত্র ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি যদি আনুমানিক দু হাজার কোটি বছর আগেই ঘটে

www.pathagar.com

থাকে, তাহলে সৃষ্টির এক সেকেন্ড বাদেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় গড়ে উঠেছিল। যে ভয়ংকর এলোপাতাড়ি ঘটনা স্রোতের মধ্যদিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের জীবন শুরু হয়েছিল, তাতে, ঐ ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডদের চূর্ণীকৃত হয়ে এক একটি ক্ষুদে (মিনি) ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বররূপী নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়ে বসে থাকবার কথা।

অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণাদের আচরণবিধি হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিষয়ীভূত ব্যাপার। পদার্থবিদরা পরমাণু ও পরমাণু কেন্দ্রকের ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের জন্য এই বলবিদ্যার নিয়ম-কানুনের সাহায্য নিয়ে থাকেন। হকিং ১৯৭৫ সাল নাগাদ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে ক্ষুদে কৃষ্ণ গহ্বরেরা নাকি বস্তুকণা ও আলোর বিকীরণ ঘটিয়ে থাকে। বিকীরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওরা আরো ছোট হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শক্তির অপচয়ও ঘটতে থাকে দ্রুত বেগে। শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ওদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দশ লক্ষ টন পর্যায়ের হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের মিলিত শক্তির সঙ্গে হয়তো ক্ষুদে কৃষ্ণ গহ্বরের বিস্ফোরণের শক্তির মাপের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। যে সব ক্ষুদে কৃষ্ণ গহ্বরের ভর ১০০ কোটি টনের কম, ওরা কেউ আর বেচে নেই। কৃত্রিম উপগ্রহে জোরালো মাপের গামারশ্মির বিকীরণ ধরা পড়ছে। এই রশ্মির উৎস কৃষ্ণগহ্বরের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী হতে পারে। আমাদের সৌরজগতের মধ্যেও হয়তো এই ক্ষুদে কৃষ্ণগহ্বরেরা রয়েছে।

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চেহারা

তিন ধরণের সম্ভাব্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

১. বর্তুলাকৃতি, মহাবিশ্বের বক্রতা (বস্তুর অভিকর্ষের প্রভাবে ক্ষেত্র ও কাল বক্রতা লাভ করে) বর্তুলের আকারে ঘুরে এসে সম্পূর্ণ হবার ফলে এই বক্রতাকে বলে পজিটিভ। বস্তুর গড় ঘনত্ব ক্রান্তি মাত্রার চেয়ে বেশি হয়।

২. সমতলীয় মহাবিশ্ব, বক্রতা শূন্য। বস্তুর গড় ঘনত্ব ক্রান্তি মাত্রার সমান হয়।

৩. পরাবৃত্তাকার মহাবিশ্ব, বক্রতা সম্পূর্ণ না হয়ে ক্রমেই ছড়িয়ে যাবে দুদিকে, তাই তার মাত্রা হবে নেগেটিভ। এখানে বস্তুর গড় ঘনত্ব 'ক্রান্তিমাত্রিক মাত্রা' থেকে কম হয়।

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চেহারা যদি সমতলীয় বা পরাবৃত্তাকার যেকোন একটি হয় তাহলে সে হবে এক অসীম, অনন্ত মহাবিশ্ব। এর যেমন কোন নির্দিষ্ট প্রান্ত নেই, তেমনি কোন বৃত্তও নেই। উপরের তিন প্রকৃতির মহাবিশ্বের কোনটি যে আমাদের মহাবিশ্ব, তারই অনুসন্ধান করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি।

পদার্থবিদ হকিংয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী মহাবিশ্বে ক্ষুদে শ্বেত গহ্বরের অস্তিত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে চূড়ান্তভাবে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কোন বস্তু যখন কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন বস্তুটির সমস্ত তথ্য মহাবিশ্ব থেকে লোপাট হয়ে যায়। কিন্তু শ্বেত গহ্বর এমন বস্তু যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নতুন

www.pathagar.com

নতুন তথ্য আমাদের মহাবিশ্বে এসে জড়ো হতে থাকবে—ওরা যেন হল তথ্যের ভাণ্ডার। নতুন তথ্য যদি ক্রমাগত আমাদের মহাবিশ্বে এসে হাজির হতে থাকে, তাহলে কোন কিছু সম্বন্ধেই সঠিকভাবে আর আমরা ভবিষ্যৎবাণী করে উঠতে পারব না।

৪.৯ : মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি

বিশ্বের এখন যৌবনকাল। কিন্তু একদিন এ যৌবন অতিক্রান্ত হবে, বার্ধক্য আসবে। অবশেষে মৃত্যু এসে এ বিশ্বকে মুছে দেবে। ছায়াপথসমূহও মরণশীল, এরাও জরায় আক্রান্ত হয় এবং শেষ তারাটি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছায়াপথসমূহ অতি দীর্ঘ ভয়াবহ শীতল মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবে।

যে তিন ধরণের বিশ্বের কথা আমরা বলেছি তার মধ্যে যদি মনে করা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতে মহাকর্ষ বলই প্রাধান্য লাভ করবে, তাহলে সেই বিরাট ধ্বসের সময়সূচি আমরা নির্ণয় করতে পারি। ছায়াপথের ভিতরে পরস্পরের আকর্ষণ বল বা মহাকর্ষ বল বিশ্বের সম্প্রসারণ বেগকে শ্লথ করতে চেষ্টা করে। এটা হচ্ছে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের ভরবেগ এবং মহাকর্ষ বলের মধ্যে টানাপোড়েন। ছায়াপথের ভর বেগের পরিমাণ বেশি হলে বিশ্ব অনন্তকাল পর্যন্ত বাড়তে থাকবে।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্রিম্যান ডাইসন শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের নিম্নরূপ চিত্র এঁকেছেন।

বিরাট ধ্বসের একশত কোটি বৎসর পূর্বে একত্রে অপসারণশীল ছায়াপথ স্তবকগুলোর ভেতরের খালি জায়গা ভরাট হয়ে আসতে থাকবে। ঐ ধ্বসের ১০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথক পৃথক ছায়াপথের ভিতরের জায়গা কমে গিয়ে সমস্ত ছায়াপথ একীভূত হয়ে যাবে। সারা বিশ্বে তখন তারায় তারায় খচিত, রাত্রি দিনের কোন পার্থক্য থাকবে না। মহাকর্ষ বল বেড়ে যাবে। তারাসমূহ পরস্পরের কাছে চলে আসবে।

বিরাট ধ্বংসের ১ লাখ বৎসর আগে সারা আকাশ প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠবে। বিশ্বের কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে যাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারাদের তাপে সমস্ত কঠিন শিলা গলে ফুটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিরাট ধ্বসে বিশ্ব লোপ পাবার এক হাজার বৎসর পূর্বে তারাদের ভিতর প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটবে এবং কালো গহ্বরের সৃষ্টি করবে। বিরাট ধ্বসের শেষ অঙ্কে কালোগর্তেরা সব একত্রিত হয়ে একটাতে পরিণত হবে। আর এই একটার ভিতরে একদা বিশাল বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও তেজ একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবে।

বিরাট ধ্বসের সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটি বিরাট বিস্ফোরণও ঘটবে এবং নতুন একটা বিশ্বের সৃষ্টির সূচনা করবে। বিরাট এ ধ্বস ঘটবে এখন থেকে ১ লক্ষ কোটি বৎসর পরে। এরও ১ লক্ষ কোটি বৎসর পরে নতুন ঘটনার সূচনা হবে।

ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ বিশ্বকে একটা দম দেয়া ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করতেন। সেটা একবার চাবি দেয়া হলে চলতে থাকবে এবং ক্রমাগত চালনা শক্তি হারাতে থাকবে; সবশেষে এক সময় এর চাকা ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনে করেন, এমন কিছু ঘটতে পারে, যাতে ঘড়ির স্প্রিংকে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং সেই বিন্দু হচ্ছে কালো গহ্বরের কেন্দ্রে অবস্থিত "এককত্ব"। কালো গহ্বরের বিস্ফোরণের পর এই সমস্ত 'এককত্ব' বিশ্বে নগ্ন অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। এরা একেবারে শূন্য থেকে তেজ, আলো, তাপ সৃষ্টি করতে পারে। এরা বিজ্ঞানের বিধি মানে না, আপনা আপনি বস্তু গঠন করতে পারে। বিশ্ব হয়তো একটা নতুন অস্তিত্বের নতুন স্তরে উপনীত হবে।

মানুষ যদি সময়কে জয় করতে পারে, তাহলে সে হয়তো ছায়াপথে বসতি স্থাপন করবে, পালসার ও কালো গহ্বরকে নিয়ন্ত্রণ করবে, হয়তো বা অতি রহস্যময় এককত্বকে পোষ মানিয়ে, বিশ্ব ঘড়ির বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করবে। লক্ষ কোটি বৎসর পরে আমাদের ছায়াপথের শেষ তারাটিও যখন নিভে যাবার উপক্রম হবে তখন হয়ত মানুষ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখবে না; মানুষই হয়তো এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে সক্ষম হবে। মার্কিন কল্পবিজ্ঞান লেখক আইজ্যাক আসিমভের "শেষ প্রশ্ন" নামে এ ব্যাপারে বেশ মজাদার একটি বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী আছে যা লেখক কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'মহাকাশ বার্তায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাবিশ্বের মহাশূন্যের মহাসমুদ্রে মহাকালের ভেলায় আমরা সবেমাত্র পা রেখেছি। মানুষ মহাকালের অজানা রহস্যকে অবশ্যই জয় করতে পারবে—সেও কেবল মহা সময়ের ব্যাপার।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মাইক্রো পদার্থবিজ্ঞানে সময়ের ধারণা

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অখণ্ড পরিমাণ বিশেষ হচ্ছে কোয়ান্টামের অর্থ আর পদার্থের শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় অবিরাম হয় না—উহা নিয়মিত পর্যায় অনুযায়ী হঠাৎ হঠাৎ ঘটে এই মতবাদ হচ্ছে কোয়ান্টাম থিয়োরীর। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় কণা মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে সময় নিয়ে মাঝে মাঝে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সময়কে কিরূপে দেখা যায় এখন তা আমরা আলোচনা করব।

সাধারণতঃ বিমূর্ত বহু মাত্রিক (অসীম) হিলবার্ট ক্ষেত্রের কোন মাপার যোগ্য পরিমাণকে বুঝাতে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় 'অপারেটার' ব্যবহৃত হয়। হিলবার্ট ক্ষেত্র হচ্ছে গাণিতিক বিমূর্ত ধারণার প্রতিচ্ছবি যা ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন শক্তির লেভেল (level) বুঝাতে। এটা দেশকালের সাধারণ মাত্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় যে সব ঘটনা ঘটে তাতে সময়ের ধারণা অসাধারণ রূপ নেয়। এক্ষেত্রে শক্তি এবং সময় যুগ্ম হয়ে যায়, এটা কোন পরীক্ষাতেই ধরা যায় না।

কোপেনহাগেনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্র বস্তুর (microsystem) অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবস্থার সঙ্গে আপেক্ষিক পর্যায়ে থাকে। এদিকে শক্তি এক পরীক্ষার আয়োজনের সঙ্গে আপেক্ষিক, ওদিকে সময় অন্য কিছুর সঙ্গে আপেক্ষিক। বাধ্য হয়ে পরীক্ষার আয়োজনকে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যেই বর্ণনা করতে হয়। এটাই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটা দূর্বলতা।

৫.১ : সময়ের অনির্দিষ্টতা

সময়ের অনির্দিষ্টতা ও শক্তির অনিশ্চিয়তার (যা তাদের পরিবর্তনশীল ধর্মের কথা বুঝায়) গুণফল হচ্ছে প্লাঙ্ক ধ্রুবক h কে চারটা পাই (৩.১৪২) এর মান দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তার সমান বা তার থেকে বেশি। (h হচ্ছে = ৬.৬২৫ × $১০^{-৩৪}$ জুল/সেকেন্ড) প্লাঙ্কের ধ্রুবক হচ্ছে কোয়ান্টাম থিয়োরীর ভিত্তি। বৈদ্যুতিক চুম্বকায়িত তরঙ্গের শক্তি কোন অখণ্ড প্যাকেট বা কোয়ান্টায় আবদ্ধ থাকে এবং যখন বিকিরণ ঘটে তখন পুরো প্যাকেটটারই শক্তি বিকিরিত হয় এবং এর পরিমাণ এদের বিকিরণের মাত্রার উপর নির্ভরশীল (সংক্ষেপে E এনার্জি = h × মাত্রা। এনার্জি × সময় = একশন) এতে দেখা যায় সময়ের পরিমাণ আসে $১০^{-২৪}$ সেকেন্ড, এত কম যে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে বাধ্য হলেন যে সময়ও অব্যাহত অবিরত গতিতে প্রবাহমান নহে—অর্থাৎ সময়েরও ফাঁক রয়েছে।

www.pathagar.com

ক্রোনন (Chronons) বা হঠাৎ হঠাৎ লাফ দিয়ে সময় বয়ে চলেছে। একই গতিতে সময় চলে না। মাঝে মাঝে দৌড়ায়, মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে চলে। হিসেব করে পাওয়া সময়ের এই অবস্থার কথা কিন্তু আমরা গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করতে পরিনি কেননা চিরকাল আমরা দেখে এসেছি সময় বয়ে চলছে বিরামহীন গতিতে অতীত থেকে ভবিষ্যতে এক দিকে—সামনে।

গণিতজ্ঞের সামনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হাজির হয়েছে সময়ের ধারণা। প্রচলিত মতবিরোধী সেই প্রাচীন জিজ্ঞাসাটি—"কেমন করে সসীম বিরতিকাল গঠিত হয় গঠনবিহীন বিন্দু বা ঘটনা নিয়ে?" এ প্রশ্নটির জবাব আজও পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র সময়কে অবিরাম প্রবাহ ধরে নিলেই উক্ত প্রশ্নের জবাব সরাসরি এড়িয়ে গিয়ে বহু ঘটনাবলীর সমাধান ব্যাখ্যা করা যায়। কয়েক হাজার বছর ধরে তাই করা হচ্ছে।

৫.২ : সুক্ষ্মকণিকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সময়ের ধারণা

প্রকৃতিতে সময়ের প্রতিসাম্য বা ভারসাম্য রয়েছে এমন ধারণাই এতদিন প্রচলিত ছিল। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে অবশ্য বলা আছে যে পৌনঃপুনিক সংঘটন ক্রিয়া (বিশৃঙ্খলা) বিশ্বে বেড়েই চলেছে এবং সময়ের প্রতিসাম্যতা নেই। তবে এটা সংখ্যাগণিতের ফসল।

পদার্থবিদ্যার মূল সূত্রে যেখানে পজিট্রনকে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সাযুজ্যের আলোকে সিমেট্রিকেল দেখানো হয় আয়নাতে প্রতিফলিত করে বা কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু দেখা গেছে ভারসাম্যের দিক তিনটির (প্রতিফলনগুলি একত্র করলে পর তবে বস্তুর প্রতিসাম্য বুঝা যায়।

তিন প্রতিফলন হচ্ছে—চার্জ, (বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চারণ-বিপরীত কণার জন্য পরিবর্তিত কণা) প্যারিটি বা সমমূল্যতা (আদর্শ প্রতিবিম্বে পরিবর্তিত হওয়া অর্থাৎ ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে পারস্পরিক বিনিময়), সবশেষে, সময় (সকল বস্তুকণার গতিকে উল্টো খাতে পরিচালিত করা অর্থাৎ গতিকে পেছনের দিকে ধাবিত করা।

তিনটির একত্রে CPT মিরর নাম দেয়া হয়েছে K-মিজন কণার ক্ষয়ের সময় দেখা গেছে ২টি 'পিয়নে' রূপান্তরিত হয় খুব দ্রুত আর তিনটি পিয়নে (অন্য কণা) রূপান্তরিত হতে সময় নেয় খুব বেশি। এতে সময়ের ভারসাম্যহীনতার প্রমাণ মেলে।

৫.৩ : আণবিক পদার্থবিজ্ঞানে সময়ের ধারণা

উপরোক্ত সুক্ষ্ম জগতে সময়ের অসাম্যতার ছাপ আমাদেরকে অতটা বিচলিত করে না যতটা করে দৃশ্যমান জগতে। আমরা অতীতেরই শুধু ছাপ দেখি সব জায়গায় (ফসিল, পায়ের দাগ, টেপ রেকর্ড, স্মৃতিকথা) কিন্তু ভবিষ্যতকে একদম দেখতে পাইনা। সহজেই মিশানো যায় দুটি কিংবা বেশি বস্তুকে, যেমন : দুধ ও চা সহজেই মিশিয়ে ফেলি, অন্যদিকে দুধ ও চা-কে আলাদা করতে যাও দেখবে কি ল্যাঠা লেগে গেছে, কত যন্ত্র, কত বস্তু কত পয়সা খরচ। অর্থাৎ কোন ক্রিয়াকে পিছন দিকে ফেরত আনা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। বোলৎসমানের এন্ট্রপি—এর ব্যাখ্যার পর এ ব্যাপারে হাজার হাজার কাজ প্রকাশিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এ প্রসঙ্গে।

www.pathagar.com

বালুকাবেলায় পদ চিহ্ন হচ্ছে বালিকণার ঘণীভূত ঐক্যবদ্ধ রূপ। পায়ের চাপে বালি ঘণীবদ্ধ হয়ে গেছে অথচ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েনি বালি।

অন্যদিকে কোন উৎস থেকে কোন ঢেউ যখন বেরিয়ে আসে তা তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে—উৎসে ফেরত যায় না কোনদিন। সুতরাং এটাও একটা অসাম্যের উদাহরণ। এসব থেকেই ধরে নেয়া হয়েছে যে কারণ-ঘটনা ফলাফল হচ্ছে একমুখী এবং তাহলে ভবিষ্যতবাণী করারও সুযোগ দিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। এটা স্বতঃসিদ্ধ, যে এমনকি যদি ঘটে, তা হলে পরিণামটা এমনি হবে।

এভাবে মানসচক্ষে আমরা ভবিষ্যতটা কল্পনা করে নিতে পারি কিন্তু ঘটনা দেখতে পারি না। এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র বিরাট বস্তু জগতের সময়ের ইন্টারভালই রেকর্ড করা যায় এবং রেকর্ড যন্ত্রটাকে বড় হতে হবে। মগজ যে কোনকিছু গণনা করে তখন তার ছাপ মগজের ভিতরে রয়ে যায়—এক্ষেত্রে মগজ রেকর্ডিং যন্ত্রের কাজ করে সাময়িকভাবে অফেরত যোগ্য মিথষ্ক্রিয়ায়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সময় মাপার নীতিসমূহ

৬.১ : সময় মাপার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

ক্রোনোমিটার : জ্যোতিবিজ্ঞানে, গতিবিদ্যায় ও আণবিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রয়োজনে সময় মাপার যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

জ্যোর্তিবিদ্যায় টেলিস্কোপ দিয়ে তারা, নক্ষত্রজগত পর্যবেক্ষণ করার সময় ঠিক সময়টা লিপিবদ্ধ করতে হয়। এটা একটা ক্ষুদ্র, ভিজুয়াল ট্রানজিট যন্ত্র বা মেরিডিয়ান সমতলে আটকানো। অধুনা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সময় এবং তারার অক্ষাংশ এক সাথে রেজিস্ট্রি হয়। ১৯৩৪ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হত জেনিথ টিউব ফটোগ্রাফী, উহা টেলিস্কোপ টিউবের সাথে সমান্তরালভাবে আটকানো থাকত। উঁচু দিগন্তে কোন তারার আগমন ঘটলেই একটি মোটর ফটোপ্লেটটিকে টেনে নিয়ে যেত। ঘুর্ণায়মান প্লেটে সঙ্কেত পড়া মাত্র একটি ঘড়ি তা রেকর্ড করে নেয়।

যান্ত্রিক ঘড়ি হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা সময়ের গতি বা প্রবাহ নির্দেশ করে। এতে রয়েছে দুটি/তিনটি কাটা যা সময়ের গতিকে নির্দেশ করে, কাপতে কাপতে চলতে থাকে অবিরত, আর রয়েছে সময় নির্দেশক সংখ্যা সোজা কথায় কয়টা বাজল? কাটা বা ডিজিটাল অবয়বের ঘড়ি এখন বাজারে দেখা যায়। ১৫৮৩ সনে গ্যালিলিওর যুগান্তকরী আবিষ্কার 'দোলনের সময়' নির্ণয় যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কারে সাহায্য করে। ডেনমার্কের গনিতজ্ঞ হুগেনস প্রথম দোলক ঘড়ি আবিষ্কার করেন ১৬৫৬ সনে। ১৯২৫ সালে এই ঘড়ির চরম উৎকর্ষতা সাধন হয়। মন্থর গতির হার হচ্ছে এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ এক দিনে।

কোয়ার্টজ স্ফটিক ঘড়ি : কম্পনের হার বা মাত্রাকে সুতীক্ষ্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সময় জ্ঞাপন করে এই ঘড়ি। ১৯৩০ সনে এটা প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯৬০ সনের দিকে উন্নতি হয় বেশ। কোয়ার্টজ স্ফটিক তার চেহারা নষ্ট হয়ে গেলে তার দেহের বিভিন্ন অংশে ইলেকট্রিক বিভবের পার্থক্য হয়ে পড়ে। এই বিভব পার্থক্যটুকুই স্ফটিকের ইলেকট্রিক সার্কিটের কম্পনের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমানে প্রতিদিনে $১০^{১১}$ বার কম্পনে ১টি কম্পনের তারতম্য ঘটে এই ঘড়িতে। অনেক সুক্ষ্ম মাপের সময়ের জন্য এ ঘড়ির দরকার পড়ে।

আণবিক ঘড়ি : অণুর এনার্জি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়মিত বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গ সৃষ্টি করে এই ঘড়ি তার কাজ চালায়। বিভিন্ন অণু/পরমাণুর তরঙ্গ একই

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এক্ষেত্রে। ১৯৪৭ সনে এ ঘড়ির উদ্ভব ঘটে। অবস্থান থেকে এনার্জি যখন অন্য অবস্থানে যায় (উত্তপ্ত করলে) তখন তার রশ্মি বিকিরণকে রেকর্ড করা হয়। ১৯৪৯ সনে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রিত ঘড়ি ওয়াশিংটনে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৪ সনে শব্দের ব্যবহার করে এর উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ১০০ বিলিয়ন বারে ১ বার ভুল হয়।

সিজিয়াম ঘড়ি : মৌলিক পদার্থ সিজিয়ামের রশ্মি প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সিজিয়াম বিম আণবিক ঘড়ি ১৯৫৫ সনে সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়ে থাকে। সিজিয়ামের কম্পনের মাত্রার সঙ্গে এফিমেরিস সময়ের সামঞ্জস্য করে চন্দ্রের দূরত্ব মাপা হয়েছে পৃথিবী থেকে। এতে দেখা গেছে প্রতি সেকেন্ডে উত্তপ্ত সিজিয়ামের অণু/পরমাণুগুলি ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ বার কাপে। অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন বারের উপর কাপে ১ সেকেন্ডে। ৩০ কেজি ওজন বিশিষ্ট একটি সিজিয়াম ঘড়ি নির্মাণ করা হয়েছে যাতে ভুল হয় ১০ ট্রিলিয়ন বারে ২ বার মাত্র। এসব ঘড়ি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হবে না কোনদিন। তবে পরীক্ষাগারে অনেক সুক্ষ্ম মাপজোকের বেলায় এ ঘড়ি অপরিহার্য্য।

হাইড্রোজেন ঘড়ি : হার্ভাডে আবিষ্কৃত হয় এটা। অতি উচ্চ স্থিতিশীল হাইড্রোজেন ম্যাজের (সুক্ষ্ম কণা) যার পরিমাণ হচ্ছে ১০০ ট্রিলিয়ন পার্টে ১ বার। এটা তরঙ্গ ত্বরণ যন্ত্রপাতিতে প্রাথমিক কণাদের আয়ুষ্কাল মাপতেই ব্যবহৃত হয়।

রুবিডিয়াম ঘড়ি : উচ্চ স্থিতিশীল গ্যাস কোষ ব্যবহার করে রুবিডিয়াম ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সিজিয়াম ঘড়ির মত অত নির্ভরশীল নয়। নির্মাণে ও স্থাপনের উপর কম্পনের নির্ভরশীলতাই এ ত্রুটির কারণ।

৬.২ : সঠিক সময় নির্ধারণের প্রচেষ্টা

গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা এটা অনুভব করেছেন—বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সাথে সাথে। ১৯৬৪ সনে ওজনের সম্মেলন ঠিক করে দেয় 'সিজিয়াম এর আইসোটপ ১৩৩ পরিবর্তনের সময় যে বিকিরণ হয় তার কম্পনের হার হচ্ছে প্রতি আণবিক সেকেন্ডে ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ বার।' এক সৌরদিনে ৮৬,৪০০ গড় সেকেন্ড। এটা আণবিক সময়ের ৮৬,৪০০.০০২৬ সেকেন্ড হচ্ছে গড় সৌরদিনের সঠিক দৈর্ঘ্য (সময়)। বিশ্বে প্রায় ৫০টি আণবিক ঘড়ি রয়েছে। রকেট, শীপে, মিসাইল সেন্টারে এগুলি ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিয়ে সঠিক সময় বিভিন্ন দেশের রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় প্রতিদিন।

কোটি কোটি বৎসর আগের ফসিল, বস্তুর বয়স নির্ণয় করা হয় তেজস্ক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। ১০০ থেকে ৫০ হাজার বছরের আগের জিনিসের বয়স নির্ণয় কার্বন-১৪ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মির ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-১৪ উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে মানবদেহে কার্বন-১২ প্রবেশ করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২ এর অনুপাত বের করে তারপর বয়স নির্ণয় করা হয়।

আপেক্ষিকতাবাদে বলা হয়েছে, চলন্ত ঘড়ি (রকেটে, যানবাহনে) পড়ে থাকা ঘড়ি অপেক্ষা আস্তে আস্তে চলে। তবে এতে ২টি তুলনার ঘড়ি এবং তৃতীয় নিরপেক্ষ ঘড়ির কথা হিসেবে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

কম শক্তিশালী অভিকর্ষ ক্ষেত্রে সময় (ঘড়ি) দ্রুত দৌড়ায়। সূর্যের চর্তুদিকে আবর্তনের ফলে, অভিকর্ষ ক্ষেত্রের টানেও সময় মন্থর হয়ে পড়ে। পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে ভ্রমণ করলে ঘড়ির সময় পার্থক্য দেখাবে পশ্চিম দিকের যাত্রীর ঘড়ির তুলনায়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এটা হচ্ছে। পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে রাত ০.০৬ মাইক্রো সেকেন্ড মন্থর হয়েছে এবং পশ্চিম দিকে বেড়ে গেছে ০.২৭ মাইক্রোসেকেন্ড। সময়ের এ রকম আরো কত বিচিত্র গতি রয়েছে তা শুধু সময়ের সৃষ্টিকর্তাই জানেন। কোরানে আল্লাহ নিজেকেই মহাকাল বলে ঘোষণা করেছেন।

৬.৩ : সময়ের বাহন ঘড়ির ইতিহাস

ছ'হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরে সমস্ত দিনকে ১২ ঘন্টায় ভাগ করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে চীনারাও একইভাবে সময়ের ভাগ করেছিল। দিন ও রাতকে ১২ ঘন্টায় ভাগ করার পদ্ধতিটা গ্রীকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

সূর্য ঘড়ি : মিশরে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে সবচেয়ে প্রাচীন সূর্য ঘড়ির সন্ধান মিলেছে। এটা সহজ যন্ত্র। এতে নোমন নামে একটা কাঁটা বা নির্দেশক আছে। এটা এমনভাবে আটকান থাকে যাতে এর ছায়া একটা সমতল পিঠে বা ডায়ালের উপর পড়ে। বিভিন্ন ঘন্টা নির্দেশ করার জন্য ডায়ালের গায়ে মিনিটের চিহ্ন দেয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় দেশেই সূর্য ঘড়ির প্রচলন ছিল। অনেকে মনে করেন যে, মিশরের পিরামিড সময় হিসেব করার কাজেও ব্যবহৃত হত। নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের ক্লিওপেট্রার সূচ হয়তো প্রকাণ্ড সূর্য ঘড়ির নোমান হিসেবে তৈরি হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ সনে বেরোসস্ নামে এক ক্যালডীয় পাদ্রী জ্যোতির্বিদ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সূর্য ঘড়ি আবিষ্কার করেন। সমতল ডায়ালের পরিবর্তে তিনি একটা ফাঁপা বলের অর্ধাংশের আকৃতির ন্যায় এক ডায়ালের ব্যবহার করেন। এতে নোমানটি থাকত ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে। অর্ধ-গোলক ডায়ালের ভেতর নোমনের ছায়ার অবস্থানগুলিকে চিহ্নিত করে ঘন্টা ও মিনিটের হিসেব করা হত। "বেরোসিসের হোমিসাইকেল" নামে এ ঘড়ি কয়েকশ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাপরপর অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতির সাথে সাথে সূর্য ঘড়িরও উন্নতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতি বেশ উপকারে এসেছে। খ্রিস্টীয় আঠারো শতকে নতুন ঘড়ি আবিষ্কারের ফলে সূর্য ঘড়ির ব্যবহার কমে যেতে থাকে। ঢাকার বলদা গার্ডেনে অবস্থিত একটি সূর্য ঘড়ি এখনও সময় দেখিয়ে যাচ্ছে। যখন সূর্য থাকে তখন শুধু দিনের বেলায় এ ঘড়ি চলে।

জল ঘড়ি : ৫০০০ বছর আগে চীনদেশে জলঘড়ি বা ক্লেপসাইড্রার প্রচলন ছিল। পাত্রের তলার একটা ফুটো থাকত আর সেটা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি নিচে পড়ত। ফুটোটাকে ছোট বড় করে সহজেই পানি পড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত। পানির পাত্রটিকে ২৪টি ভাগে ভাগ করে এই ভাগগুলো দাগ কেটে চিহ্নিত করা হত। পানি কমে বিভিন্ন দাগের সমান হয়ে সময় নির্দেশ করত।

www.pathagar.com

সে যুগে ভারতবর্ষে আর এক ধরণের জল ঘড়ির প্রচলন ছিল। একটা গামলার তলায় ছোট একটা ফুটো থাকত। পানি ভর্তি আর একটা বড় গামলায় এটাকে ভাসিয়ে দেয়া হত, ফলে তা আস্তে আস্তে পানিতে ডুবতে থাকত। গামলার গায়ে দাগ কেটে তখন সময়ের হিসেব করা যেত।

খলিফা হারুণ-অর-রশীদ ৮০৭ সালে ফ্রান্সের বিজ্ঞ রাজা শার্লমেনের জন্য একটি সোনার পাতে মোড়া জল ঘড়ি উপহার পাঠান। এ ঘড়ির ডায়ালে বারোটি ঘন্টার চিহ্নের বদলে ছিল বারোটি দরজা। যখন কোন ঘন্টা নির্দেশ করার সময় হত তখন সে ঘন্টার দরজা খুলে যেত। সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত নির্দিষ্ট সংখ্যক বল। বলগুলো পিতলের একটা পাত্রের উপর পড়ে সময় সঙ্কেত জানিয়ে দিত। ঠিক বারোটার সময় প্রতিটি দরজায় দেখা দিত একজন ঘোড়সওয়ার, তারপর দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যেত।

অতীতে আমাদের বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য শহরেও জল ঘড়ি ও সূর্য ঘড়ির প্রচলন ছিল। প্রায় ১৩৫ বৎসর আগে বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনপাল তার আত্মজীবনীতে জল ঘড়ি ব্যবহারের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

আওয়ার গ্লাস বা বালি ঘড়ি : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে লিওপ্রান্ড নামে কার্থেজীয় এক সন্ন্যাসী এ ঘড়ি আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে ফানেলের মত দু'টো কাঁচের পাত্র একটা সরু নল দিয়ে যুক্ত থাকত। কাঁচের পাত্র দুটা সমান আকৃতির এবং একটা অন্যটার উপরে অবস্থান করত। উপরের পাত্রটিতে ভরা থাকত খুব সূক্ষ্ম, পরিষ্কার বালি। সরু নল দিয়ে, এ বালি গড়িয়ে পড়ত অন্য পাত্রে। সমস্ত বালি পড়তে সময় লাগত এক ঘন্টা। ঠিক এক ঘন্টা পরে যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে দেয়া হত তাতে উপরের খালি পাত্রটি থাকত এবার নিচে। আর নিচের বালি ভর্তি পাত্রটি থাকত উপরে। এভাবে সারাদিন ঘড়ির ব্যবহার চলত। অনেক ঘড়িতে বালির বদলে পারদ ও ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়।

বহুবিদ কাজের জন্য আওয়ার গ্লাস তৈরি করা হত। জাহাজের গতি ঠিক করার জন্য ২৮ সেকেন্ডের হিসেব দেয়ার মত এরকম আওয়ার গ্লাস প্রথম যুগে তৈরি হয়। জাহাজের গতি মাপার জন্যে 'লগচিপ' নামে এক টুকরো কাঠকে 'লগলাইন' বলে পরিচিত সরু রশি দিয়ে বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হত। এই রশিতে প্রতি ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি পরে পরে একটি করে গেরো বা নট দেয়া থাকত। কাঠটা পানিতে ফেলে দিলেই রশিতে টান পড়ত। যে নাবিক রশিটি ধরে থাকত সে দেখত ২৮ সেকেন্ডে তার হাত দিয়ে কয়টি গেরো বা নট বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি ১০টি গিঠ যেত, তবে তাই হত জাহাজের গতিবেগ। এ থেকেই নৌযানের গতিবেগ সম্বন্ধীয় 'নট' কথাটি এসেছে। হিসেবটা ছিল খুবই মজার। ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি ১ নটিক্যাল মাইলের (৬,৮০০২০ ফুট) অনুপাত; যেমন ২৮ সেকেন্ডে আর এক ঘন্টার অনুপাত ছিল সমান। সে জন্য গিঠ গোনা আর নটিক্যাল মাইল গোণার ফল একই হত।

আগুন ঘড়ি : প্রাচীন যুগে চীন দেশের লোকেরা এক রকম দড়ি ঘড়ি তৈরি করেছিল। দড়ির গায়ে সমান দূরে দূরে কতকগুলো গিট দিয়ে দিত। এক মাথায় আগুন লাগিয়ে দিলে দড়িটা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকত। এক গিট থেকে অন্য গিট পর্যন্ত পৌঁছাতে কতটুকু সময় লাগল তার হিসেবে করা হত। জাপানেও এ ব্যবস্থা চালু ছিল।

www.pathagar.com

বাতি ঘড়ি : রোমান আমলে এ ঘড়ি তৈরি হয়। এটা থেকে যেমন আলো পাওয়া যেত তেমনি মিলত সময়ের হিসেব। একটা সরু কাঁচের নল দিয়ে ঘড়িটি তৈরি হত। নলটার নিচের দিক ছিল বন্ধ। এর গায়ে ঘন্টার দাগ কাটা থাকত। নলটি খাড়াভাবে দাড় করিয়ে তেল ভর্তি করা হত। তারপর সেই তেলের উপর জ্বালিয়ে দেয়া হত বাতি, বাতি জ্বলে তেল পুড়াত আর নল বেয়ে তেলের উপরিভাগ নিচে নেমে আসত। দাগ কাটা নল থেকে তখন অনায়াশেই সময় নির্ধারণ করা যেত। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এর ব্যবহার করত। মোমবাতি আবিষ্কারের সাথে সাথে এটাকে ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। একটা বিশেষ আকৃতির মোমবাতি পুড়ে শেষ হতে কতক্ষণ লাগছে তাই হিসেব করা হত, এরপর এই আকৃতির মোমবাতিকে ঘন্টা হারে সহজেই ভাগ করা হত। আর এরূপ ভাগ করা হত মোমবাতির গায়ে নানা রঙ দিয়ে। কথিত আছে যে, ইংল্যান্ডের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট নাকি মোমের ঘড়ি আবিষ্কার করেন। তিনি দিন ও রাতকে প্রতি আট ঘন্টার প্রহরে ভাগ করে নেন। তার এই প্রহরগুলোকে ধর্মকাজে, প্রজাদের কাজে, আমোদ-প্রমোদ ও অবসর বিনোদন হিসেবে ধরা হত।

ক্লক : পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি প্রথম ঘড়ি হচ্ছে ক্লক। বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সনে আর্কিমিডিস এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি চাকাযুক্ত একটি যন্ত্র তৈরি করেন। চাকার চলন শক্তি একটা ভারি জিনিসের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ছিল না।

ঘড়ি তৈরির ইতিহাসে রোমান দার্শনিক ও গণিতবিদ বোয়োফিয়াস (৪৭৫-৫২৪ সাল) এবং ভেরোনার আর্কিডিকন প্যাসিফিকাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পাদ্রী গার্বাট পরে (পাপ দ্বিতীয় সিলভেষ্টার) একটি ঘড়ি তৈরি করেন। এর পর ঘড়ি গীর্জায় গীর্জায় ব্যবহৃত হতে থাকে একাদশ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঘড়িগুলো ছিল বেশ বড় ও ভারী। কখনো কখনো ৫০০ পাউন্ডেরও বেশি ভারী জিনিস ব্যবহার করতে হত। প্রায় দু'শো বছর আগে রাশিয়ার জার একটি বিরাট ঘড়ি বানান, ওজন দু'শো টন। নেপোলিয়নের ১৮১২ সনে মস্কো আক্রমণের সময় অগ্নিকাণ্ডে ঘড়িটির একটা অংশ ফেটে যায়। এটা ইতিহাসে মস্কোর ঘন্টা নামে বিখ্যাত। মস্কোর ঘন্টা কোনদিনও বাজেনি। গীর্জাতে মানুষকে ডাকার জন্য ও ক্রেমলিনে সময় ঘোষণা (প্রহরীদের প্রহর) ঘোষণার জন্য এটা ব্যবহৃত হবার কথা ছিল।

১৩৬৪ সালে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লস প্যারিসের রাজপ্রসাদের টাওয়ারে একটা ঘড়ি বসাতে মনস্থ করেন। এজন্যে তিনি ভুরটেমবার্গের প্রসিদ্ধ ঘড়ি নির্মাতা হেনরী দ্য ভিক্‌কে ডেকে পাঠান। তিনি পনের বছরে ১৩৭৯ সনে ঘড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

সে যুগের ঘড়িগুলোর মধ্যে দ্য ভিকের ঘড়িটিকে অনেকটা আধুনিক ঘড়ির মতো বলা চলে। দ্যাভিকের ঘড়িটি একটানা ৫০০ বছর পর্যন্ত সঠিক সময় দিয়েছে।

নুরেমবার্গের এক ঘড়ি প্রস্তুতকারক পিটার হেনলাইন ঘড়িতে ঝুলন্ত ভারের বদলে একটা স্প্রিং এর ব্যবহার করেন প্রথমবারের মত। একটা লম্বা স্প্রিংকে যতোই পেঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা যাক না কেন সেটা সুযোগ পেলেই সে প্যাঁচ খুলে ফেলার চেষ্টা করবে। এই স্প্রিং দিয়ে চালানো হল ঘড়ি। ঘড়িতে চাবি দিয়ে স্প্রিংকে যতো প্যাঁচ ঘুরিয়ে

www.pathagar.com

দেওয়া যাবে, খোলার সময় আবার ততগুলো প্যাঁচই খুলে আসবে। কিন্তু স্প্রিংকে তার ইচ্ছে মতো খুলতে দিলে হবে না, তাহলে এক সঙ্গেই সবটা খুলে যাবে। তাই এই স্প্রিং-এর সঙ্গে লাগানো হল গায়ে গায়ে ঠেকানো কতকগুলো ধারকাটা চাকা, তারপর তার সাথে যোগ করা হলো ঘড়ির কাঁটা। এই সবের ফলে নির্দিষ্ট হারে স্প্রিং-এর প্যাঁচ খুলবে, ঘুরবে ধারকাটা চাকাগুলো আর তার সাথে ঘুরবে ঘড়ির কাটা দুটো। এ স্প্রিং-এর নাম হল মেইন স্প্রিং। এর ফলে বড় ঘড়ি তৈরি করার প্রয়োজন ফুরাল। তবে এতে নতুন সমস্যা তৈরি হল। ধারকাটা চাকা দিয়ে মেইন স্প্রিংকে ঘুরিয়ে কুণ্ডলী পাকাতে হতো কিন্তু স্প্রিংটা খুলে আসার সাথে সাথে তার চাকা ঘোরাবার শক্তি ও কমে আসত। ফলে মেইন স্প্রিং খুলতে শুরু করার পর ঘড়ি শ্লো চলতে থাকত।

১৫২৫ সনে মেইন স্প্রিং এর শক্তির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করেন জ্যাকব জেক নামে বোহেমিয়ার প্রাগ শহরের এক ঘড়ি নির্মাতা। তিনি নিচ থেকে উপর দিকে সরু হয়ে গেছে এমন একটি চাকা-ফিউজি ব্যবহার করেন। মেইন স্প্রিং এর ব্যারেলের সাথে ফিতে বেঁধে সে ফিতেকে ফিউজের গায়ে প্যাঁচানো খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে দেওয়া হতো। এখন মেইন স্প্রিং খোলার সাথে সাথে ব্যারেলটাও ঘুরতে থাকত এবং তার গায়ে ফিতেটা আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে ফিতের টানে ফিউজিটাও ঘুরত। প্রথমে ফিউজির সরু অংশের ফিতে খুলে যেত-ক্রমে মেইন স্প্রিংয়ের গতি কমে আসায় তার শক্তিও কমে যেতো—তখন ফিতেটা ফিউজির প্রশস্ত জায়গায় টান দিত। এভাবে মেইন স্প্রিংয়ের শক্তির সমতা রক্ষা করা হতো, যাতে ঘড়ির উপর সবটুকু শক্তি সব সময়েই সমান থাকে। এটা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বাকী সমস্যা বল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উন্নতি করা।

ওয়াচ : মেইন স্প্রিংয়ের আবিষ্কারক পিটার হেনলাইন ছোট ঘড়ির (ওয়াচ) প্রবর্তন করেন। এগুলি ক্লকেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ১৫২৫ সনে ফিউজি ব্যবহার করায় ওয়াচগুলো বেশ সময় দিতে থাকে। ১৫৫০ সালে লোহার চাকার বদলে পেতলের চাকার ব্যবহার শুরু হয়। এ সময়েই লোহার পিনের বদলে স্টীলের ব্যবহার শুরু হয়। ১৬০০ সালের দিকে ওয়াচে স্বচ্ছ কাঁচের প্রয়োগ শুরু হয়। মিনিটের কাটার ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৬৭৩ সালের দিকে। ক্রিশ্চিয়ান হয়গ্যানস, যিনি প্রথম ক্লকে দোলনের ব্যবহার করেন—১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'হেয়ার স্প্রিং' এর আবিষ্কার করেন। এটা সময় নির্ণয়ের ইতিহাসে এক নবযুগ আনে। এখান থেকে নির্ভরযোগ্য ওয়াচ তৈরি সম্ভব হল।

নিকোলাস ফ্যাসিও নামে সুইজারল্যান্ডের এক ঘড়ি নির্মাতা প্রথম ঘড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে 'জুয়েল' ব্যবহার শুরু করেন। ওয়াচের চাকাগুলো ছোট ধুরার (axles) সাথে লাগানো থাকে। এই ধুরার সরু প্রান্তকে বলা হয় পিভট্। চাকাগুলোর দাঁত খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে ঠিকমতো বসিয়ে রাখার জন্য পিভটগুলোকে ধাতুর তৈরি ছোট প্লেটের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। চাকাগুলো যাতে না সরে যায় সে জন্যে উপরে নিচে দুটো প্লেট থাকে। এখন চাকা ঘুরার সাথে সাথে ফুটোগুলো ক্ষয়ে বড় হতে থাকে। ফলে চাকা আর ঠিক জায়গায় থাকে না এবং চাকাগুলো খাঁজে খাঁজে আর মিলে না। কাজেই ওয়াচের গতি কমে বন্ধ হয়ে যেত।

www.pathagar.com

ফ্যাসিও চেপ্টা গোলাকৃতি জুয়েলের অংশ কেটে সেই ফুটোতে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ওগুলো ধাতব প্লেটের সাথে মিশে থাকবার ব্যবস্থা রাখা হল। এখন পিভট্ বেশ শক্ত জিনিসের উপর ঘুরবে এবং একে ঠিকমত তেল দিয়ে রাখলে ঘর্ষন কমে ওয়াচকে সঠিক সময় দেবার উপযোগী করতে থাকবে। এভাবে দুর হল আরেক সমস্যা। ঘড়ি তৈরির অনেক সমস্যাই আঠার শতকে সমাধান করা হয়। এসকেপমেন্ট সহ অনেক যন্ত্রাংশের উন্নতি সাধন হয়। সুইজারল্যান্ড ও জাপানের ঘড়ি নির্মাতারা বেশ সরস ঘড়ি তেরি করে। ফিউজির সাহায্য ছাড়াই তারা ওয়াচ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। তাতে যান্ত্রিক জটিলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

১৭২৯ সনে বিলেতের এক কাঠ মিস্ত্রির ছেলে জন হ্যারিসন ছয় বৎসর খেটে একটি ক্রনোমিটার তৈরি করেন যাতে যান্ত্রিক ঘর্ষণের ফলে বা তাপের তারতম্যের ফলে সময়ের কোন ভুল-ত্রুটি হয় না। নাবিকরা কোন স্থানের স্থানীয় বা সৌরসময় বের করতে পারত। এস্ট্রোলেবের সাহায্যে দুপুরটা ঠিক করতে পারলেই হল। কিন্তু নির্দিষ্ট দ্রাঘিমার সময় জানার জন্য একটা যন্ত্রের দরকার ভীষণভাবে পড়েছিল। সমুদ্রের বুকে কোন স্থানের দ্রাঘিমা বের করার দরকার ছিল, কিন্তু এটার সমাধান স্বয়ং নিউটনও করতে পারেননি। শুধু হ্যারিসন তার অপূর্ব প্রতিভা দিয়ে ক্রোনোমিটার আবিষ্কার করে এ সমস্যার সমাধান করেন। আধুনিক যুগে ঘড়ি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। এর মধ্যে ১২০টি বিভিন্ন অংশ আছে। ব্যালান্স হুইল হচ্ছে আধুনিক ঘড়ির হৃৎপিণ্ড। এই চাকার প্রতিটি উঠানামাতে ঘড়ির প্রাণসঞ্চার হয়। এক বছরে এই হুইল ১৭৪২ মাইল পথ ঘুরে আসে।

ক্রনোগ্রাফ নামের এক ধরণের ঘড়িতে সেকেন্ডের $\frac{১}{৫}$ ভাগ সময় পর্যন্ত হিসেব করা যায়। অনেক ঘড়িতে দিন তারিখ মাস পর্যন্ত থাকে। যান্ত্রিক ঘড়ির ক্ষেত্রে আর একটি সংযোজন হলো অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি। কিন্তু এসব যান্ত্রিক উন্নয়নকে অতিক্রম করে ঘড়ির জগতে নতুন অগ্রগতি এল বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক ঘড়ির উদ্ভাবনে ১৯৫২ সনে। বৈদ্যুতিক শক্তিকে একটি কুণ্ডলী ও স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যালেন্স এ হেয়ার স্প্রিং স্পন্দনকে চালনা করে; একটি বিদ্যুৎ চুম্বক অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থের তৈরি ব্যালেন্সকে আকর্ষণ করিয়ে এবং একটি টিউন কর্ককে ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে অনুনাদী করিয়ে তার অপরিবর্তী উচ্চ কম্পনমানকে ঘড়ি চালনায় কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

সবশেষে নির্ভুল সময় মাপার ক্ষেত্রে এসেছে আণবিক ঘড়ি। এ ঘড়ির মূলসূত্র হচ্ছে এ রকম। অ্যামোনিয়ার অণুতে ত্রিভুজের তিন কোণায় সাজানো তিন হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্য দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুর স্বাভাবিক উঠা-নামা একটি বিশেষ হারেই মাত্র ঘটতে পারে। সেই হারটি হচ্ছে সেকেন্ডে ২,৩৮৭ কোটি সাইকেল। একটি কোয়ার্জ কেলাসের কম্পন থেকে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা থেকে ২,৩৮৭ কোটি সাইকেলের রেডিও তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় এক্ষেত্রে। যতক্ষণ এ নির্দিষ্ট কম্পন হারের রেডিও তরঙ্গ অ্যামোনিয়া ভর্তি চেম্বারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় অ্যামোনিয়া অনুগুলো তা শোষক করে নেয়। কম্পন হারের কোন ব্যতিক্রম হলেই অ্যামোনিয়া অণুগুলো তা শোষণ করে নিতে পারে না বলে চেম্বার থেকে এই রেডিও তরঙ্গের শক্তিটা পার হয়ে আসে। রেডিও

www.pathagar.com

তরঙ্গের সঙ্গে সরাসরিভাবে আসা অ্যামোনিয়া চেম্বারের মধ্যদিয়ে আসা তরঙ্গের তুলনা থেকে বুঝা যায় কোয়ার্জ কেলাসটায় কম্পন হার নির্ধারিত কম্পন হার থেকে কোন দিকে সরে গেছে এবং সেভাবে এর কম্পনহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পারমাণবিক ঘড়ির আর একটি উদাহরণ হল **সিজিয়াম ঘড়ি**। এক্ষেত্রে কম্পন হারকে তিনশো কোটি ভাগের এক ভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যার অর্থ হল দশ হাজার বছরে এক সেকেন্ডের বেশি ভুল হবে না এই ঘড়িতে। সিজিয়ামের পরিবর্তে রুবিডিয়াম বা হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যবহৃত হতে পারে নির্ভুল সময় মাপার জন্যে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এমন ঘড়ি নির্মানের পরিকল্পনা করছেন যা দিয়ে লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের মধ্যে নির্ভুলভাবে সময়কে মাপা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা সনের জন্মকথা

৭.১ : বাংলা সনের জন্মকথা

রাশিচক্রের ভিতর দিয়ে চন্দ্রের সাতাশটি নক্ষত্র পরিক্রমণের হিসাবে নক্ষত্র সনের প্রতিষ্ঠা হয় প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ কর্তৃক। চন্দ্রের রাশি পরিক্রমণে সময় লাগে ত্রিশ দিন, পক্ষান্তরে সূর্যের সেখানে লাগে ৩৬৫ দিন, অর্থাৎ এক মাসে সূর্য মাত্র একটি করে রাশি অতিক্রম করে। তাই চন্দ্রের পরিক্রমের সময়কে বলা হয় মাস, আর সূর্যের পরিক্রমের সময়কে বলা হয় বৎসর। আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষেরা সূর্যের গতিবিধি লক্ষ্য করে মাস বা বছরের হিসেব করতেন না। তারা চাঁদ এবং রাশিচক্রের উপর দিয়ে চাঁদের গতিবিধি দেখে সময় ভাগ করতেন। এই ভাগকে মাস, তিথি, দণ্ড, বৎসর ইত্যাদি নামে অভিহিত করতেন।

মাস বলতে তারা বুঝতেন চাঁদের এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমায় আসতে যে সময়টা লাগত সেই সময়টাকে ($২৯\frac{১}{২}$ দিন) এক রাশি থেকে সূর্য যে সময়ে পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করে তাকেই সংক্রান্তি বলে—এই সময়কে এক 'সৌর মাস' বলে এখন। সূর্য রাশিচক্র বা ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়ে চলতে চলতে যেদিন শেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেদিন থেকে আমাদের নতুন বছর শুরু হয়। এই দিনটিই পয়লা বৈশাখ। সংক্রান্তির শুরু হয় মেষ রাশি থেকে এবং শেষ হয় মীন রাশিতে।

বারো রাশির নাম হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। চাঁদ ২৭ দিনে বারো রাশি ও ২৭ নক্ষত্র এবার করে ঘুরে আসে। সূর্যের লাগে ১ বৎসর। বারো রাশি ও ২৭ নক্ষত্র মিলে রাশিচক্র পূর্ণ হয়। এ সম্পর্কে হিন্দুদের পুরানে একটি গল্প আছে প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাদেরকে তিনি চন্দ্রদেবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। চন্দ্রদেব বারো রাশির মধ্যে সাতাশ সুন্দরী স্ত্রীকে এমনভাবে ঘর বেঁধে দিলেন যে প্রতি মাসে একবার তিনি তাদের সাক্ষাৎ দিতে পারেন। বৈশাখ মাসের নাম হয়েছে বিশাখা নক্ষত্র থেকে; তেমনি জৈষ্ঠ মাস—জেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে; আষাঢ়—আষাঢ়া, শ্রাবন—শ্রবনা, ভাদ্র—ভাদ্রপাদি, আশ্বিন—আশ্বিনী, কার্তিক—কৃর্তিকা, অগ্রহায়ন—প্রথম মাস, পৌষ—পুষ্যা, মাঘ—মঘা, ফাল্গুন—ফল্গুনী, চৈত্র—চিত্রা নক্ষত্র থেকে।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যেমন নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ করেছিলেন, সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণের বেলাতেও তেমনি গ্রহ-উপগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

www.pathagar.com

যেমন রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি। সোম অর্থ চাঁদ। মোঘল বাদশাহ আকবরের সময় হিজরী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা সন প্রচলিত হয় ১১ই এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে, ১লা বৈশাখ ১৪৭৮ শতাব্দ। মোটামুটি বাংলা সনের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রিস্টিয় সন মিলে।

বাংলা মাস গণনার সুবিধার জন্য বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র এই পাঁচ মাসের প্রতি মাস ৩১ দিন হিসাবে এবং আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রাহায়ন, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই বাকি সাত মাসের প্রতি মাস ৩০ দিন হিসাবে গণনা করা হয়। লিপ-ইয়ারের চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। ৪ দ্বারা যে সাল বিভাজ্য তাহাই লীপ-ইয়ার বা অতিবর্ষ। বাংলা একাডেমী ড. শহীদুল্লাহর প্রবর্তিত এই বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করেছেন ১৩৭৩ সাল থেকে।

বৈদিক ঋষিরা, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে কালবিভাগ করে দিলেন। তার পাঁচশত বৎসর পরে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পঞ্জিকার প্রচলন হয়। তারপর ৪র্থ বা ৫ম খ্রিস্টাব্দ শতকে আর্যভট্ট, বরাহমিহির কর্তৃক 'সূর্য সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রচলন করেন। বিগত ১০০ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ বাংলাদেশে পঞ্জিকা মুদ্রিত হইতেছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় (১৭৫০ সালের দিকে) 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' সঙ্কলিত হয়। ১৮৬৯ সালে 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার' প্রকাশনা আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সালে ভারতে ড. মেঘনাদ সাহা কর্তৃক পঞ্জিকা সংশোধিত হয়।

৭.২ : ইংরেজি মাসের জন্মকথা

পুরানো দিনে ব্যবিলন, মিশর এই সব প্রাচীন সভ্যতায় সাত দিনের একটি 'সপ্তাহ' গণনা শুরু হয়। ইংরেজ সমাজে সপ্তাহের নাম দেয়া হয় নরওয়ের পৌরাণিক দেব-দেবীর নাম অনুযায়ী যেমন : সুন্নানড্যাগ (Sunnandaeg)—রবিবার; মোনানড্যাগ (Monandaeg)—সোমবার; তিবেসড্যাগ (Tiwesdaeg)—মঙ্গলবার; বোদেনড্যাগ (Wodendaeg)—বুধবার; তরড্যাগ (Thordaeg)—বৃহস্পতিবার; ফ্রিগ্গাড্যাগ (Friggadaeg)—শুক্রবার; স্যাতরনড্যাগ (Saeterndaeg)—শনিবার।

রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার ৪৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ক্যালেন্ডার সংস্কারের কাজে প্রথম হাত দেন। তাকে সাহায্য করেন আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোর্তিবিদ সোসিগেনীস। ঠিক করা হয় বৎসর হবে ৩৬৫ দিনে আর ৪ বছর অন্তর বছর হবে ৩৬৬ দিনের। ১৬০০ বছর এই ক্যালেন্ডার দিয়ে কাজ চলল। কিন্তু ততদিনে দেখা গেল যে ১০ দিনের হিসাব গরমিল হয়ে গেছে। কারণ হল যে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগে ৩৬৫, ২৪২২ দিন। অর্থাৎ বছরে বাড়তি দিন হয় ৭.৮ দিন। এই হিসাব শোধরাবার জন্য পোপ গ্রেগরী ১৩, ১৫৮২ সনে ঠিক করলেন শতাব্দীর যে বছরকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করা যাবে না সে বছরকে লীপ-ইয়ার বলে গণ্য করা হবে না। তার মানে সে বছরে ফেব্রুয়ারি ২৮ দিনের হবে। এর ফলে ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সনে লীপ-ইয়ার হবে না। কিন্তু ২০০০ সালে হবে। এই ক্যালেন্ডারের নাম গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই ক্যালেন্ডার প্রচলিত।

রোম সাম্রাজ্যে আগে মার্চ মাস থেকে বৎসর শুরু হত। তাই সেপ্টেম্বর (অর্থ সপ্তম), অক্টোবর (অষ্টম) নভেম্বর (নবম) ডিসেম্বর (দশম) মাস হলেও বর্তমানে তা নয়।

www.pathagar.com

পরে জানুয়ারি মাস থেকে নববর্ষ গণনা শুরু হয়। যীশু খ্রিস্টের জন্মদিবসের কাছ থেকে (২৫ শে ডিসেম্বর)।

জানুয়ারি নামটা এসেছে রোমানদের দেবতা ইয়ানুস বা ইংরেজিতে (Janus) জেনাস থেকে। দাড়িওয়ালা এই দেবতার একটা মুখ সামনে আরেকটা পিছনে।

ফেব্রুয়ারি নাম আসছে রোমানদের ফেব্রুয়াম (Februam) বছর থেকে।

মার্চ মাস তার নাম পাচ্ছে রোমানদের যুদ্ধ দেবতা মার্স (Mars) থেকে।

এপ্রিল এসেছে লাতিন শব্দ আপেরিরে (Aperire) থেকে যার মানে হল খুলে ধরা। সম্ভবতঃ এই সময় ফুলের বাহার দেখা দেয়, রবিশস্য কাটা হয় সেই জন্য এই নাম। এ্যাংলো–স্যাক্সনরা এই মাসের নাম রেখেছিল ঈস্টার মাস।

মে মাসের নাম এল রোমানদের দেবী মাইয়া (Maia) থেকে।

জুন হচ্ছে স্বর্গের দেবী জুনিয়াস (Junius) থেকে।

জুলাই তার নাম পেল রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার থেকে।

আগস্ট রোম সম্রাট অগাস্টাস (Augustas) থেকে, (Julius) তার যুদ্ধ বিজয় উপলক্ষে নাম রেখেছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের নাম আসছে লাতিন শব্দ সপ্তেম (Septem) থেকে যার মানে সপ্তম।

অক্টোবর তেমনি অক্টো (Octo) শব্দ থেকে যার মানে অষ্টম।

নভেম্বর হল নোভেম (novem) থেকে যার মানে নবম।

ডিসেম্বর মাস হল লাতিন শব্দ দেসেম (decem) থেকে, যার মানে দশম।

শেষের এই চারটি মাস ক্যালেন্ডার সংশোধনের আগে তাদের পূরণবাচক সংখ্যা অনুযায়ী মাস ছিল।

৭.৩ : সময় সম্পর্কে কিছু আশ্চর্য্য তথ্য

- প্রাচীন হিন্দুরা ২৪ সেকেন্ড সমান সময়কে 'বিপল' বলত। প্রত্যেক বিপলকে ৬০ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে বলত পার। 'পার' এর $\frac{১}{৬০}$ ভগ্নাংশের নাম তাৎপার, তাৎপার এর $\frac{১}{৬০}$ ভাগের নাম বিতাৎপার, তার $\frac{১}{৬০}$ অংশের নাম 'ইমা' এবং এভাবে শেষ এককের নাম কাস্ত অর্থাৎ এক সেকেন্ডের তিন হাজার লক্ষ ভাগের এক ভাগ (৩০০ মিলিয়ন)। প্রাচীনকালের হিন্দুরা সব সময়েই ধীর গতিতে কাজ করার পক্ষপাতী ছিল, তাহলে সময়ের এই সুক্ষ্মতম ভাগগুলো তাদের কি কাজে লাগতো? বর্তমানে জানা গেছে যে কাস্ত বা ৩ × ১০$^{-৮}$ সেকেন্ড কয়েক রকম মেসন এবং হাইপারন কণার জীবনকালের কাছাকাছি।
  - প্রাচীন প্রস্তরযুগে (৩৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্ব) সময়ে পাথরের বা হাড়ের উপর অঙ্কিত চিহ্ন নাকি দিনপঞ্জি হিসাবে ব্যবহৃত হত।
  - প্রাচীন স্ক্যান্ডিনোভয় রুনিক দিনপঞ্জি উত্তর ইউরোপে দেখা যায় প্রথম প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে, আর এর ব্যবহার পরিত্যাক্ত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাত্র। এই দিনপঞ্জির আরম্ভ হয়েছিলো ৪৭১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

www.pathagar.com

মিশরের প্রথম দিনপঞ্জি শুরু হয় ৪২৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। মিশরীয় নক্ষত্রতালিকা প্রকাশিত হয় ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ৬০০০ বছর আগে ব্যাবিলনীয় পুরোহিতরা সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিতে পারতেন। ইংল্যান্ডের আদিম অধিবাসীরা ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাথরের তৈরি 'স্টোনহেঞ্জ' মানমন্দির তৈরি করেছিল। চীনারা তারও এক ডিগ্রী উপর ছিল। ৪৬০০ বছর আগে তারা প্রথম পঞ্জিকা ব্যবহার করে।

- প্রাচীন মায়াজাতির হিসেব মতে বছর হয় ৩৬৫.২৪২০ দিনে। তাদের পঞ্জিকা আমাদের চাইতে নিখুঁত। তাদের মতে চান্দ্রমাস হচ্ছে ২৯.৫৩০২০ দিনে আমাদের মতে ২৯.৫৩০৫৯ দিনে।
- প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ৬৩০,০০০ বছরের তথ্য ছিলো। ব্যাবিলনের গ্রন্থশাখার বয়স নাকি ৪৭০,০০০ বছর। অন্য এক মতে আসিরীয় ইতিহাস ২৭০,০০০ বছরের পুরনো। মিশরীয় পুরোহিতরা নাকি জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন ৪৯,২১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। ফারাও সম্রাটদের ইতিহাস নাকি ৩৬,৫২৫ বছরের। মিশরীয় ঋষিরা ৪০,০০০ বছর ধরে জ্যোর্তিবিদ্যার চর্চা করেছেন গোপনে। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা উত্তর প্লাবন যুগের প্রথম রাজবংশের কাল, তাদের সময়ের ২৪,১৫০ বছর আগে বলে স্থির করেছিলেন।

মায়াজাতি তাদের দিনপঞ্জি রাখার পদ্ধতি আরম্ভ করে ১৮৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। হেরোডোটাস বলেছিলেন অসিরিস রাজত্ব করেছিলেন ১৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

ব্যাবিলনের চান্দ্রপঞ্জি এবং মিশরের সৌরপঞ্জি ১১৫৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ভারতীয় দিনপঞ্জির আরম্ভ ১১৬৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

- আটলান্টিস নিমজ্জিত হয় ৯৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর জোরোসাস্ট্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থে সময়ের হিসেব আরম্ভ হয় ৯৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে।
- ব্যাবিলন এবং মিশরীয় পুরোহিতরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সভ্য হয়েছে ৫০ লক্ষ বছর আগে।
- প্রাচীন যুগে 'কাল দর্শন বা সময় দর্শন যন্ত্র' ছিল। ফ্রান্সিসকাম পিকাস Book of the six sciences বইয়ে 'অল মোসোফি দর্শনের' নির্মাণ কৌশল বর্ণনা করেছেন। শোনা যায় ঐ দর্পনে সময়ের ছবি দেখা যেতো।
- মিশর এবং গ্রীসের দৈববানীর দেবতারা ভবিষ্যতের বা অতীতের ঘটনার কথা বলতে পারতেন।
- আইনস্টাইনের মতো নস্ট্রাডেমাসও বলেছিলেন ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'অনন্তকাল প্রবাহ অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।' তিনি ২০০০ সন পর্যন্ত পৃথিবীর ভবিষ্যত বলে গেছেন, কিন্তু কিভাবে তিনি ভবিষ্যত দেখেছিলেন?
- মিশরীয় পুরোহিতের লিপিবদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে : মানজাতির বহু ধ্বংসের যুগ পার হয়ে গেছে এবং আরও বহু ধ্বংস আসবে। 'শিশুর মতো তোমাদের সকলকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আগুন এবং জলের দ্বারা বারবার ধ্বংসকার্য চলতে থাকায় পরবর্তী বংশধররা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ঘটনার ক্রমিকতার স্মৃতি আর সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সময় তুমি কার? সময়ের নদীতে একরাশ বুদবুদ

একটা কালতো মরন পারে, আসছে যে কাল কোথায় আজ?
তাদের কথা ভাববি বসে , এই ক্ষণিকের স্ফুর্তি মাঝ!
—ওমর খৈয়াম।

৮.১ : সময় তুমি কার

"আয়ুর তারা পড়ছে খসে মরণ-উষার চরনপর-যাত্রা যে কাল করতে হবে ফুরিয়ে নে সব-ত্বরিৎ কর; কোন সে রসের আশায় বধূ মরছ ঘুরে রাত্রিদিন-ঘূর্ণী পথের নাইকো সীমা, অনন্ত সে কোথায় লীন।"

তাইতো, মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে কালের, সময়ের পেষণে পীড়িত। সময়ের উপলব্দি থেকেই সে চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, ধর্মে, বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে। সূর্য চন্দ্রের আবির্ভাবে, ঋতুচক্রের পরিবর্তনে মানুষ সময়ের ধারণা করতে পেরেছে। যেসব স্থানে ঋতুপরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন সামান্য হয়, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সেখানে সময়ের দাম তারা দিতে জানেনি। অন্যদিকে নীলনদের জোয়ার ভাটার উপর মিশরের স্বাচ্ছল্যতা নির্ভর করত বলে কি সত্যতাই না গড়ে উঠল ঐ দেশে যারা সময়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করেছিল।

গত পঞ্চাশ বৎসরে শুধু মাত্র আমরা সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু জানতে পেরেছি। মানব সভ্যতার প্রথমবারের মত আমরাই জানতে পেরেছি যে সময় অসীম নয়; সময়ের অত্যাচার একদিন শেষ হবেই। সময়কে অতিক্রম করে মানুষ তার চিন্তারাজি ভবিষ্যতের পানে চালিয়ে দিতে শিখেছে। সময় নিয়ে কত দেশে কত যুগে কত কবি কত অমরগাথাই না রচনা করেছেন, হা-হুতাশ করেছেন, তারপর সময়ের বুকেই হারিয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের সৃষ্টি সময়কে ফাঁকি দিয়ে বেচে আছে। লিখনী, বই, কাগজের মাধ্যমে সময়ের বিরুদ্ধে মানুষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ফটোগ্রাফী, রেকর্ডিং আরো উন্নততর সংস্করণ। এরা সময়কে করেছে বন্দী।

আজকে আমরা যা চাই, তা হল,

অতীত দর্শন এবং অতীতের পুনর্গঠন এবং তার পরিবর্তন, অতীতে ভ্রমণ, বর্তমানকে ত্বরান্বিত বা সুবিধামত মন্থর করা; ভবিষ্যতে ভ্রমণ এবং ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েই এগুলো করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির নিয়মেরই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। অতীতের প্রতিফলন, ঘটনার শক্তি আওয়াজ সবই দুর্বল হয়ে চারিপার্শ্বে হারিয়ে যায়। সরাসরি কোন প্রমাণ আমরা করতে পারব না—সবই হবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কল্প বিজ্ঞান লেখকরা এমন কিছু লেখেন যে তাতে অবাস্তবতাই থাকে বেশি। ঢাকা বিটিভিতে ১৯৮৭ সনে এইচ, জি. ওয়েলসের "টাইম মেশিন" ফিল্মটা দেখিয়েছিল—এতে টাইম মেশিনে চড়ে নায়ক আশি হাজার বছর পরের ভবিষ্যত পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছেছিল। রয় ব্রাডবেরী তার এক কল্প গল্পে দেখিয়েছিলেন সময়ের রথে অতীতে ডাইনোসোরদের রাজত্বে শিকার করার কি ফল দাঁড়ায়। আজ থেকে দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গেল আমাদের এ যুগের নায়ক শিকার করতে। ডাইনোসরটার মারা যাবার কথা একটা বিরাট গাছ ভেঙে পড়বার ফলে। গাছটা ভাঙবার ১ সেকেন্ড আগে গুলি করলে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না এমনটি জানিয়েছিল কম্পিউটার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ডাইনোসরটি একটি প্রজাপতিকে চাপা দেয়। এই একটা প্রাণীর ক্ষতিপূরণের চেইন চলতে চলতে ১০ কোটি বছর পরের পৃথিবীতে নায়ক ফিরে এসে দেখল মানুষ এখনও জন্ম নেয়নি। তার আবির্ভাব আরও কয়েক কোটি বছর পিছিয়ে গেছে। নায়ক একা হয়ে পড়ল। আজিমভ 'শেষ প্রশ্ন' নামক গল্পে মানবজাতি তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি দেখিয়েছেন সুন্দরভাবে।

অতীতে হস্তক্ষেপ করলে ভবিষ্যতে নতুন আরেকটা পৃথিবী গড়ে উঠবে। কে জানে হয়ত একটু পিছিয়ে যাবে ঘটনাগুলি কিন্তু ধারা অব্যাহত থাকবে। এল. এস. ডি. হেরোইন ড্রাগনের নেশা যারা করেন তারা বর্তমানের বেকারত্ব, প্রেমে হতাশা, নৈরাশ্য জনক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সময়কে ফাঁকি দিতে চান। তাদের ক্ষেত্রে সময় ধীরে ধীরে চলে। এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজে তারা পুরো ঘন্টা স্বপ্ন দেখে থাকে। স্বপ্নের কাব্যিক জগতে বিবরণ করে। মস্তিষ্কের কোষ প্রবাহে যত ব্যঞ্জক ঔষধটির প্রতিক্রিয়া এমন যে সময়ের ধারণাটিই ঐ নেশাখোরের জন্য মন্থর করে দেয়।

প্রফেসর জে. বি. এস. হালডেন লিখেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমরা যা কল্পনা করি তার চাইতেও আশ্চর্যজনক নয় শুধু, আমাদের কল্পনাশক্তির বাইরেও আশ্চর্যজনক তা। আপেক্ষিকতাবাদ হচ্ছে সময়ের আশ্চর্যজনক জীবনের পথে সামান্য একটু পদ-চিহ্ন। মেথিউ আরনল্ড তার "ফিউচার" কবিতায় লেখেন "সময় নদীর বুকেও বহমান এক জাহাজে ভবঘুরে মানুষের জনক। শতাব্দী ধরে নাবিকহীন, মাস্তুল, হীনভাবে ভেসে চলেছে সে। সবেমাত্র এখন সে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে শিখেছে। কিন্তু এ ইঞ্জিন স্রোত ধারার বিপরীতে যাবার মত শক্তিশালী নয়। সে কেবল দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে বা কিছু সময় বসে থেকে চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলী দেখে নিতে পারে। যাই করুক, শেষ পর্যন্ত সময়ের নৌকা তাকে বিশাল মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করবেই।"

৮.২ : সার্বজনীন কাল

সার্বজনীন কাল বলতে এমন কিছু নেই। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব এক একজনের নিজের সময়। একজনের জন্য যা অতীত অন্যের জন্য তা বর্তমান বা ভবিষ্যত। কোন সীমাবদ্ধ জায়গায় এটা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে অতীতকালে কি ঘটেছিল, এখন

www.pathagar.com

কি ঘটছে, ভবিষ্যতে কি করবার ইচ্ছে রয়েছে। এই মুহূর্তে মঙ্গল গ্রহে কি ঘটছে? এমন প্রশ্নের কি ব্যাকরণ ঠিক আছে? না, নাই। যে মুহূর্তে এটা জানতে চাওয়া হয়েছে মহাশূন্যে একজন নভোচারী ঠিক সেই মুহূর্তে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেও তাদের দুজনের জন্য এই মুহূর্তটি বিভিন্ন সময়ের। মঙ্গলে বার্তা পৌঁছতে ২৩ মিনিট দেরী হয়, সুতরাং পৃথিবীর এখন মঙ্গলে ২৩ মিনিট পরে হবে। বস্তু যত দূরে থাকে, এখনের সীমাও ততই বেড়ে যায়। একহাজার কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে কোন কোয়াসারের যে আলো এখন পৃথিবীতে পৌঁছল, ঠিক এই মুহূর্তে আমরা দেখছি কোয়াসারটিকে টেলিস্কোপে, কিন্তু ওদিকে ঐ কোয়াসারটা ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে, সে আর ঐ জায়গায় নেই। কারণ ১০ বিলিয়ন বৎসর একটা তারার জন্য যথেষ্ট আয়ু।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে বিরাজমান। অনন্তকালের অর্থ এখানে আদিও নেই, শেষও নেই। পদার্থবিদ বলেন যদি ঈশ্বর সময়ের আওতার ভিতরে রয়ে থাকেন তাহলে সময়ের সাথে তারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, **সময় মহাবিশ্বেরই অঙ্গ**। মহাবিশ্বের (দেশ) বাইরে সময় থাকতে পারে না। সময় স্বর্গীয় গুণ নহে। একে পরিবর্তন করা যায়। এটা একটা বহুল বিতর্কিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে যারা আরও জানতে চান তাদেরকে আজিমভের "লাষ্ট কোশ্চেন" গল্পটি এবং পল ডেভিসের "গড এন্ড এন্ড দি নিউ ফিজিক্স" বইটির ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা পড়ে দেখার পরমর্শ দিচ্ছি।

কোরানে আছে : দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবদানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (১০ : ৬) "নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে (৩ : ১৯০)।

আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, যারা দেখে তাদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে।—২৪ : ৪৪।

যে ঈশ্বর সময়ের ভিতরেই রয়েছেন তাকেও এই বিশ্বের ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে। কোন এক সময় 'মহাকাল' তার অস্তিত্ব হারাবে ভবিষ্যতে। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিজের অবস্থাও নিরাপত্তাহীন। ঈশ্বর যদি সময় সৃষ্টি না করে থাকেন তাহলেও তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও স্রষ্টা নন। যেহেতু দেশকাল একীভূত ঐক্য। সুতরাং এই যুক্তিতে উপনীত হওয়া যায় যে দেশকালের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতে বস্তু ও শৃঙ্খলা ও প্রাকৃতিক নিয়মেরই বদৌলতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভুত হবে ও চলতে থাকবে। এখন এই স্বয়ংক্রিয় ভাবটাকেই যদি ঈশ্বর বলে মনে করা হয়, সেই সাথে তিনি আকারও নেন নিরাকারের সাথে সাথে, তাহলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর। একই সময়ে মহাকালের ধারক বাহক ও সৃষ্টিকর্তা তার বাইরেও রয়ে যান তিনি।

"সময়হীন" কথাটার সাথে এভাবে আমরা পরিচিত হই। গতকাল, আজ, আগামীকালেও নেই। কিন্তু তিনি আছেন সময়েরি বাইরে। তিনি নিজেই যে মহাকাল।

সময়ের হাতের বাইরে যদি ঈশ্বর থেকে থাকেন তাহলে তিনি পরিকল্পনা করে বিশ্বকে সাজাতে পারেন না, কারণ এগুলিত সময়ের সঙ্গেই জড়িত। ঈশ্বর বা 'বিশ্বমনন'

www.pathagar.com

কি সময়ের সাথেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে? যদি গড়ে বিশ্বের প্রতিটি অণুর আজকের পজিশন জানেন, তাহলেত আগামীকালই আবার এগুলির পরিবর্তন ঘটবে—সেটাও তিনি জানবেন। তাহলেত সারাটা সময় ধরে তাকে এসব জানতেই হবে। **এখানেই পদার্থবিদ্যার সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার বিরোধ। তবে শেষ কথাটা হল যে** পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির যে বিরাট বিস্ফোরণটার কথা বলে, ওটা শুরুর আগেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল কি? কোত্থেকে এল ঐ মহাডিম্ব, বিশ্বব্রহ্মান্ডের শেষ সীমা আছে কি? শেষের পরেও কি আছে আর? কোথায় শুরু কোথাইবা এর শেষ, এটা না কোন যুক্তি, না কোন প্রমাণ, সূত্র দিয়ে বোঝা যাবে। এটা জ্ঞানী লোকেরা শুধু চিন্তা চিন্তা করে অনুভব করতে পারবেন, বুঝতেও পারবেন, কেবল তারা জ্ঞানকে হস্তান্তরিত করে যেতে পারবে না। নিজেকেই জ্বেলে নিতে হবে নিজের পথের আলো। **এ প্রসঙ্গে কোরান গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে—তবেই স্রষ্টা ও সৃষ্টি, দেশকালের উপলব্দি ঘটবে।**

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনা করেন। তারপর একদিন সব কিছুরই বিচারের জন্য ফিরে আসবে। যে দিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।—৩২ : ৪৬

ওরা জোর করে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুর্নজীবিত করবেন না।' না, তার পক্ষ হতে এ সত্য প্রতিশ্রুতি; কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না।—১৬ : ৩৮

পৃথিবী ছাড়িয়ে যেই আপনি মহাকাশে উঠলেন, দেখবেন ভীষণ ঠাণ্ডা, সব জমে আসছে, তাপমাত্রায় প্রায় ২৭০° ডিগ্রি পর্যন্ত। ঠাণ্ডা ছাড়াও রয়েছে ভীষণ অন্ধকার। চতুর্দিকে শুধু তারা আর তারার ম্লান আলো। এরকম মহাকাশে আপনি কোন সময় অনুভব করতে পারবেন না। দিনরাত্রি সব ঋতু সকাল বিকাল সব সমান, কোন পরিবর্তন নেই। সুতরাং সময়ের কথা বলা এখানে নিরর্থক। মহাকাশে সময় নেই। সেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবই এক রকম। মনে হবে চিরকাল এমনি চলবে, চলেও তাই। বাতাস নেই, তাই কোন শব্দও পাবেন না। নিজের কথা নিজেই শুনতে পাবেন না।

পৃথিবীতে আমরা ভবিষ্যতের কথা ভাবি, ভবিষ্যত জানতে চেষ্টা করি। আমরা দৌড়াই জ্যোতিষ, হয়ত গণকের কাছে। সত্যিই কি হাতের রেখায় ভবিষ্যত বলে কিছু আছে? বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটার দিকে নজর দেননি। ইদানীং কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছে। দেখা গেছে হাতের রেখাগুলির পরিবর্তন ধারা লক্ষ্য করে স্বাস্থ্য, রোগ সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব হয়। দেহের কোন অঙ্গের পরিবর্তনের সাথে সাথে হাতের রেখায়ও পরিবর্তন আসে, আর রোগটি আসে বহুদিন, বর্ষ পরে। সুতরাং হাতগনা ভবিষ্যত বলে।

মানুষ তার জিনের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে গুণাবলী পায় পূর্ব পুরুষের। জিনের ভেতর ডিএনএ, আর এন এতে কম্পিউটার কোডের মত এসব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে, তারপর বয়সের সাথে সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রস্ফুটিত হয়। কে সে স্রষ্টা এত নিপুনভাবে এসব তথ্য পাঠান বৈজ্ঞানিকভাবে? মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় দেড় হাজার কোটি

www.pathagar.com

কোষে কি লুকানো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস? সময়ের যাত্রাপথ? হয়তবা। সে আমরা জানিনা। শুধু অনুমান করতে পারি। দেড়হাজার কোটি (১৫ বিলিয়ন) কোষ নিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক যদি এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তাহলে ৪০০ বিলিয়ন তারা নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি জীবন্ত হবে না কেন? আর ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি নিয়ে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডত স্বয়ং 'বিশ্বমনন' বা স্রষ্টা হয়ে উঠতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

৮.৩ : বিশ্ব সৃষ্টির থিওরীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান

সময়ের নদীতে শুধু কিছু বুদবুদ ফোঁটা ফেনার মধ্যে শত কোটি বিশ্বকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, (Many and strange are the universes that drift like bubbles in the foam upon the River of time) কথাটি লিখেছিলেন চল্লিশ বছর আগে আর্থার ক্লার্ক তার 'ওয়াল অব ডার্কনেস' কল্পবিজ্ঞান গল্পে। চল্লিশ বছর তার কল্পনাকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বে বেশ পরিবর্তন এসেছে। "বিগব্যাঙে" তত্ত্বের শুরু দিয়ে বিজ্ঞানীরা শক্তিকে কণার সঙ্গে একীভূত করে সৃষ্টির মুহূর্তটিতেকও বুঝতে চেষ্টা চালিয়েছেন। তারা ফল পেয়েছেন এ রকম— **আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে অসংখ্য মহাবিশ্বের মাঝে মাত্র একটি এবং সবাই সময়ের নদীতে যাত্রী।**

এই বিশ্বেরই শেষ খুজে পাওয়া যায় না, তার বাইরেও আরও অসংখ্য বিশ্বের ধারণা আমাদের চিন্তায় ধরে না। ইতিপূর্বে আমরা বিশ্বসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়, তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। পদার্থবিদরা বিশ্বসৃষ্টির ০.০০০১ সেকেন্ড পর্যন্ত গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখেছেন। কিন্তু কেমন করে এ বিশ্ব সৃষ্টি হল ঐ পয়লা মুহূর্তটির কথা এখনও জানা যায়নি কোন মডেল দিয়েই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতি বা প্রসারণ শুরু হয় যখন সব বস্তু ঐ একটি বিন্দুতে ($১০^{১৪}$ গ্রাম/সেন্টিমিটার^{৩}) অবস্থিত ছিল। এই ফুলে ফেঁপে উঠা স্ফীতি বা প্রসারণ কাজটার মধ্যেই অনেক রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। কোয়ান্টাম তরঙ্গায়িত হয় এজন্য যে এই বিদ্যায় সঠিক বস্তু বলে কোন ধারণা নেই। হাইজেনবার্গের "অনিশ্চয়তা তত্ত্বে" বলা হয় একটা ইলেকট্রন কোথায় আছে বা কোথায় যাচ্ছে এই দুটা কাজের মধ্যে মাত্র একটার কথা জানতে পারবেন। দুটো প্রশ্নের জবাব একসাথে পাবেন না। এই অনিশ্চয়তা, অনির্দিষ্টতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি চিরসত্য। অবস্থান-গতি, শক্তি-সময় এ রকম জোড়ায় জোড়ায় জোড়ায় বস্তুর ধর্ম একত্রে প্রকাশ করা হয়।

'শক্তি-সময়' অনিশ্চয়তার কথাটা ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটু ছোট জায়গায় কল্পনা করুন এখানে কোন এনার্জি নেই, কোন ফোটন নেই (প্যাকেটের ভিতর এনার্জি থাকে) কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান চলছে 'নাথিং ইজ সারটেইন'। এই ছোট আয়তনের ভিতরও কিছু পরিমাণ এনার্জি থাকতে পারে অল্প কিছু সময়ের জন্য। যত বেশি এনার্জি, তত কম সময় এই হচ্ছে অনুপাত। ঐ ছোট জায়গায় এনার্জি আসছে এবং অদৃশ্য হচ্ছে, বাকী সবাই কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই। এখন যদি কোন ইলেকট্রন এবং পজিট্রন (নিউট্রন + প্রোটন = কোষের ভেতর) ঐ ছোট স্থানে হঠাৎ শূন্য থেকে ফট করে

www.pathagar.com

উদয় হয় এবং সামান্য কিছু সময়ের জন্য জীবন ধারণ করে তারপর পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে, এমন ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলির কোন অবমাননা ঘটবে না। এ ধরণের কণিকাকে বলা হয় Virtual pairs. (সুনীতি সম্পন্ন মানিক জোড়) তাদের অস্তিত্বই বলে দেয় কেমন করে আয়নিত কণার বৈদ্যুতিক চুম্বকিত বল কাজ করে থাকে। এই "নিষ্পাপ জোড়ের" অস্তিত্বকে বাস্তব বলেই ধরে নেয়া হয়েছে।

অল্প এনার্জির ব্যাপার হলে কণাগুলি বেশি বাচে। ১৯৭০ সনে এড টাইরন, নিউইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমাণ করেন যে, শূন্য এনার্জির ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তরঙ্গ চিরদিনের জন্য বেচে থাকতে পারবে। তখন অভিকর্ষ ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তির চিহ্ন হয় না-বোধক। যদি mc^2 হাঁ-বোধক হয় তখন অভিকর্ষ শক্তি না বোধক হয়। টাইরন প্রস্তাব করেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুরো অভিকর্ষ শক্তি এবং সম্পূর্ণ ভর-শক্তি পরস্পরের সমান হবে এবং বিপরীত চিহ্ন বহন করবে (+/-) ফলে বিশ্বের নেট এনার্জি হবে শূন্য। এ ক্ষেত্রে সবকিছুর সৃষ্টি হবে শূন্য থেকে কোয়ান্টামের তরঙ্গায়িতের বদৌলতে।

তবে এ থিয়োরীর দূর্বল দিকও ছিল। প্রোটনের চেয়েও ক্ষুদ্রতম কণায় এত বেশি চঞ্চলায়িত, অস্থির কোয়ান্টাম অসীম অভিকর্ষ বল নিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু এর ফল দাঁড়াবে অতি দ্রুত পতন। Virtual particees-এর মত জন্মমুহূর্তেই এমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয় প্রাপ্তি ঘটে যাবে। একমাত্র 'ফোলা অবস্থা' (inflation) এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। সেকেন্ডের সামান্য ভগ্নাংশে এটা জীবিত থাকে, কাজ শুরু করে দিয়ে বীজটাকে (মহাডিম্ব) ফুটিয়ে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ (Full) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দেয়। এখানে 'ফুল সাইজের' অর্থ হচ্ছে বাস্কেট বলের সমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার ভিতরে পুরো এনার্জি রয়েছে এবং যার বিগ ব্যাংগের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়াল, তাহলে কেন একটা বিশ্ব? বুদবুদ তৈরি হচ্ছে, ফুলছে, ফেটে যাচ্ছে, এরকম হলেত বহু বুদবুদই তৈরি হতে পারে ঐ মহাজাগতিক ফেনার মধ্যে। এমনতর প্রক্রিয়াও আজও তারাদের মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলিতে ঘটতে পারে। এভাবে বহু ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ধারে কাছেই জন্ম নিতে পারে। মহাশূন্যের খালি জায়গাগুলিতে এভাবে অসংখ্য বিশ্ব প্রতিদিনই জন্ম হয়ত নিচ্ছে, কিন্তু তা জানার আমাদের কোন উপায় নেই।

বিজ্ঞানী এলান গুথ কৃত্রিমভাবেই এমন বিশ্ব তৈরি করতে চান। দরকার সল্প সামান্য একটু জায়গার, তবে উচ্চ ঘনত্ব ও উচ্চ তাপমাত্রা ($১০^{২৪}$ কেলভিন) তৈরি করতে হবে। হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে কাজটা শুরু করা যেতে পারে। তবে পরমাণুর আয়তনের মধ্যে এই বোমার এনার্জিকে বন্দি করে রাখতে হবে। এ কাজটা বেশ কঠিন, তাই এখনও কেউই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজ হাতে তৈরি করে উঠতে পারেনি। একমাত্র ব্ল্যাক হোলের ভিতর (একক বিন্দুতে) এত এনার্জি জমা রাখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণ বিবরত নতুন বিশ্ব নয়! এটা পুরাতন বিশ্বেরই অংশ। বিজ্ঞানী গুথ ও তার সহকর্মীদের বিশ্বসৃষ্টির মডেলের সমীকরণে 'ফেঁপে উঠার' ব্যবস্থা আছে। তাদের গড়া নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমকোণের সহিত দেশকালের দিকে প্রসারিত হয়।

www.pathagar.com

এতদিন ধরে বিশ্বতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা মহাবিশ্বকে একটি ক্রমাগত ফেঁপে উঠা বেলুনের সাথে তুলনা করতে ভালবাসতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হচ্ছে বেলুনে বাতাস ঢুকার মত অবস্থায়। এমনি মহাবিশ্বে যেকোন কৃত্রিম বিশ্বের সৃষ্টি হবে ঐ বেলুনের গায়ে বুদবুদের ফোটার মত। এক সময় আমাদের বেলুনের গায় (দেশকাল) থেকে ঐ বুদবুদ আলগা হয়ে উড়ে যাবে মহাশূন্যে এবং নিজস্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে তুলবে বাড়তে বাড়তে নিজের দেশকালের সীমানায়। সবই গণিতের খাতায়, আর কল্পনায়। বাস্তবে যে কি হচ্ছে সেটার প্রমাণ হাতে নাই।

অতি ঘনত্ব এলাকাটি (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন একটি বিন্দুতে পরিণত হয়) কেঁপে ফুলে উঠবে খুব দ্রুত, তারপর 'বিরাট ধ্বস' নামবে এবং প্রসারিত হবে ধীরে ধীরে। তারা, গ্যালাক্সি, বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব ঘটবে, তারা আবার চিন্তা করবে দেশকাল নিয়ে। এভাবে কোয়ান্টাম বিশ্বতত্ত্ব অসংখ্য বিশ্বসৃষ্টির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয়। এই সব নতুন ব্রহ্মাণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত কোন জটিল বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তারপর হঠাৎ একদিন পুরাতন ব্রহ্মাণ্ডের গা থেকে ছিটকে গিয়ে "বহুমুখী ফেনার" সৃষ্টি করবে। এভাবে হয়ত আমাদের বিশ্বটাও ঐ ফেনার মধ্যে একটা বুদবুদ মাত্র। মজার ব্যাপার বুদবুদগুলি একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ এবং তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে স্ব স্ব ধর্মাবলী, নিয়ম-নীতি।

প্রিন্সটনের রিচার্ড গট এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন যার ফল হয়েছিল মারাত্মক—তিনি প্রস্তাব রাখেন এই যে, হয়ত আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি ফেঁপে উঠা অসীম সাগরের বুকেই শায়িত আছে (ভগবান নারায়ণ–মার্কেন্ডেয় দ্রষ্টব্য) এই মহাবিশ্ব ফুলে উঠছে, প্রসারিত হচ্ছে গাণিতিক হারে। অসংখ্য বুদবুদ ফুলে উঠছে। তার থিয়োরীতে এটা দেখানো সম্ভব হয়েছে যে আমাদের বিশ্বের পাশেই আরেকটা বিশ্ব প্রসারিত হতে পারে। পুরান বিশ্ব ঠাণ্ডা আর নতুন বিশ্ব হচ্ছে গরম। মহাকাশের কোন ছিদ্রপথ দিয়ে এ গরম বিশ্ব ঢুকতে পারবে আমাদের বিশ্বে। তাদের হিসেবে আরো দেখা যায় যে সব বুদবুদ একে অন্যের সঙ্গে মিলতে পারে ১০^{৫০০} বছরে ১ বার। বুদবুদগুলি বিভিন্ন ধরণেরও হতে পারে। ফুলে ফেঁপে উঠার পর বিশ্ব প্রকৃতির চারটি বলের (অভিকর্ষ, বৈদ্যুতিক চুম্বকীয়, সবল ও দূর্বল কেন্দ্রীয় বল) মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। অন্য কোন বিশ্বে প্রকৃতির ৪/৫/৬টিও বল থাকতে পারে এবং চর্তুমাত্রিক বিশ্বের পরিবর্তে ২-১১ মাত্রা থাকতে পারে। মহাশূন্যের ফুলে উঠা এবং প্রকৃতির অনিশ্চিয়তা এ দুটো কোয়ান্টাম নীতি সবধরণের বিশ্বের জন্যই চিরন্তন আইন—চিরসত্য/ অভিকর্ষ, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাওয়া—সব শুধু সময়ের একটি মাত্র দিক নির্দেশনার জন্য।

কেন পদার্থগুলির সূত্রগুলির এরকম? কেন মধ্যাকর্ষণ শক্তির ধ্রুবক সংখ্যা এরকম? এটা হয়ত কেউ (ঈশ্বর) লটারীর মত এমনি বেছে নিয়েছেন এবং আমাদের ভাগ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অন্য বিশ্বে হয়ত অভিকর্ষের এই ধ্রুবক সংখ্যা (Constant) অন্য ধরণের। তবে আমাদের জন্য ঐ নির্দিষ্ট করে দেয়া সংখ্যাটার কম বেশ হলে কিন্তু জীবনের স্পন্দন দেখা দিত না। সব অঙ্ক কষে মনে হয় কেউ যেন পরিকল্পনা করেই আমাদের বাচার, বিকশিত হবার সুবিধাদি দিয়ে আমাদের বিশ্বটাকে সৃষ্টি করেছে। এটাকে

www.pathagar.com

anthropic নীতি বলে। মানুষের জন্যই সব। সীমাহীন বিশ্বের অস্তিত্ব থাকলেই কেবল সব জিনিস সম্ভব। অসংখ্য বুদবুদ আছে বলেই প্রকৃতির বিভিন্ন শর্তাদি তাতে রয়েছে এবং অবশেষে 'সম্ভাব্যতার সূত্রের' (Theory of probability) জের হিসাবে মঞ্চে মানুষের আগমন সম্ভব হচ্ছে। নচেৎ জীবন সৃষ্টির মূলে যে দেড় ডজন অ্যামিনো এসিডের পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, ঐ বিক্রিয়াটাই হতে পারত $১০^{১৩৫}$ রকমে এবং এটা ঘটতে পারত কেবল বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বৎসরে। অথচ আমাদের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র ২০ বিলিয়ন বছরের মধ্যেই। হায়রে সময়! মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী সবাইর গতিসীমা হচ্ছে আলোর গতি, একে অতিক্রম করা যাবে না। মহাশূন্য নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকারে বাড়ছে। মহাশূন্য মহাকাল, মহাশক্তি ও বস্তু সবাই একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং তারা তাদের গতিপথ সামনে অব্যাহত রাখছে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

স্টিফেন হকিং ও মহাকাল

৯.১ : বিরাট বিস্ফোরণের সাথেই সময়ের জন্ম হয়েছিল

এক গবেষক বিজ্ঞানীর চার ছেলের মধ্যে সর্বজেষ্ঠ্য সন্তান স্টিফেন হকিং ইংল্যান্ডে ১৯৪২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সনে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাদের পরিবারটি ছিল পড়ুয়া পরিবার আর হকিং এর ছিল প্রথম শ্রেণীর মন। খুব বেশি খাটতেন না কিন্তু গাণিতিক সমস্যার সমাধানে ছিলেন ওস্তাদ। অক্সফোর্ড থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স স্নাতক হকিং কেমব্রিজে ভর্তি হন। আর এখানেই কালের করাল গ্রাসে পড়েন তিনি। তার চলা-ফেরার কষ্ট শুরু হল, কথা জড়িয়ে আসে, হাত পা নিজের ইচ্ছেমত নাড়তে পারেন না। ডাক্তাররা রায় দিলেন তার amyotrophic lateral Sclerosis হয়েছে। সোজা কথায় পঙ্গুত্ব বরণ করলেন হকিং। তার দেহ পেশীগুলি অকেজো হয়ে গেল, তিনি মনে করলেন ২৫ বছর পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন না। হতাশায় ভেঙে পড়লেন হকিং—লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন আর মদে ডুবে গেলেন।

১৯৬৫ সনে তিনি জেনি ওয়াইল্ড নামে এক ভাষাতত্ত্বের ছাত্রীকে বিয়ে করেন। এই বিয়েটি হকিংয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি রবার্ট (১৯৬৭), লুসি (১৯৭০), টিমোথী (১৯৭৯) নামের তিন সন্তানের জনক হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রচণ্ড উৎসাহে তার গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর তিনি যেসব ফলাফল প্রকাশ করেন, তাতে সারা জগত তাকে আইনস্টাইনের পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এত মৌলিক তার অবদান। ১৯৮৮ সনে তিনি 'A Brief History of Time' নামে একটি যুগান্তকরী বই লিখেন, যার মুখবন্ধ লিখেন কার্ল সাগান। কার্ল সাগানের 'কসমস' ও হকিংয়ের 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বইটি আজকে সারা দুনিয়ায় বেস্ট সেলার। 'কসমস' বইটি বিটিভি দু বছরে দু বার দেখিয়েছে আর রিপ্লের 'বিলেভ ইট অর নট' এ হকিংকে দেখানো হয়েছে (১৯৮৮) বন্যার আগে। হকিং তার বইয়ে আলোচনা করেছেন (১) বিশ্বতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, (২) আপেক্ষিকতাবাদের বুনিয়াদ (৩) প্রসারনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (৪) কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা (৫) কৃষ্ণবিবর (৬) সময়ের দিক নির্দেশিকা (৭) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম ও মৃত্যু। আমাদের বর্তমান পুস্তকে এসব বিষয় নিয়েই যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা হকিংয়ের আবিষ্কারগুলি আলোচনা করব।

www.pathagar.com

আমরা জানি যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে অভিকর্ষ বল হচ্ছে আসল কথা। অভিকর্ষ তারা-নক্ষত্র, গ্রহের এবং বিশ্বজগতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এতে শৃঙ্খলার রাজত্ব রয়েছে। নিয়মনীতিবদ্ধ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আচরণ সম্পর্কে আগে ভাগেই আঁচ করা যায়। অন্য দিকে কোয়ান্টাম বল বিদ্যা পরমাণুর অভ্যন্তর নিয়ে কাজ করে, এখানে বস্তু এলোপাথাড়ি আচরণ করে। আইনস্টাইন এটা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছিলেন **'ভগবান এই বিশ্বজগত নিয়ে জুয়া খেলেন না'**। এই দুই থিয়োরীর সমন্বয় সাধন করাই হল স্টিফেন হকিংয়ের স্বপ্ন সাধনা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি 'ধ্রুবকবিন্দু' থেকে অসীম ঘনত্ব নিয়ে (যেখানে দেশকাল এক হয়ে নিমজ্জিত ছিল, লুপ্ত ছিল) বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে যাতায়াত শুরু করে। হকিং ১৯৬৯ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞ রোজার পেনরোজের সঙ্গে মিলে এক থিয়োরীতে দেখান যে বিগ ব্যাঙের সাথে সাথেই সময়ের যাত্রাপথ শুরু হয়।

বড় বড় তারারা তাদের জ্বালানি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে বসে, তারপর এদের নিজস্ব অভিকর্ষের টানে দেহের ধ্বংস ঘটে। কিছু ঠিক অবস্থার জন্য তারাদের কেউ কেউ কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়ে যায়। ১৯৭১ সনে হকিংকে লেখেন যে শুধুমাত্র ঐ একটি উপায়েই কৃষ্ণ বিবর তৈরি হয় না; বিরাট বিস্ফোরণের মহাপ্লাবন শক্তির সময়ই অসংখ্য ছোট ছোট কৃষ্ণ বিবর তৈরি হতে পারে। হকিং অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, শুধু আমাদের গ্যালাক্সিতেই দশ লাখ কৃষ্ণবিবর থাকতে পারে। এসব ব্ল্যাক হোলগুলি প্রোটনের সমান আয়তন হবে, তবে তাদের ভর হবে এভারেস্টের সমান।

৯.২ : কৃষ্ণ-বিবর থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসতে পারে

১৯৭৩ সনে হকিং **কৃষ্ণবিবরে বস্তুর ধর্মাবলী** নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। হাত পা অবশ, তাই মনে মনেই অঙ্ক কষা শুরু করেন। তারজন্য সমস্যাগুলোকে গাণিতিক চিত্রে পরিবর্তিত করা হয়, একজন সহকারী ফলাফলগুলি লিখে রাখে। হকিং এমন একটি সমাধানে পৌঁছেন যে প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে তার ভুল হয়েছে কোথাও।

তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন এমন একটি তথ্য যা সবাইকে চমকে দিল। এতদিন জানা ছিল কৃষ্ণবিবর থেকে কোন বস্তু, আলো, সিগন্যাল বেরিয়ে আসতে পারে না, সবই হারিয়ে যায় বিবরের অভ্যন্তরে অথচ হকিং দেখালেন যে, না, কৃষ্ণ বিবর থেকে বস্তুকণিকার এক তীব্র ঝলক বা বিকিরিত রশ্মি (radiation) বেরিয়ে আসতে পারে। বড় বড় তারকা হতে উদ্ভূত কৃষ্ণ বিবরগুলি, অথবা গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিরাট কালো গর্তগুলির বিলুপ্তি ঘটতে (evaporation) বহু শত বিলিয়ন বর্ষ লেগে যাবে। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কয়েকবার জন্মের বয়স লাগবে। কিন্তু ছোট ছোট ব্ল্যাক হোলগুলি ১০ বিলিয়ন বছরের মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব হারাবে। ধ্বংসের মুহূর্তে এরা উচ্চ শক্তির গামারশ্মির ফোয়ারা বইয়ে শেষ হয়ে যাবে। ১৯৭৪ সনের মার্চে হকিং "Particle Creation by Black Holes" প্রসঙ্গে নেচার পত্রিকায় তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘোষণা করেন। সেই থেকে কৃষ্ণ বিবর থেকে বহির্গত রশ্মিকে 'হকিং রেডিয়েশান' নাম দেয়া হয়েছে। হকিং নিজে বলেন **'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ভগবান শুধু জুয়াই খেলেন না,**

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে তিনি এদেরকে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করেন যে ওদের আর দেখা যায় না।' হকিং বলেন, বস্তুকণিকাগুলি উপপরমাণু (subatomic) পর্যায়ে আমাদের দেখা সূত্রগুলি মানে না। তাদের অবস্থান এবং গতি দু'টোই অনিশ্চিত থাকে। সেকেন্ডের কোটি ভাগের ভগ্নাংশের মাঝেই তার জীবন বিস্তার। শূন্যস্থানে তাদেরকেও সৃষ্টি করা যাবে এক শর্তে, জন্মাবার সাথে সাথেই এসব নিষ্পাপ কণিকারা (Virtual particles—আগেই আলোচনা করা হয়েছে) পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম এক জোড়া কণিকা হঠাৎ কৃষ্ণ বিবরের 'ঘটনা দিগন্তের' সীমানায় এসে পড়লে একটি কণিকা কালো গর্তের টানে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে আর অন্যটি মহাশূন্যে ছুটে যাবে ঐ ধাক্কার ঠেলায়।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ৯০-৯৯ শতাংশ বস্তুই অন্ধকারে রয়ে গেছে। বাকী ১-১০ শতাংশই হচ্ছে দৃশ্যমান গ্রহ, তারা, গ্যালাক্সির জগত। ১৯৮৬ সনে জ্যোর্তিবিদরা জানান যে ৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ৪০০ গ্যালাক্সির একটি স্থানীয় জগত একদিকে কোন এক বৃহৎ বস্তুর আকর্ষনে ছুটে চলেছে ৩৫০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে গতিতে দক্ষিণ আকাশে। কি সে মহাশক্তি এতগুলি গ্যালাক্সিকে টেনে নিচ্ছে?

কেউ কেউ বলেন বিরাট বিস্ফোরণের সময় থেকেই ঐ বিস্ফোরণের ধাক্কায় মহাশূন্য ফেটে গেছে সুতার মত তন্তুতে বিভক্ত হয়ে। এই সুতা দিয়েই এক গ্যালাক্সির সঙ্গে অন্য গ্যালাক্সির যোগসূত্র রয়েছে এ থিয়োরীকে **'কসমিক স্ট্রিংগস'** (Cosmic Strings) বলা হয়ে থাকে। সুতাটা এমন ঘন যে ১ ইঞ্চির ওজন হবে আল্পস পর্বতমালার সমান এবং পরমাণুর কোষকেন্দ্রের চাইতে ১০ কোয়াড্রিলিয়ন গুণ সুক্ষ্ম হবে। কয়েকশত বছরের পুরাতন আর্ট দেখলে তার পৃষ্ঠদেশে ক্যানভাসের উপর যে অসংখ্য দাগ দেখা যায় এটার মত আর কি। এই মহাজাগতিক তন্তুগুলি গ্যালাক্সির বীজ বহন করতে পারে। কিছু তন্তুর সমবায়ে গঠিত কুণ্ডলী তাদের অভিকর্ষের টানে চতুস্পার্শ্ব থেকে যথেষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে একটি গ্যালাক্সি গঠন করতে পারে। অথবা সুতাগুলি নিজেই পদার্থকে গ্যালাক্সিতে উড়িয়ে আনতে পারে। যদি সুতারা বিকিরণ করে তাহলে এর ফলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হবে এবং ফেনা থেকে বুদবুদ সৃষ্টি করে ফু দিতে শুরু করবে। বুদবুদ বাড়তে বাড়তে চতুস্পার্শ্বের পদার্থ টেনে নিয়েও গ্যালাক্সি গঠন করতে পারবে। সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা Cosmic Strings খুজে বেড়াচ্ছেন এখন।

৯.৩ : মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংস : সময়ের দিক নির্দেশিকা (হকিং মতবাদ)

পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলি অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে পারেনা। কিন্তু তাপগতিবিদ্যা, মহাশূন্যবিদ্যা বা সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সাধারণ জ্ঞানের বলে আমরা বুঝতে পারি যে সময় শুধু একদিকেই তার দিক নির্দেশনা করে—ধ্বংশের দিকে।

"অতীত হচ্ছে একটি বিদেশের মত যেখানে সব জিনিসই আমাদেরগুলো থেকে আলাদা এবং অনন্য" এমনটি লিখেছিলেন এল. পি. হার্টলি তার 'The Go-between' বইয়ে। কিন্তু কথাটা হল, কেন অতীত ভবিষ্যত থেকে এতো পৃথক? কেনইবা আমরা এতো স্মৃতি পীড়িত বেদনা কাতর; অথচ ভবিষ্যতকে শুধু অনুভব করতে পারি খুবই

www.pathagar.com

ম্লানভাবে? সময়ের প্রবাহমানতার উপলব্ধি ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতির মধ্যে কোন যোগসূত্র সত্যিই রয়েছে নাকি? যদি তাই হয়, তাহলে যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ থেকে যাবে এবং নক্ষত্রগুলো সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে তখন কি সময়ের গতি বদলে যাবে অর্থাৎ এখন যা হচ্ছে তা থেকে উল্টো?

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, যা কিছু অনাদিকাল থেকে ঘটছে তা পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে। এই নিয়মগুলো আমাদেরকে এক সময়ের গতি থেকে অন্যটির গতি বা ধারা ফারাক/আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে না এমনকি উল্টো দিক থেকে মহাশূন্যেও না। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে C, P এবং T এই তিনটির সম্মিলিত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েও সূত্রগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটে না। এখানে C-তে বোঝানো হচ্ছে বিপরীত কণার জন্য পরিবর্তিত কণা, P-তে আদর্শ প্রতিবিম্বে পরিবর্তিত হওয়া অর্থাৎ ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে পারস্পরিক বিনিময় হওয়া এবং T-তে বোঝানো হয়েছে সকল বস্তুকণার গতিকে উল্টো খাতে পরিচালিত করা অর্থাৎ গতিকে পেছনের দিকে ধাবিত করানো।

C এবং P-এর সম্মিলিত ক্রিয়ায় পদার্থ বিদ্যার সূত্রগুলির কোন পরিবর্তন ঘটে না। অন্য কোন গ্রহের লোকদের জীবনও হবে আমাদেরি মত যদিও তারা হয়ত আমাদের প্রতিবিম্বের মত (আমাদের ডান ওদের জন্য বাম দিক) এবং তাদের দেহ প্রতি বস্তু (antimatter) দ্বারা গঠিত। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো সকল ক্ষেত্রেই CPT-এর সম্মিলনে অপরিবর্তিতই থাকে। কাজেই ওগুলো যে শুধু T-এর ক্রিয়াতেও অপরিবর্তিত থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তবুও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সময়ের সম্মুখ দিক ও পশ্চাৎদিকে প্রবাহের মধ্যে রয়েছে বিশাল পার্থক্য। ধরা যাক, একটি পানিভর্তি গ্লাস টেবিল থেকে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যদি এ ঘটনার ছবি তুলা যায়, তাহলে সহজেই বলে দেয়া সম্ভব যে টেবিল থেকে গ্লাস পড়া এবং ভেঙে যাওয়া এটা সময়ের আলোকে সামনের দিকে না পেছনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? যদি পেছনের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে দেখা যাবে গ্লাসের ভাঙ্গা টুকরোগুলো হঠাৎ জোড়া লেগে আবার টেবিলের উপর ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, ফিল্মে ধারণকৃত ঘটনাগুলো পেছনের দিকে প্রবাহের জন্যই এমনটি দেখলাম যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনদিনও দেখি না।

তাপ গতিবিদ্যার (থার্মোডাইনামিক্স) দ্বিতীয় সূত্রের বাঁধার কারণেই আমরা ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরাগুলো জোড়া লেগে আবার টেবিলের উপর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে দেখি না। দ্বিতীয় সূত্রে বলা আছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজ কর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা এন্ট্রপি বেড়ে যায়। অন্য কথায় সডের সূত্রানুসারে, **"সবকিছুই খারাপ থেকে খারাপতর দিকে গড়ায়"**। টেবিলের উপর পানিপূর্ণ গ্লাস হচ্ছে বস্তুর পূর্ণ সুশৃঙ্খল অবস্থা আর মেঝেতে ভাঙা কাপের অবস্থা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা দশার প্রতীক।

সময়ের সাথে সাথে বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধি হচ্ছে **'সময়ের দিক নির্দেশনার'** একটি সুন্দর উদাহরণ। কোন কিছু তখন সময়কে একটি দিক দেখিয়ে থাকে যা অতীত থেকে ভবিষ্যতকে আলাদা করতে পারে। অতীতে টেবিলের উপর রক্ষিত ভাল গ্লাসটি ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

ভাঙা কাপ হতে পারে, এমনটিই শুধু ঘটতে পারে তার উল্টাটি নয় কোনমতেই। সময়ের কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশিকা রয়েছে **প্রথমত** সময়ের তাপগতি নির্দেশিকা অর্থাৎ দিনে দিনে বস্তু জগতের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা। **দ্বিতীয়ত** সময়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক নির্দেশিকা। এটা এমন দিক যার মধ্যদিয়ে আমরা কেবল সময়ের প্রবাহমানতাকে অনুভব করি শুধু অর্থাৎ অতীতকেই শুধু স্মরণ করি কিন্তু ভবিষ্যত দেখি না। **তৃতীয়ত** সময়ের মহাজাগতিক নির্দেশিকা। এটা সময়ের সেই অভিমুখিতা যেদিকে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত না হয়ে বরঞ্চ প্রসারিত হচ্ছে।

তাপগতি নির্দেশিকা মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশিকাকেই নির্ধারণ করে এবং এ দু'টি নির্দেশিকা একই বিন্দুতে প্রবাহমান। যদি আমরা মহাবিশ্বের অবস্থা কল্পনা করি, তাহলে দেখবো যে, এই দু'টি নির্দেশিকাই মহাজাগতিক সময় নির্দেশিকার সঙ্গে সম্পর্কিত, যদিও তারা একই বিন্দুতে প্রবাহিত হচ্ছে না। হয়তবা তারা একই বিন্দু দিয়ে একটি দিকে প্রবাহিত হয় যার ফলে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে এবং তারা এমন প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছে : মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে যেখানে, সেখানে সময়ের গতির সঙ্গে পদার্থ জগতে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাচ্ছে কেন?

বিশ্বজগতে সুশৃঙ্খল অবস্থার চাইতে বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিমাণই বেশি এমতাবস্থার উপর ভিত্তি করে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি গড়ে উঠেছে। যেমন ধরা যাক, একটা বাক্সে কতগুলো কাগজের টুকরো ছবি এলোমেলোভাবে (Jigsaw) দেয়া আছে এবং তা সমাধানের কেবল একটি মাত্র ব্যবস্থা বর্তমান যাতে টুকরাগুলো একটি পুরো চিত্র তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে ঐ ধাঁধার কাগজের টুকরাগুলোকে এমনভাবে এলোমেলোভাবে রাখা হয়েছে যে তারা একটি পুরো চিত্র তৈরি করতে পারবে না।

ধরে নেই, স্বল্পসংখ্যক সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে একটা পদ্ধতি বের করা হলো। এখন দেখা যাবে সময় যতোই প্রবাহিত হচ্ছে ঐ পদ্ধতিটি পদার্থবিদ্যার সূত্রানুসারে ততই বিকশিত হচ্ছে এবং এর অবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। পরবর্তী কোন এক সময়ে দেখা যাবে যে, সেগুলো আবার বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরে গেছে (অন্তত: এরকম সম্ভাবনা প্রচুর) যেহেতু চারিদিকে বস্তুর এত অসংখ্য বিশৃঙ্খল অবস্থা রয়েছে যে এটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলাও বেড়ে যেতে থাকে, যদি পদ্ধতিসমূহ একটি পূর্ণ বিকশিত প্রাথমিক শর্ত (if the system obeys an initial condition of high order) পালন করে থাকে।

ধরা যাক, এলোমেলো টুকরাগুলোকে বাক্সে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে তারা একটি ছবি গঠন করেছে। যদি বাক্সটিকে নাড়া দেয়া যায়, টুকরাগুলি অন্যরূপ ধারণ করবে, হয়ত আর কোন ছবিই গঠন করবে না, কেননা বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিমাণই বেশি। প্রথমবার নাড়ার সময় হয়তবা ছবিটির কোন এক টুকরা অক্ষতই ছিল বাকী অংশটা ভেঙে গেছিল। দ্বিতীয়বার নাড়া খেলে ঐ অক্ষত অংশটা ভেঙে যাবে। এমনি যতবার নাড়া দেয়া হবে ততই ছবিটার শৃঙ্খল অবস্থা কমে গিয়ে পুরো বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলে আসবে। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে বিশৃঙ্খলা বাড়তেই থাকবে। এক্ষেত্রেও প্রাথমিক শর্তটা হচ্ছে এই যে বস্তুটির শৃঙ্খল অবস্থা প্রথম থেকেই বিরাট করতে হবে।

www.pathagar.com

আর যদি উল্টোই হয়ে থাকে? ধরা যাক, ঈশ্বর ঠিক করলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দিনকে দিন শৃঙ্খল অবস্থায় ফিরে আসবে বিশৃঙ্খলা থেকে। এ রকম বিশ্বে ভাঙা কাচ আস্তে আস্তে জোড়া লেগে যাবে, বুড়ো মানুষ জোয়ান হয়ে, শিশু মাতৃগর্ভে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এ রকম জগতের অধিবাসীদের সময়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক নির্দেশিকা থাকবে পেছনমুখী। তারা স্মরণ করবে পরের ঘটনাটিকে আগেরটি নয়।

সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল একটা সুদূর প্রসারিত পরিকল্পনা থেকে। আমরা শুধু এই নিয়মগুলিকে আবিষ্কারই করতে পারি, এর বেশি জানা সম্ভব হয় না। একটা প্রশ্নের জবাব পেলে আরও দশটা কেন এসে হাজির হয়। তাই এটা আশা করা যায় সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে কোন প্রোগ্রামে বেধে দেয়া হয়েছিল কোন মহাশক্তি (ঈশ্বর) কর্তৃক।

৯.৪ : মহাবিশ্বের শুরু

মহাবিশ্বের গঠন প্রণালী ও সময়ের ব্যাপারটিকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে। আপেক্ষিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, মহাশূন্যের বিস্তৃত এলাকার ত্রিমাত্রা এবং সময়ের একমাত্রা উভয়ই একত্রিত হয়ে চর্তুমাত্রিক মহাবিশ্বের আকার ধারণ করেছে। এই চর্তুমাত্রিক বিশ্ব সবক্ষেত্রেই সমান বা মসৃণ নয়, বরং বস্তুপুঞ্জের সমন্বয়ে এবং শক্তির প্রভাবে বেঁকে গিয়ে দুমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় বিরাজ করছে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব এক অসাধারণত্বের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে—এক নিবীড় অসীমত্ব নিয়ে যেখানে অনন্ত শূন্যতা এবং সময় রয়েছে কেবল ক্ষুদ্র ব্যাসার্ধের অসীমত্বে। এই অবস্থায় পদার্থবিদ্যার পরিচিত সব সূত্রসমূহ অকেজো হয়ে যাবে এবং কেউই সেগুলো ব্যবহার করে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না। আবারও বলতে হয় যে, মহাবিশ্বের শুরুটি ছিল একটা মসৃন এবং সুশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যদিয়ে। এটাই কিন্তু সময় তাপগতি এবং মহাজাগতিক নির্দেশিকার পথ দেখিয়েছিলেন—যা আজ আমরা বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছি।

আবার এটাও সমানভাবে প্রযোজ্য যে ওগুলো শুরুতেই পিণ্ডাকারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্ব ইতিমধ্যেই পুরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে যা সময়ের সঙ্গে আর বৃদ্ধি পাবার প্রয়োজন নেই। এখন হয় স্থির অবস্থায় থাকবে যেখানে সময়ের তাপগতিবিদ্যার কোন নির্দেশিকা থাকবে না অথবা বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়া হ্রাস পেতে শুরু করবে যেখানে তাপগতি নির্দেশিকা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মহাজাগতিক নির্দেশিকার ঠিক উল্টো খাতে প্রবাহিত হবে। কিন্তু এর কোনটারই সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলছে না। এখানে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অচল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুর সময়টি শুধুমাত্র কোয়ান্টাম অভিকর্ষ তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো সম্ভবপর। দুঃখের বিষয় এটার সঠিক অবয়ব সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই! এটা হতে পারে অতি অভিকর্ষ (Supergravity) বা অতিসূত্র (Superstrings)-এর কোন একটি গঠন। আর এমনও হতে পারে যে আমরা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি সঠিক গঠনটি কোনটি?

www.pathagar.com

বস্তু সব সময় সংক্ষিপ্ত সরল পথ দিয়ে দেশকালের ভিতর যায়। কিন্তু স্বয়ং দেশকাল যেহেতু বক্র, তাই তাদের গমন পথও মনে হয় অভিকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে বেকে যায়। রিচার্ড ফেইনম্যান তার 'ইতিহাস সংক্ষেপ' (Sum over Histories) তত্ত্বে বলেন যে, "দেশকালের ভেতরে একটা কণা যে কোন পথ (বা ইতিহাস) বেছে নিতে পারে তার চলাচলের জন্য। আর প্রত্যেক ইতিহাসের সম্ভাবনাকেই গনা সম্ভব। এর জন্য দরকার দেশকালকে 'ইউক্লীডীয়' ধরে নেয়া, সোজা কথায় মহাশূন্যে সময় হচ্ছে অন্য একটি দিক। সব কণাগুলির একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যাবার সম্ভাব্য পথগুলি বের করতে হবে—তারপর এই ফলকে একস্ট্রাপোলেশন (রীতিবদ্ধ উপায়ে অনুরূপভাবে বর্ধিত করণ) করে আসল দেশকালে ফেরত নিতে হবে যেখানে সময় ও দেশের দিক চিহ্ন বিভিন্ন। এতে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিখ্যাত সময় তাপগতি নির্দেশিকা আছে কিনা যা মহাজাগতিক নির্দেশিকার অনুরূপ হবে তা জানা যাবে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছে যাই।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের সময়ের ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য আচরণ লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ কোনো ঘটনা অতীত এবং ভবিষ্যতে সীমাহীন সময় পর্যন্ত ঘটে যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ একটা সসীম সময়ের মধ্যে ঐ ঘটনা শুরু বা শেষ হওয়া এবং

তৃতীয়তঃ সময়ের ব্যবধানে তা থেমে থেকে ঘটতে থাকা।

এক্ষেত্রে দেশকাল পৃথিবীর অক্ষাংশের সময়েরই অনুরূপ। অক্ষাংশের বৃত্তটি উত্তর গোলার্ধের একটি স্বতন্ত্র বিন্দু থেকে শুরু হয় এব যতোই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায় বৃত্তটি ততোই বড় হতে থাকে। ঠিক এভাবেই মহাবিশ্ব একটি স্বতন্ত্র বিন্দু থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্ব বিষুব রেখা বরাবর সর্বোচ্চ আকার পেয়েছে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে পুনরায় সংকুচিত হতে শুরু করেছে। যদিও উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষাংশের শুরু এবং শেষ হয়েছে তথাপি পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল একটা প্রচলিত বিন্দু হিসাবেই বিবেচিত। আবার উত্তর গোলার্ধে কোন ভ্রান্ত বা অসাধারনত্ব কিছুই নেই।

একইভাবে সময়ের শুরু বা শেষ ও মহাশূন্যে মহাকালের প্রচলিত মুহূর্ত বা অবস্থা মাত্র, সেখানে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহ বাঁধা রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্ব অসীম, এর কোনো সীমারেখা নেই। যদি তাদের একথা সত্যি হয়ে থাকে তবে মহাবিশ্বের শুরু কিভাবে হয়েছে তা পদার্থবিদ্যার সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এক দুরুহ ব্যাপার। কারণ, আজ পর্যন্ত এটা জানা নেই যে, সুনির্দিষ্টভাবে কোন সূত্রটি মহাকর্ষের প্রয়োজনীয়তাকে (nececssity) পরিচালনা করছে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞান ও মনোদর্শনে সময়ের ধারণা

১০.১ : দেহ ছন্দ

দেহের অভ্যন্তরে একটি ছন্দময় গতির সময় ঘড়ি দেহের সব কাজকর্ম পরিচালনা করে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরের ভিতরেই যেন আছে সেই ঘড়ি যা চলে বিভিন্ন গতিতে। এটা ব্যক্তিতে বিভিন্ন রকমের। এটাকে ক্রনোবায়োলজী তত্ত্ব বলে। দিনের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোষ সংখ্যা হয় খুব বেশি, অথচ ১২ ঘন্টা পর তা আবার নেমে আসে। হৃদঘাত হার, বিপাক হার, দেহ তাপেও তারতম্য দেখা যায়। এ থেকে বিজ্ঞানীরা (হার্ভাডের হালবার্গ) বুঝলেন যে আমাদের দেহতন্ত্র স্থির অটল অবিচল একরকম হারে কাজ করে না, বরং ২৪ ঘন্টা ব্যাপী একটি চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। কখন আমরা উচ্চে উঠছি, কখনও নামছি। দিনের সামান্য কিছু সময় আমরা কাজ করার সর্বোচ্চ ফর্মে থাকি। এটাকে দৈনন্দিন ছন্দ (Circadian rhythms) বলে। দৈনন্দিন দৈহিক ছন্দের এই সূত্রটি নভোচারীদের কাজকর্মের রুটিন তৈরিতে খুব কাজে লাগছে। কখন খেতে হবে অথচ এতে ওজনও শরীর থেকে ঝরবে, দিনের কোন সময় শক্ত কাজটি হাতে নিতে হবে, সোজাকথায় কম পরিশ্রমে সবচেয়ে বেশি ফল কখন পেতে পারেন এটাই জানা যায় দৈহিক ছন্দ থেকে।

একটি পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টায় একদিন একরাত এমন বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে কিছু লোককে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ১৫ দিন পরে দেখা গেল অনেকেই ২৪ ঘন্টায় দিন হয় এ হিসেবটা ভুলে গেছেন। আবার অনেকে সময়ের বাঁধন পেরিয়ে বুনো আবেগে চলতে থাকেন। একটি ইলাস্টিক বন্ধনীর মত সময়কে প্রসারিত করতে থাকেন। পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে যারা নিশিজাগা লোক এদের দেহ তাপ সকালে ধীরে ধীরে ওঠে এবং বিকেলে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়। আর যারা ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন তাদের দেহে সকালবেলা থেকেই তাপ বাড়তে থাকে, এরা রাত জাগাদের তুলনায় অনেক বেশি অন্তর্মুখী হয়ে থাকেন।

দেহ ছন্দ যে মুড, মন-মেজাজকে প্রভাবিত করে, তা সবাই স্বীকার করেন। প্রতি ৯০ মিনিটে মানুষ দিবা স্বপ্নের ছন্দে পড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য নারীদের মেজাজের চড়াই-উৎরাই এর সঙ্গে তাদের মাসিক ঋতুচক্র এবং সে সঙ্গে হরমোন মাত্রার তারতম্যের সম্বন্ধ আছে বলে বলেন। এমনও হতে পারে পুরুষের হরমোনের মাত্রাও তেমনি মাসিকচক্রে আবর্তিত হয়। সুতরাং দৈহিক এই ছন্দটি নিয়তই আমাদের হরমোন, মুড, ঘুম, জাগরণের ছন্দময় তারতম্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

www.pathagar.com

দৈহিক ছন্দ টলমল হলে মানসিক ভারসাম্যেও বিচ্যুতি ঘটতে পারে। হতে পারে মানসিক অসুস্থতা। সুতরাং প্রচণ্ড বিষন্নতা হলে সময়ের বাঁধাধরা নিয়ম আর থাকে না, নিদ্রার ছন্দও ভেঙে যায় এবং মানসিক চাপজনিত একটি হরমোন এড্রিনালিনও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় নিঃসৃত হয়। চিকিৎসায় ভালো হলে এই ছন্দগুলো সুস্থিত হয়। মানুষ প্রকৃতিকে যত জয় করছে ততই প্রকৃতির ছন্দকে ধ্বংস করছে ফলে নিজেই সে মানসিক অসুস্থতায় ভোগছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও দৈহিক ছন্দের সমস্যাকে প্রভাবিত করে। কার্যকরভাবে যদি ডায়েটিং করতে চান তাহলে সকালের উপবাস ভাঙা নাস্তা হতে হবে দিনের সবচেয়ে বড়ো খাবার। ভোজন করতে হবে সকালে। সন্ধ্যাবেলা থেকে সকালেই ক্যালোরি পুড়ে বেশি। যারা ভোরের নাস্তায় ভোজন সারেন তাদের ওজন কমে। বিকেলে গুরু ভোজন দেহে চর্বি বাড়ায়। এদিকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সকাল ৭-৮ টায় ভাল কাজ দেয়। সন্ধ্যা ৬টা এবং রাত ১১ টায় এদের এদের কর্মক্ষমতা খুবই কম। ক্যাফিনযুক্ত পানীয় বিকেল তিনটের দিকে খুব কাজ দেয়।

নিজের দেহের জৈব ছন্দকে চিনতে হলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘন্টা পর দেহের তাপমাত্রা নিন এবং এরপর সারাদিন চারঘন্টা পর পর দেহতাপ রেকর্ড করতে থাকুন। এমনভাবে নিতে হবে যাতে শেষ রেকর্ডিংটা শোবার সময়ের কাছাকাছি হয়। দিনের শেষে পাঁচবার উত্তাপ রেকর্ড করা হবে। এরপর প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম তাপমাত্রা রেকর্ড যোগ করুন এবং সমষ্টিসংখ্যাও রেকর্ড করুন। এরপর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রিডিংটি যোগ করুন এবং সমষ্টি এই সংখ্যা প্রথমোক্ত মোট সমষ্টি থেকে বাদ দিন। এই সংখ্যাটি হবে মধ্যরাত্রে আপনার দেহ তাপের মন। এই ছুটি রিডিং গ্রাফ কাগজে প্লট করুন। দেখা যাবে দেহ তাপ রাত ৩টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে উঠতে থাকে এবং সকালের শেষ ভাগে বা বিকেলের সূচনালগ্নে শীর্ষদেশে পৌঁছায়। সন্ধ্যার দিকে তাপমান কমতে শুরু করে রাত দু'টায় সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়। দেহতাপ যখন সর্বোচ্চ মানে থাকে তখন সবচেয়ে ভারী কাজটি হাতে নেয়া উচিৎ। দেহতাপ সর্বনিম্নবিন্দুতে যখন আসবে তখনই ঘুমাতে যাওয়া উচিত। এটা রাত ১১-২ টার মধ্যে। প্রতিরাতে একই সময়ে শুতে যান এবং প্রতি সকালে একই সময়ে নিদ্রা থেকে উঠুন। এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবেন সকাল ৮ টা অথবা বিকেল ৮ টায়, কেননা এসময়ে ব্যথা সহ্য করবার ক্ষমতা বেশি থাকে। এভাবে দেহ ছন্দ জেনে কাজ করলে সুফল আসে বেশি। এজন্য একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি জন্ম নিয়েছে—ক্রোনোথেরাপি। ক্যান্সার চিকিৎসাতে এটার প্রয়োগ সুফল এনছে। কিছু কিছু ক্যান্সারের ছন্দ দেহের ছন্দ থেকে পৃথক। ফলে সঠিক সময়ে আঘাত করে একে দমন করা যাবে। ডিএনএ সংশ্লেষণ যখন নিম্নতম পর্যায়ে থাকে তখনই ঔষধ বা বিকিরণ চিকিৎসা দেয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ—এতে সুস্থকোষের ক্ষতি হবে সামান্য।

সময় আছে আমাদের হৃদয়ে, আমাদের হাতে এবং প্রতিটি কোষে। বিজ্ঞানীরা এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘড়ির সন্ধানে আছেন। আরও সন্ধানে আছেন সেই বড় ঘড়ির যা দেহতন্ত্রকে সমন্বিত রেখেছে। যদি সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে সে ঘড়িতে দম দিতেও পারব।

www.pathagar.com

ক্রোনোপ্যাথলজিস্টরা দেখেছেন হাঁপানী রোগীরা ভোর ৩টায় বেশি ভোগে, কারণ রাত্রি ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ফুসফুসের থলি সঙ্কুচিত থাকে। যারা উৎকণ্ঠায় ভোগে তাদের ঘুম ভেঙে যায় সকাল ৪টায় কেননা ঘুমের শেষ পর্যায়টা এ সময় অন্য স্তরে প্রবেশ করে। মস্তিষ্ক রাত্র ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জেট বিমানে করে যখন ৫টা সময় সীমা অতিক্রম করে কোন যাত্রী তখন তার দেহছন্দে ঘটে বিশৃঙ্খলা—ফলে অসুস্থবোধ করে কে। অভ্যন্তরীণ ঘড়ি ঠিক ২ দিন থেকে ৭ দিন লেগে যায়।

রুশ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন প্রতি ৪-৬ ঘন্টা ধরে একটি চক্র পরিবর্তন হয় দেহের ভিতরে। সকাল ৫টায়, ১১টায়, বিকেল ৪টায়, ৮টায়, রাত্রি ১২টায় দেহ-ছন্দে উর্ধ্বগতি তারা লক্ষ্য করেছেন। আর রাত্রি ২টা, সকাল ৯টা, দুপুর ২টা, বিকেল ৬টা ও রাত্রি ১১টায় নিম্নগুতি দেখা গেছে। এ সময়ে কাজে ঢিলা পড়ে, তাই একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত। আমাদের দেহের জৈব ছন্দ চায় আমরা যাতে সকাল ৪টার দিকে ঘুম থেকে জাগি। দুর্ঘটনা ঘটে দেহ-ছন্দের নিম্নগতির সময়। মানুষের জন্ম হয় উর্ধ্বগতির সময়, মৃত্যু ঘটে প্রায়শই নিম্নগতির সময়। এ সময়েই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় বেশি লোকে। দিনের ১টা পর্যন্ত খুব বেশি কাজ করা যায়। তারপর কাজের গতি কমে যায়। এদিকে খেয়াল করেই কাজের সময় ঠিক করে নিতে হবে।

১০.২ : জীবন ছন্দ

আমরা প্রত্যেকেই খেয়াল করে থাকি যে সবদিন আমাদের সমান যায় না। কোনদিন ভাল-উদ্দাম আর আনন্দ মুখরিত, বুদ্ধি দ্রুত কাজ করে, শরীরে প্রচুর বর পাওয়া যায়, মন থাকে উৎফুল্ল, সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আবার কোনদিন খারাপ যায়, বিপদে পরা, ম্যাজ ম্যাজ ভাব দেহে, মস্তিষ্ক কাজ করতে চায় না, অস্থিরতা, কোন কিছু ভাল লাগে না। মেজাজ থাকে তিরিক্ষি, কাজ হয়ে যায় এলোমেলো, সবকিছুই যেন বেসুরো মনে হয়। গবেষকরা বলছেন যে, এই ভাল লাগা আর খারাপ লাগার নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের জীবন ছন্দ (বায়োরিদম)। আমাদের প্রাণশক্তির উত্থান-পতন ও জোয়ার-ভাটার নিয়ামক হচ্ছে জীবন-ছন্দ। আমাদের দেহে তিনটি প্রধান জৈবিক ছন্দ রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে ২৩ দিনের দৈহিক চক্র। এই চক্র প্রভাবিত করে দৈহিক শক্তি, শ্রম, ক্ষমতা, অধ্যবসায়, প্রতিরোধ, বিশ্বাস ও সাহস।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ২৮ দিনের ভাবাবেগ চক্র। এই চক্র প্রভাবিত করে আবেগ, অনুভূতি, স্নায়ু, ইনটুইশন, মেজাজ আনন্দ ও সৃজনশীলতা।

তৃতীয়টি হচ্ছে ৩৩ দিনের বুদ্ধি বৃত্তিক ছন্দ। এই চক্র প্রভাবিত করে মানসিক সতর্কতা, স্মরণশক্তি বুদ্ধিযুক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রতিক্রিয়া ও আশা আকাঙ্খা।

প্রতিটি মানুষের জন্ম মুহূর্ত থেকে এই তিনটি চক্রের সূচনা। আর প্রতি ২৩, ২৮ ও ৩৩ দিন পর পর পুনরাবৃত্তি ঘটে এই চক্রের। গ্রাফ আঁকলে দেখা যাবে তিনটি ঢেউয়ের ক্রমাগত উঠানামা।

জীবন ছন্দ চক্রের ঢেউ যখন মধ্য রেখার ওপরে থাকে তখন সময় আমাদের অনুকূলে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থাকে তখন। প্রথম ১১ দিন (দৈহিক চক্রের) এই অনুকূল

www.pathagar.com

সময়ে প্রাণ প্রাচুর্য থাকবে আপনার, কাজ করার শক্তি ও দৃঢ়তা পাবেন। ভাবাবেগ চক্রের ১ম ১৪ দিনের অনুকূল সময়ে আপনার মনে থাকবে আনন্দ, মেজাজ ভাল থাকবে। আর বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রের প্রথম ১৬$\frac{১}{২}$ দিনের অনুকূল সময়ে দ্রুত চিন্তা করতে সক্ষম হবেন আপনি। যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সমাধানও হবে সহজ। সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তাড়াতাড়ি। আর জীবন ছন্দ চক্রের ঢেউ যখন মধ্য রেখার নিচে থাকে (২য় অর্ধাংশ ১১, ১৪, ১৬$\frac{১}{২}$ দিন) তখন সময় আপনার প্রতিকূলে। দৈহিক চক্রের এই প্রতিকূল সময়ে আপনি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, উদ্দামের অভাব হবে, শরীরটাও ভাল মনে হবে না। ভাবাবেগ চক্রের প্রতিকূল সময়ে মন খারাপ লাগবে, মেজাজ বিগড়ে যাবে। কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কঠিন হবে, স্মরণ শক্তি দুর্বল হবে, আপনার বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতাও যাবে কমে।

এই তিনটি চক্রের যে কোন ঢেউয়ের গ্রাফের মধ্য রেখা অতিক্রমের দিনটি হচ্ছে 'সঙ্কটময় দিন'। এটি হচ্ছে দৈহিক প্রক্রিয়ার এক স্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণ বা অবতরণের সময়। তখন আমাদের জীবনছন্দে স্থিতিশীলতার অভাব সৃষ্টি হয়। এই 'সঙ্কটময় দিন'গুলোতে আপনি অসুখে পড়বেন, কাজে সমন্বয়ের অভাব হবে বেশি, ফলে আপনি দুর্ঘটনা প্রবন হয়ে পড়বেন। ছুরি দিয়ে হাত কাটা, ঘরে চুরি, রাস্তায় দুর্ঘটনা এসব ঘটে বেশি এ সময়ে। তবে ঘটবেই যে তা নয়। এই জীবন ছন্দ বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরণের আচরণের প্রবনতার ইঙ্গিত দেয়। আর তা জানা থাকলে আপনি সতর্কতা ও ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে এই খারাপ প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। বৎসরে ১ বার (প্রতি ২৪৮-২৪৯ দিনে) সব তিনটি চক্র একটি শূন্য বিন্দুতে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করবে আপনার জন্য **'মহাসঙ্কটময় দিন'**।

এবার নিজেই নিজের জীবন চন্দের চার্ট তৈরি করুন এভাবে—

১. আপনার বর্তমান আসল বয়সকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করুন। এবার বর্তমান বয়সকে ৪ দিয়ে ভাগ করে লিপ-ইয়ার কটি নির্ণয় করুন। ভাগফলের সংখ্যাটি হচ্ছে লিপ-ইয়ার, এবং এ সংখ্যাকে প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করুন।

২. আপনার শেষ জন্মদিন থেকে আপনি যে মাসের চার্ট করতে যাচ্ছেন তার প্রথম দিন পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা বের করুন। (জন্মদিন ও চার্টের প্রথম দিনও এই সংখ্যার মধ্যে থাকবে। আগের দিনগুলোর সাথে এই দিনগুলিও যোগ করুন। এবার জন্মদিন থেকে চার্টের প্রথম দিন পর্যন্ত আপনার বয়সের মোট দিন সংখ্যা পাচ্ছেন।

৩. এবার জীবনের মোট দিনের সংখ্যাকে প্রথমে ২৩, তারপর ২৮, ৩৩ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফল বাদ দিন। ভাগশেষ নোট করুন এটা খুবই দরকারী।

৪. একটি রুলকরা খাতায় ১ তারিখ থেকে ৩৩ দিনের (পরবর্তীমাসে যাবে) মধ্য লাইন কেটে ২৩, ২৮, ৩৩ দিনের সাইনোসয়েড (ঢেউ খেলানো) লাইন টানুন আলাদাভাবে। ১১$\frac{১}{২}$, ১৪, ১৬$\frac{১}{২}$ দিন উপরে থাকবে, বাকী অর্ধেকটা নিচে থাকবে। প্রথমটা হবে দৈহিক চক্র, ২য়টা ভাবাবেগ চক্র, শেষটা বুদ্ধিবৃত্তিক

www.pathagar.com

চক্র। এভাবে প্রতি মাসের জন্য চালিয়ে যাবেন। মাসের তারিখগুলো প্রতি খোপে লিখতে ভুলবেন না যেন। ৩নং এ যে অবশিষ্টাংশ ছিল, এক এক করে তা চার্টের প্রথম দিনের সংখ্যার ওপর স্থাপন করবেন। তিন রঙের কালি ব্যবহার করুন।

ধরুন, এক ব্যক্তির জন্ম তারিখ হচ্ছে ১৯৪৪ সনের ২২ শে সেপ্টেম্বর। ঐ সব হিসেব করার পর ধরুন ১১, ৩, ১১ ভাগশেষ পাওয়া গেল। তাহলে লোকটি এ বৎসরের ১লা জানুয়ারি শুরু করবে তার দৈহিক ছন্দের ১১তম দিনে, ভাবাবেগের ৩য় আর বুদ্ধিবৃত্তির ১১শ দিনের চক্রে।

এদিকে আরো গবেষণায় দেখা গেছে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি জীবন চক্র খাপ খায় না। অনেক সময় দেখা গেছে ২৩, ২৮, ৩৩ দিনের কোন ছন্দই পাওয়া যায় না কারো জীবনে। জন্ম থেকেই 'জীবন ছন্দ' এক রকম থাকে না। বিশেষ বয়সে বিশেষ অবস্থায় এরাও বিভিন্ন রকমের হয়। মনে হয় ফিজিওলজিক্যাল দিকের চাইতে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই বেশি হয় মানুষের মনে জীবন ছন্দ সম্পর্কে। মার্কিন দৈহিক ছন্দ বিজ্ঞানী হালবার্গ 'ইউএস নিউজ ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' পত্রিকায় এরকমই জানিয়েছেন।

দেখা গেছে দেহের তাপমাত্রা বাড়লে মানুষ বিভিন্ন ঘটনার সঠিক সময় সম্পর্কে ঠিক বলতে পারে না। যারা গাজা খায়, নেশা করে তাদের অনুভূতি দ্রুতি এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে চলে যায়। তাদের কাছে কয়েক মিনিট এক ঘন্টার সমান লাগে। স্বপ্নেও মানুষ কয়েক মাসের বা কয়েকদিনের ঘটনাবলী দেখে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। দেহগত অবস্থাই সময়কে লম্বা দেখায়। আবার অনেক সময় মনে হয় সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। মানসিক অবস্থা, মনোযোগের তীব্রতা এ ব্যাপারে দায়ী।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে স্থানকালের মাত্রায় বস্তুহীন কায়া 'মন' শুধু 'সময়ে' বেঁচে থাকতে পারে না স্থান ছাড়া এবং সময়গত অপ্রতিসাম্যের (temporal asymmetry) সাংখ্যিক ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, মস্তিষ্ক অতীতের চিহ্ন ধারন করতে পারে, ভবিষ্যতের নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে পার্থিব চেতনার একমুখী প্রকৃতি রয়েছে—অতীতের স্মরণ-সময়ের জন্য হাহাকার। পরাবিদ্যার প্রমাণ কোনমতেই সম্ভব হয় না। তবুও কেউ কেউ ভবিষ্যত দেখতে পায় বলে দাবী করে। হয়তবা তাদের মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয় অঞ্চলটি কোনো উপায়ে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তা তখন ভবিষ্যত দেখতে পায়।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সময় ও মহাকালের রহস্য এবং মহানবীর মিরাজ

১১.১ : কুরআনে মি'রাজ প্রসঙ্গ

আরবী শব্দ 'মি'রাজ-এর অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি বা সোপান, ঊর্ধ্বগমন বা আরোহণ। মহানবী (সা.) কর্তৃক মদীনা হিজরতের এক বছর পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে রজব মাসের সাতাশ তারিখের রাতে এই মি'রাজ সম্পন্ন হয়েছিল। মি'রাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত ও রিসালতের এক শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত আছে :

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মসজিদুল-হারাম থেকে মসজিদুল-আকসায় যেখানকার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য; তিনিই শ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা বনী-ইসরাঈল : ১)

"স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে (মি'রাজে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" (সূরা বনী-ইসরাঈল : ৬০)

এই পবিত্র আয়াতদ্বয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মি'রাজ' বা অলৌকিক পরিভ্রমণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) মি'রাজের রাত্রে মহাশূন্যলোকে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে রসূলে করীম বেহেশত ও দোযখ দেখেছিলেন, রব্বুল আলামীন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাছাড়া আঠারো হাজার আলম বা জগত তথা সমগ্র সৃষ্টিলোকের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি যখন পৃথিবীতে মক্কা নগরীতে স্বীয় গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর শয়নকক্ষের বিছানায় তাঁর দেহের উষ্ণতা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি দেখলেন যে, ওযূর অবশিষ্ট পানিটুকু তখনও গড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, মি'রাজে তিনি তিন লক্ষ বছরের পথ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তাতে জাগতিক সাতাশ বছর সমপরিমাণ সময় ব্যয়িত হয়েছিল। অথচ অযূর পানি তখনও গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর ঘড়িতে ৬০ সেকেন্ডেরও কম সময় এতে লেগেছে। এক কথায় বলা চলে মহানবী (সা.) এক মিনিটের মধ্যে সাত আকাশ সাত জমিন ভ্রমণ করে বিশ্ব জগতের সব রহস্য দেখে নিয়েছিলেন; বহু নবী-রসূলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি নবী ও ফেরেশতাদের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। বেহেশ্‌ত ও দোযখে তাদের

www.pathagar.com

অধিবাসীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান নিয়ে বুরাক ও রাফরাফে করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন।

এই পরিভ্রমণ সম্বন্ধে তফ্সীরকার, ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস ও জীবনচরিত লেখকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এক শ্রেণীর ভাববাদী সূফীর অভিমত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজ শরীফে সশরীরেই গিয়েছিলেন। অপর একদল সূফী ও দার্শনিক অভিমত প্রকাশ করেছেন, রূহানী শক্তিবলে আধ্যাত্মিকভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে রসূলে করীম কুল-মখলুকাত সফর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহানবীর অন্তর-মন যাতে ইহ-পারলৌকিক জ্ঞান-সম্পদে পরিপূর্ণ এবং অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে পূর্ণবিশ্বাসী হয়, সে উদ্দেশ্যেই সর্বশক্তিমান রব্বুল আলামীন আল্লাহ্তা'আলা তাঁর অনন্ত রহস্যের মধ্যে বেহেশ্ত, দোযখ ও নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ও অদৃশ্য জগতের রহস্যাবলী প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এই অলৌকিক পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন।

বিশ্বনবী পরদিন যখন এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, তখন বিশ্বাসী মুসলমানেরা নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করেছিলেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কুরাইশরা অবিশ্বাস করে উক্ত পরিভ্রমণের সত্যতা সপ্রমাণ করবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থিতি ও স্বরূপ, মক্কা ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী পথে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্যবসায়ী যাত্রিগণের অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিল, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের প্রতিটি প্রশ্ন ও বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান পূর্বক তাদেরকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন।

সহীহ্ 'মুসলিম' ও 'মা'আলিমুত-তানযীল' এবং অন্যান্য হাদীসসমূহে মি'রাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া যুগে যুগে মুসলিম মনীষীরা মি'রাজের দার্শনিক দিক নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম গাযালী, ইবনে সীনা প্রমুখ চিন্তাবিদদের মি'রাজ সম্পর্কীয় গবেষণা গ্রন্থও রয়েছে। মি'রাজের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতালীয় কবি দান্তে 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করেছিলেন আর তাঁরই অনুসরণে ইংরেজ কবি মিল্টন 'প্যারাডাইজ লস্ট', জার্মান কবি গ্যেটে 'ফাউস্ত' ও রুশ কবি পুশকিন 'অ্যাঞ্জেল, প্রফেট' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনাকর্ম সাধন করেছিলেন। অথচ কুলাঙ্গারজাত সালমান রুশদী কুরআনের উল্টো শয়তানের কাব্য রচনা করে সারা মুসলিম জগতে ধিকৃত হয়েছে।

মি'রাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরও কয়েকটি আয়াত রয়েছে :

"এবং সে সমুন্নত গগনপ্রান্তে ছিল, অতঃপর সে নিকট হতে নিকটতর হয়েছিল; এমন কি তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম ছিল। তখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তাই ওহী করেছিলেন। তখন যা সে প্রত্যক্ষ করেছিল, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। তবে কি তোমরা তদ্বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে, যা সে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং নিশ্চয়ই সে তাঁকে আরেকবার প্রত্যক্ষ করেছিল; প্রান্তবদরী বৃক্ষের সন্নিকটে; তারই কাছে অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, আবৃত হবার তদ্দ্বারাই আবৃত ছিল, তখন তাঁর দৃষ্টি বিভ্রান্ত অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। নিশ্চয়ই সে (মুহাম্মদ) স্বীয় প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিল।" (সূরা নজ্ম : ৭-১৮)

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঐ পবিত্র রজনীতে আল্লাহর সন্দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের সময় তাঁর সাথে মহানবীর সামান্য মাত্র পার্থক্য বিদ্যমান ছিল (ধনুকের জ্যা-এর মধ্যকার দূরত্ব) এবং সেই শুভ মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধুর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য তাঁর অলৌকিক মহিমা ও অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যা কিছু বলবার বা জানাবার ছিল, তা সমস্তই স্পষ্টতর ভাষায় পরিজ্ঞাপন করেছিলেন।

'সিদরাতুল মুন্তাহা'র শাব্দিক অর্থ সমুচ্চ বা সমুন্নত তরু হলেও এর প্রকৃত মর্মার্থ হচ্ছে মানব-জ্ঞানের শেষ সীমা বা মানবীয় ধারণার পরিসমাপ্তি। এ স্থানেই আল্লাহ্তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দর্শন দান করে তাঁর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথন করেছিলেন। কিন্তু এ সকল অলৌকিক ব্যাপার মানব-জ্ঞান বা মানবীয় ধারণার অতীত বলেই একে সিদরাতুল মুন্তাহার সন্নিকটবর্তী ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তা'আলা একথাও বলে দিয়েছেন যে, এ সকল ব্যাপার সন্দর্শনে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চক্ষু বিভ্রান্ত অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই সমস্ত বিষয় অবলোকন করেছিলেন।

মি'রাজ নিয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক। মি'রাজ এমনি এক বিষয় যা বাস্তব উপলব্ধি ছাড়া কারো পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এর জন্য অপরিপক্ক জল্পনা-কল্পনা অথবা অভিজ্ঞতাহীন বিতর্ক ও যুক্তির অবতারণার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। তারই আলোকে মি'রাজের ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টার আগে আমরা ইতিহাস-বিখ্যাত একটি দার্শনিক দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করব।

১১.২ : মি'রাজের সূফীতাত্ত্বিক উদাহরণ ও ব্যাখ্যা

ত্রয়োদশ শতকে মি'রাজের রহস্য নিয়ে মিসরের শাসনকর্তা ১ম আয়্যুবী সুলতান আল-মালিক আল আদিল (১২০০-১২১৮)-এর দরবারে বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল তার সমাধান দিয়েছিলেন বিখ্যাত সূফী সাধক ও সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠা হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন আবূ হাফ্স উমর সোহরাওয়ার্দী (১১৪৫-১২৩৫)। তিনি ছিলেন বড় পীর হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) [১০৭৭-১১৬৬]-এর মুরীদ এবং বিখ্যাত পুস্তক 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' (গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপহার)-এর রচয়িতা।

ইসলামী দুনিয়ায় তাসাওউফ বা দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ কামিল বুযুর্গ শেষ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী সুলতানের দরবারে আসন নিয়ে ৪টি অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করান। তারপর তিনি প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট বড়ো একটি পানি ভরা পাত্র নিয়ে আসতে হুকুম করলেন পাত্রটি সুলতানের সামনে রেখে তাঁর পাগড়ীটা খুলে ঐ পাত্রের মধ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক মুহূর্ত থাকতে বললেন সুলতান সূফীর আদেশ পালন করার জন্য যেই মাথা পানির পাত্রের মধ্যে ঝুঁকিয়ে দিলেন, এমনি সময় এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল!

সুলতানের মনে হল, তিনি এক নির্জন সমুদ্রতীরে এসে আছড়ে পড়েছেন ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাতে। নিরুপায় সুলতান সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গিয়ে কিছু কাঠুরিয়ার দেখা পেলেন যারা তাঁকে কিছু পরার কাপড় উপহার দিল। অনেক দূর চলার পর সুলতান এক

www.pathagar.com

শহরে গিয়ে হাজির হলেন এবং এখানে এক কামারের দেখা পেলেন। কামার সুলতানের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে পরামর্শ দিল ঐ শহরের হাম্মামখানায় যাবার জন্য। গোসলখানায় অবিবাহিত মেয়েরা আসে পছন্দমত কোন বিদেশীকে বিয়ে করার জন্য যদি সে রাজী থাকে। এটা ছিল ঐ দেশের একটি অদ্ভুত নিয়ম।

সুলতান কামারের কথামত শহরের একটা হাম্মামখানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এক সুন্দরীকে পেলেন যে তাঁর স্ত্রী হল। সুলতান নববিবাহিত বধূকে নিয়ে সেই শহরে সুখেই দিন কাটাতে থাকেন। ক্রমে তাঁর মন থেকে অতীত জীবনের স্মৃতি মুছে গেল। দেখতে দেখতে সাতটি বছর কেটে গেল। সুলতানের নতুন স্ত্রীর গর্ভে সাতটি ছেলেমেয়ের জন্ম হল। বসে খেয়ে স্ত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি ও গচ্ছিত টাকা-পয়সা একদিন শেষ হয়ে গেল। সুলতানের স্ত্রী বললেন, "এখন থেকে সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য সুলতানকে কাজকর্মের চেষ্টা করতে হবে।"

কোন কাজ জানা না থাকাতে সুলতান বাজারে গিয়ে কুলির কাজ শুরু করলেন। তিনি খুব কমই উপার্জন করতে পারলেন। পরদিন আবার তিনি ঝুড়ি নিয়ে বের হলেন। এবং রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর চোখের সামনে অতীত জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠল। মনে পড়ল, সেই সমুদ্র-সৈকতের কথা। সুলতান সেই স্থানটিতে এসে পৌঁছলেন। ভারাক্রান্ত মনে তিনি নামায আদায়ের জন্য ওযূ করতে সেই সমুদ্রে নামলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি যেন নতুন করে সম্বিত ফিরে পেলেন। মাথা উঁচু করেই সুলতান দেখতে পেলেন—তিনি মিসরেই নিজের দরবারে পানির পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সুলতান গর্জে উঠলেন, "আপনার জাদুগিরির জন্য আমাকে সাত বছর নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হল। উঃ সাত সাতটা বছর—একটা পরিবার লাভ—বাজারে কুলিগিরির কাজ!"

সূফী সাধক ও সমাগত পারিষদবর্গ এক বাক্যে জানালেন, "কোথায় সাত বছর? আপনি মাত্র এক পলক পানির পাত্রের ওপর ঝুঁকেছিলেন!" কিন্তু সুলতান দরবারে কারো কথাই বিশ্বাস করলেন না। অথচ সত্য হল এই যে, একটি মাত্র মুহূর্তের জন্য সুলতান পানির পাত্রে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন আর সেই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর জীবনের সাত সাতটি বছর পার করে এসেছিলেন।

আসল ঘটনা কি ঘটেছে সেটা বড় কথা নয়—যেটা গুরুত্ববহ, তা হল, উপাদান। আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয় সক্রিয় করে তুলে বহু ঘটনা ঘটানো যায়। আত্মশক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে সাধকগণ জড়দেহসহ ইথারীয় অদৃশ্যলোকের তরঙ্গমালায় মিলে যেতে সক্ষম হন নিজেকে অদৃশ্য করে দিয়ে। আল্লাহ্‌র রসূলের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি ঘটেছিল। মি'রাজ থেকে ফিরে এসে রসূলের বিছানা গরমই দেখা গিয়েছিল আর তাঁর ওযূর পানি তখনও গড়িয়ে যাচ্ছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মি'রাজ পরিভ্রমণ কি সশরীরে ঘটেছিল, না আত্মিকভাবে ঘটেছিল এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন শেখ শিহাবুদ্দীন। তিনি মিসরের সুলতানের এক মুহূর্তকালের নির্বাসিত জীবনের মাঝে সাত বছরের চলমান ঘটনার বাস্তব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সুলতানকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের এই জড়-জগতের ত্রিমাত্রিক প্রেক্ষাপটে এক মুহূর্তকালের মধ্যে সাত বছর তথা হাজার বছরের

www.pathagar.com

ঘটনা বিধৃত হতে পারে। মনের জগত বা আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাস্রোত এমনই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হতে পারে যে, ত্রিমাত্রিক জড় জগতে সেই একই ঘটনা বাস্তবায়িত হতে লক্ষ কোটি বছরের প্রয়োজন হতে পারে।

বিজ্ঞানের জগতে আমরা জানি প্রাকৃতিক উপায়ে পেট্রোল বা হীরা জন্ম নিতে কোটি কোটি বছর লেগে যায়, অথচ গবেষণাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ-তাপ ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তা সম্পন্ন করা যায়। চেতনার বাইরে ইন্দ্রিয়জগতে অনুভূতিকে সজীব রাখা হলে তঁর পরিণতিতে ইন্দ্রিয়জগতের ক্রিয়াকর্ম চলতে পারে, তা না হলে সুলতান দরবারে থাকা অবস্থাতেই কি করে সাত বছরকাল ধরে বৈবাহিক জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নায় এমনভাবে মিশে যেতে পেরেছিলেন? তা ছাড়া তিনি চেতনার জগতে ফিরে এসে ঐ ঘটনার বিষয় স্মরণ করলেন? শেখ শিহাবুদ্দীন এভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, রসূলে করীমের মি'রাজ সশরীরেই সম্পন্ন হয়েছিল।

সুফী দার্শনিকেরা বলেন, আল্লাহর অদৃশ্যমান্যতার গুণ বা শক্তির উদ্বোধন দ্বারা আত্মশক্তির নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তি যে কোন মুহূর্তে অদৃশ্যলোকে আত্মগোপন করতে পারেন এবং চোখের পলকে আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়ে লক্ষ কোটি মাইল দূরে চলে যেতে সক্ষম হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রূহানী শক্তির অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান বিজ্ঞান ও মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করে বিরাট সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হচ্ছে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এমন দিন আসবে যখন মানুষকে জড়দেহ থেকে মুহূর্তে অনুসমষ্টিতে রূপান্তরিত করে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

১১.৩ : অধিবিদ্যা (metaphysics) ও পদার্থবিদ্যার আলোকে মি'রাজ

মি'রাজ সংঘটিত হবার ব্যাপারে মানবমনে দুটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, যথা : স্থূল দেহে মহাজাগতিক ভ্রমণ সম্ভব কিনা, দ্বিতীয়ত পৃথিবীর এক মুহূর্তে মহাজাগতিক হাজার বছর তথা সাতাশ বছরে কালপ্রসরণ নাকি কালসঙ্কোচন ঘটেছিল? বিজ্ঞান বলে স্থূলদেহে আন্তঃগ্যালাকটিক ভ্রমণ কালপ্রসরণের বদৌলতে সম্ভব। যেহেতু বিজ্ঞান এখনও সব রহস্যের জট খুলতে পারেনি, বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্যের সব ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, তাই দার্শনিক অধিবিদ্যার সাহায্য নেয়া ছাড়া এই আলোচনা অসম্ভব। বিজ্ঞান চায় শুধু প্রমাণ। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব ব্যাপারেই দুরূহ কাজ। মহানবীর মি'রাজে বুরাক নামক বাহক ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শব্দটির অর্থ বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ তথা আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ্য ছিয়াশি হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার যা সমগ্র পৃথিবীকে ৭ বার পরিভ্রমণের সমান দূরত্ব বোঝায়। বুরাকের পরেও মি'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে রাফরাফ বা আরও বিশিষ্ট দ্রুতযান ব্যবহার করা হয়েছিল বলে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। সশরীর মি'রাজ সংগঠিত না হলে পর এই সব যানবাহনের কথা উল্লিখিত হত না।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয়ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না; পদার্থের যা সার সেই জ্যোতি বা নূর দ্বারাই তাঁর দেহ মুবারক গঠিত ছিল। কুরআনে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

"আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।" (সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৫)

হাদীসে কুদসী থেকে জানা যায়, রসূল বলেছেন, *"আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট;"*

তদুপরি মি'রাজের আগে মহানবীর হৃদয় বিদীর্ণ করে ফেরেশতারা তা ধৌত করে আরো কিছু প্রক্রিয়া করে পুণরায় ভরে দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত মহাজাগতিক ভ্রমণের জন্য হযরতের পবিত্র হৃদয়কে রিচার্জ করা হয়েছিল ব্যাটারীর মত। এ কারণেই স্থূলদেহমুবারক নিয়েও তাঁর পক্ষে মহাকাশ পরিভ্রমণ সম্ভব হতে পেরেছিল। মানবদেহে জড় পদার্থ ছাড়াও চৈতন্য (Spirit) বা প্রাণশক্তি (Mind) রয়েছে। এই প্রাণশক্তিই চিরকাল জড়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির জোরে জড় পদার্থের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়ম-শৃঙ্খলা উল্টে দিতে পারে। ইত্যাদিকার বিশেষ গুণের বদৌলতেই খুব সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষে জড়দেহে মহাবিশ্বভ্রমণ সম্ভবপর হয়েছিল।

পদার্থ ও শক্তির মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। একটিকে আর একটিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ দিয়ে এই বক্তব্য প্রমাণিত করেছেন। m বা কোন পদার্থের ভরকে যদি (দ্বিগুণ) আলোর গতি (c) দিয়ে গুণ করা যা তাহলে পাওয়া যাবে E পরিমাণ শক্তি। প্রমাণিত হয়েছে নূর বা আলোক দ্বারা পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব বা পদার্থকেও নূর বা আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে যা পরমাণু বোমায় ঘটানো হয়। স্মর্তব্য, নূর হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের আলো বা জ্যোতি যার রহস্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যে কোন পদার্থই অগণিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুগুলো আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিতে বিভক্ত। এ পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেললে তার আর পদার্থ হিসাবে অস্তিত্ব থাকে না (কোয়ার্ক)। তখন সেই পদার্থ আলো বা যে কোন প্রকার বিকিরণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্বের যে কোন পদার্থকেই সম্পূর্ণরূপে আলো বা নূরে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

কুদসী হাদীস মুতাবিক বলা যায় যে, আল্লাহ নিজ নূরের একাংশ দ্বারা নূরে মহাম্মদী সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ প্রথমে এক বিপুল পরিমাণ আলো তাঁর নিজ থেকে আলাদা করেছিলেন। যদিও সে আলোর নাম ছিল মুহাম্মদ, তথাপি তা ছিল নিরেট নূর বা আলো। হাদীস অনুযায়ী সেই আলো থেকেই মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই আলো ছিল স্থান কালের (ঘটনাদৃশ্য) বাইরে (অন্তরালে)। পরে স্থানকালের (মহাশূন্য) একটা উত্তপ্ত ঘনবিন্দুর বিস্ফোরণে তা পদার্থ ও শক্তি হিসাবে আমাদের চেনা জগতে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রাথমিক আগ্নেয় গোলকটিতেই তৈরি হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। হিসাব করা হয়েছে, মহাবিশ্ব তখন পিনের মাথার একটি বিন্দুর সমান (মতান্তরে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সমান) জায়গায় $১০^{৯৩}$ গ্রাম-বিশিষ্ট বস্তুপিণ্ড মাত্র ছিল। আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর আগে তা বিস্ফোরিত হয়ে আজকের বিশ্বকে গঠন করে।

www.pathagar.com

এই বিশ্ব জগত আবার ৪২০০ কোটি বছরের একটি সুদীর্ঘ চক্র সমাপ্ত করার পর পদার্থ ও শক্তি স্থানকালের অন্তরালেই ফিরে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে, নক্ষত্রসমূহ কৃষ্ণ-বিবরে রূপান্তরিত হওয়ার পর তার সব পদার্থ ক্রমাগত একটি গাণিতিক বিন্দুতে (singularity) পতিত হয়। কিন্তু শক্তি ও পদার্থের ধ্বংস নেই, তা হলে এই পদার্থ কোথায় যায়? বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে স্থানকালের বাইরে চলে যায়। বিশ্বসৃষ্টির সময় মহাবিস্ফোরণের সময় যেখান থেকে এই শক্তি এসেছিল আবার সেখানেই তা ফিরে যায়। বর্তমানের জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে আমরা স্থানকালের অন্তরাল বুঝতে পারছি না। এটি আমাদের দর্শন অনুজ্ঞা বা জ্ঞানের সীমার বাইরে। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে গিয়ে স্থানকালের বাইরে (সিদরাতুল মুন্তাহা) আল্লাহ্‌র দেখা পান।

কুরআনের বহু আয়াতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা অদ্ভুতভাবে বর্তমানের বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। গত বিশ বছরে শ'খানেক বই প্রকাশিত হয়েছে যাতে বহু আইডিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। গণিতে দশ মাত্রার বিশ্বের কথা আঁকা হয়েছে। জানা গেছে, এর বাইরেও বহু মাত্রার বিশ্ব থাকতে পারে। মি'রাজে আল্লাহ তাঁর সত্তর পর্দা খুলে দিয়ে তাঁর বান্দা মুহাম্মদকে (সা.) দেখা দিয়েছিলেন। এটা খুব সম্ভবত সত্তর dimension বা মাত্রার কথা বলা হচ্ছে। আমরা ত্রি-মাত্রিক বিশ্বে বাস করি এবং সময়ের সঙ্গে ঘটনার পরম্পরায় কাল গণনা করি সম্মুখের দিকে।

আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কোনরূপ যানবাহন ছাড়াই মহানবীকে তুলে নিতে পারতেন তাহলে মানুষের তর্ক, বোঝা বা চিন্তার জন্য কোন খোরাকই থাকত না। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হত। মি'রাজ লীলাময় স্রষ্টার একটি সামান্য লীলামাত্র। এই লীলা নিয়ে চিন্তা করা, গবেষণা করার জন্যই মানব জন্ম। মানুষের দেহের মূল হয় তাঁর আত্মা। আত্মা চলে গেলে মানুষের চেতনা লোপ পেয়ে যায়। নিদ্রায় গেলে মানুষের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। মহানবী (সা.) যখন মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে মহামিলনের জন্যে মি'রাজে গেলেন তখন খুব সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব জাহানের সমস্ত কিছু চেতনা হারিয়ে স্থির হয়ে পড়েছিল; যেহেতু সৃষ্টির মূল ব্যক্তিত্ব বা প্রতিনিধি সৃষ্টি হয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন স্রষ্টার সাথে। তিনি ছিলেন সমগ্র মহাবিশ্ব জগতের মূল নির্যাস (নূর)। সুতরাং তাঁর (আত্মার) অনুপস্থিতিতে দেহস্বরূপ বিশ্বজগত ঘুমিয়ে পড়েছিল চেতনাহীন রূপে। হাদীস মতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুদীর্ঘ ২৭ বছর কাল মি'রাজ ভ্রমণ করেন এবং এই সুদীর্ঘকাল সমগ্র সৃষ্টি জগত নিদ্রামগ্ন ছিল। আবার যখন তিনি মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তখন সব কিছুই জাগ্রত ও সচল হয়ে ওঠে। তাই তিনি তাঁর অযূর পানি আগের জায়গাতেই গড়িয়ে যেতে দেখলেন। কোন কোন সময় আমাদের চেতনায়ও মনে হয় অনেক সময় চলে গেছে, অথচ ঘড়িতে দেখা যায় সামান্য ক্ষণ মাত্র অবিবাহিত হয়েছে।

১১.৪ : আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে মি'রাজ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন, 'সেই অপার্থিক জগতে সময় বয় না, মহাকর্ষ নীচের দিকে টেনে নামায় না, পদার্থ বলতে সেখানে কিছুই নেই, আলোক সেখানে অচল,

www.pathagar.com

পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদের মনের প্রচলিত ধারণার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।" রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমার জনক অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, আন্দ্রেই সাখারভ প্রমাণ করেছেন এক গবেষণাপত্রে এই, "সময় সামনে পেছনে সবখানেই যেতে পারে, এমন কি স্থিরও থাকতে পারে (t=o)। (বেহেস্তের সময় স্থির) আর এই বিশ্বের রয়েছে আরেকটি প্রতিবিম্ব বিশ্ব বা সমান্তরাল বিশ্ব।" রুশ বিজ্ঞানী মারকভের মতে বিশ্বজগত হচ্ছে মৌচাকের মত যার ভেতরে প্রতি খোপে রয়েছে একটি করে বিশ্বজগত। কোন জগত ইলেকট্রনের সমান আকার, কোনটি আবার বিশাল। অথচ ইলেকট্রণের অভ্যন্তরে বিশ্বজগতের রাজত্ব চলছে, সময় চলছে অবিরাম। এই বিশ্বগুলো একটি অপরটির মাঝ দিয়ে চলে যায়, তাতে কোন সংঘর্ষই ঘটে না। এক একটির ডাইমেনশন ভিন্ন বলে অন্য ডাইমেনশনের বিশ্বের প্রাণীজগতের সঙ্গে দেখা হয় না, সংঘর্ষ বাধে না। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রচণ্ড। যাঁরা গবেষণাগারে কাজ করেন তাঁরা এটা হাড়ে হাড়ে টের পান। বিজ্ঞানের পক্ষে অতি-বিজ্ঞানকে জানা দুরূহ এবং সেখানে বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান অসীম অনন্তের বক্ষে দিশেহারা হয়ে যায়।

মহাবিশ্বের নব্বই শতাংশ জিনিষই দেখা যায় না, বাকী দশভাগে দৃশ্যমান গ্রহ-নক্ষত্র গ্যালাক্সিসমূহ জ্বলছে। মহাজগতে মোট যত প্রকার রশ্মি রয়েছে তারি ১% ভাগেরও কম আলোকরশ্মি আমরা দেখতে পাই, বাকী ৯৯% ভাগের বেশি আলোক সর্বদা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। যেমন, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্সরে, অবলোহিত রশ্মি, লেসার রশ্মি ইত্যাদি। 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই' বা অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু তাঁরই। তাঁর জ্ঞানের ওপর অন্য কারো কোন প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই' এমনি অনেক আয়াত কুরআনে রয়েছে।

বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহর উপাসনায় রত। অথচ এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রতিটি অণু তাঁর নিজের জায়গায় থেকে আন্দোলিত হচ্ছে, নাচছে, কাঁপছে, তরঙ্গায়িত হচ্ছে, যেন যিকর করছে। কোন কিছুই থেমে নেই। এমন কি ইলেকট্রনকে ভেঙ্গে ফেললেও তার ভেতরে পাওয়া যাবে স্পিন বা তীর-শলাকা যার একটি ঊর্ধ্বমুখী, দ্বিতীয়টি অধঃমুখী। এই স্পিনগুলোও কাঁপছে, এদের কম্পনের ফলেই ইলেকট্রন ঘুরছে। বিজ্ঞান বলছে, সমগ্র বিশ্ব এক সুতোয় বাঁধা। বিজ্ঞানের ভাষা একে বলে মহাজাগতিক তার (Cosmic string)। এই তার অতিপরিবাহীরূপে কাজ করে। অদৃশ্য এই তারের বদৌলতেই আমরা মনের মধ্যে বিশ্বের শেষ প্রান্তের ছবির কথা কল্পনা করতে পারি। একটা সংযোগ তার হচ্ছে এই মহাজাগতিক সুতো। মহানবী সম্ভবত এই কসমিক স্ট্রিং বেয়েই last frontier of the space (সিদরাতুল মুন্তাহাতে) পৌঁছে গিয়েছিলেন। পশ্চিমে দুই পাহাড়ের মধ্যে তারবাহী যানে করে মানুষ যাতায়াত করে থাকে।

সমগ্র বিশ্বজগতের সব কিছুর রহস্য সম্পর্কে জানা মানুষের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতার জন্যই কোনদিন সম্ভব হবে না। যেমন, সাধারণ একটি লবণের কণায় $১০^{১৬}$ টি পরমাণু রয়েছে যাদের প্রতিটি আবার ১০টি তথ্য তরঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অথচ সবচাইতে আদর্শ একটি মস্তিষ্কের তথ্য ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে $১০^{১৪}$। আর এই সংখ্যাটি হচ্ছে লবণের কণার মধ্যস্থিত পরমাণুর সংখ্যার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র! এখন চিন্তা করে দেখুন,

www.pathagar.com

স্রষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে জানবার জন্য দরকার পড়বে তার সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা। বিশ্বজগতের মাত্র ০.১ অংশ বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপের আওতায় ধরতে পেরেছেন, এতেই পাওয়া গেছে ১০০ কোটি গ্যালাক্সি। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড়ে ১০,০০০ থেকে ৪০,০০০ কোটি তারকা থাকে। এখন এই বিশ্ব জগত নাকি আরও অসংখ্য রয়েছে, এমন কথাই বিজ্ঞানীরা বলছেন। এখন বুঝুন এই মহাবিশ্বের (অসংখ্য বিশ্বজগতের সমাহার) স্রষ্টাকে বুঝতে কত বিশাল মস্তিষ্কের প্রয়োজন পড়বে? আমাদের দৃষ্টি ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছে (অঙ্ক কষে ও কোয়াসার দেখে)। তারপরের সীমানা (বিশ্বজগতের মহাবিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত থেকে পেছনের দিকে) আর আমাদের অঙ্কে, চিন্তায় ধরে না। এই প্রাপ্ত সীমানার নামই 'সিদরাতুল মুন্তাহা' যা পেরিয়ে গিয়ে আরো বহু দূরে আল্লাহর সন্দর্শন পেয়েছিলেন রসূলুল্লাহ (সা.)। "দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করে না—তিনি দৃষ্টিসমূহকে দর্শন করেন"।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ফ্রেডকিনের মতে মহাবিশ্ব তথ্যের নেটওয়ার্ক মাত্র। সৃষ্টিতে আদি ও সর্বমূল বস্তুকণা কোয়ার্কের চাইতেও এই 'ইনফরমেশন' হল একটি মৌলিক অস্তিত্ব। আর কোয়ার্ক বা ডি এন এ গুলো মূলত অতি ক্ষুদ্র যুগ্ম ও সমন্বিত তথ্যকণার ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছু নয়। একটি ইঁদুর, মানুষ, সবকিছুই মূলত একটি বিশাল বিস্তৃত তথ্যকণাদের পদ্ধতিগত সমষ্টিমাত্র। আর এই ধারণাকৃত বুদ্ধি বিস্তার করছেন স্রষ্টা স্বয়ং যাতে তাঁর কোন তথ্য হারিয়ে না যায়, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। এই মহাবিশ্ব হচ্ছে একটি বিশাল জীবন্ত কম্পিউটার যার প্রতিটি রন্ধ্রে কণায় কণায় তথ্য পুরে দেয়া আছে এবং এই তথ্যগুলো সময় ও সুযোগ মত কম্পিউটারের মতই চাইবামাত্র তথ্য সরবরাহ করবে (যেমন হাশরের মাঠে)। 'হারায় না কিছুই যত কথা যত গান সবি আছে সবি থাকে কিছুই যায় না ভোলা'। সময়ের অদৃশ্য সুড়ংগে ফেলে যাওয়া আমাদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাগুলো ফ্রেডকিনের "বিটে বিটে" জমা হচ্ছে। হারিয়ে যাবে না ওরা। হারিয়ে যায় শুধু আমাদের বস্তুগুলো, দেহগুলো। বেঁচে থাকে প্রাণ, মৃত্যুর তোরণ পাড়িয়ে দিয়ে প্রবেশ করে আরেক অচেনা জগতে, তারপর একদিন হবে পুনরুত্থান। [প্রাণ = এনার্জি (হিন্দু মতে), বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু এনার্জিতে ভরা]

আমরা আগেই বলেছি যে, আলোর গতিবেগ হল প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যা হল সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ৭ বার ঘুরে আসার সমান দূরত্ব। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে আলোর এই গতিই সর্বোচ্চ বেগ এবং এটা ধ্রুবক। আলোর গতিবেগের ৯৯.৯৯৯৯৫% গতিবেগসম্পন্ন কোনও মাধ্যমে বা মহাকাশযানে কোনও পর্যবেক্ষকের ঘড়িতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে পৃথিবীতে ততটা সময়ে পার্থিব এক হাজার বছর কেটে যাবে। এই ঘটনাকেই বলা হয় কাল প্রসরণ বা Time Dilation অর্থাৎ আলোর সমান গতিবেগসম্পন্ন কোন পর্যবেক্ষণের মুহূর্তমাত্র সময় পৃথিবীতে অনন্তকাল হয়ে উঠবে। আলোর কাছাকাছি গতিবেগ তাই সম্ভব, কিন্তু আলোর সমান গতিবেগ কখনও কারো হতে পারবে না। সময় সম্পর্কে এই ধারণার বয়স মাত্র ৯০ বছর। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে আলোর গতিতে বুরাকে চড়ে মি'রাজে যাননি তার প্রমাণ হচ্ছে তাহলে স্থানকালের অন্তরালে যেতে ১৫০০ কোটি বছর লেগে যেত। তিনি ত 'নূর' ছিলেন ঠিকই, তবে এ নূর আলোকের চাইতেও অধিক শক্তিসম্পন্ন জ্যোতি বিশেষ।

www.pathagar.com

ইদানীং আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন কণার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ট্যাকিয়ন (Tachyon)। এই ট্যাকিয়ন' হল আইনস্টাইনীয় ভরের (mass-m) প্রতিরূপ। ১৯৬৭ সালে নিইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জেরাল্ড ফাইনবার্গ তার ট্যাকিয়ন সূত্র প্রকাশ করেছেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ভর (বস্তু) আলোর গতিবেগের সমান গতিবেগে অপরিমিত বিশালতা লাভ করবে। ফাইনবার্গ অঙ্ক কষে দেখালেন আইনস্টানীয় ভরের প্রতিরূপ আছে—সেগুলো হলো ট্যাকিয়ন। তাঁর মতে ট্যাকিয়ন আলোর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ দ্রুততর, কিন্তু আলোর গতি বা তার চেয়ে কম গতিতে তাকে নামিয়ে আনলে তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। তা হলে ট্যাকিয়নের গতিতে সময়ের ধারণা কি রকম হবে? তখন তথাকথিত অতীতই ভবিষ্যত হবে। আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, আজ যাত্রা শুরু করে গতকাল—এ পৌঁছানো যাবে।

অঙ্ক কষে এ কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও বাস্তবে এর অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে আপেক্ষিকতাবাদের ধারণানুযায়ী কোন কণা আলোর গতির কাছাকাছি এসে পৌঁছালে তার ভর হবে অতি বিশাল (অসীম), তখন সে কণা আলোর গতির নাগালও ধরতে পারে না, পারে না সেই সীমানা টপকাতে—এই ধারণাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েচে। ইউরোপীয় কমিশনের সের্ন-এ-(CERN) ল্যাবরেটরীতে যে বিশেষ ধরনের কণাত্বরণ বা synchrotron আছে তাতে মৌলিক কণাগুলোকে আলোর গতির শতকরা ৯৯.৫ ভাগের সমান গতিবেগে ইতোমধ্যেই ত্বরান্বিত করার পর দেখা গেছে তাদের ভর অসীম হয়নি। কে জানে হয়ত ৯৯.৯৯ ভাগের সময় অসীম হয়ে যাবে!

ডীট্‌মার কিন্তু মৌলিক কণাগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন। একরকম কণা হলো যারা আলোর চেয়ে কম গতিতে ছোটে। যেমন : নিউক্লিয়ন আর ইলেকট্রন। এরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ফোটন ও নিউট্রনের মত কণা, যারা আলোর সমান গতিবেগে ছোটে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে আছে ট্যাকিয়ন, যে নাকি আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটতে পারে, যার বাস্তব অস্তিত্ব আজও অনাবিষ্কৃত এবং আলোর গতির সমান বা তার চেয়ে কম গতিতে যার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কণার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদ প্রযোজ্য হলেও তৃতীয় শ্রেণীর কণা অর্থাৎ ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। প্রথম শ্রেণীর কণাগুলোকে যেমন কখনও আলোর গতিতে ছোটানো যায় না, তেমনি ট্যাকিয়নের গতিকেও কখনও আলোর গতিতে ... নামিয়ে আনা যায় না। এ যেন দিন রাত্রিকে ধরতে পারে না, রাত্রি দিনকে'—ধরনের কুরআনের বাণী। আবার ফোটন ও নিউট্রনের গতি থামিয়ে দিলে তাদের বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং ট্যাকিয়ন প্রথম দুই শ্রেণীর কণার একেবারে বিপরীতধর্মী। সেইজন্য ট্যাকিয়ন অথবা অপরা পদার্থ (anti-matter) যা আইনস্টাইনীয় ভরের প্রতিরূপ। ট্যাকিয়ন দুনিয়ার মানুষের 'দূর ভবিষ্যত হবে আমাদের দূর অতীত'। সমান্তরাল বিশ্বের ধারণার সঙ্গে ট্যাকিয়নের যোগসূত্র আছে।

সুমেরীয় সভ্যতার রাজাদের তালিকায় দেখা যায় তখনকার রাজারা ৪৩৩,৬৩,২২,৮২১ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিব্বতীয় লামা ধর্মের প্রাচীন পুঁথি

www.pathagar.com

'কাঞ্জুর' ও 'তাঞ্জুর'-এ 'ষড়স্বর সংগ্রহ' বইয়ের 'দেববাণী' পরিচ্ছদে মহাবিশ্বে নানা স্বর্গের কথা বলা হয়েছে যেখানে ১ম স্বর্গের ১টি দিবারাত্রের সমান হচ্ছে পৃথিবীর ৫০ বৎসরের সমান। এখানে দেবতারা ৫০০ বছর তথা পৃথিবীর ৯০ লক্ষ বছর বাঁচেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম পেরিয়ে বিশেষ স্বর্গ ৬ষ্ঠ নম্বরে দেখা যায় সেখানকার এক একটি দিন পৃথিবীর ১৬০০ বছরের সমান। কুরআনে রয়েছে একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা, "এমন একদিন ফেরেশ্‌তা ও রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" (মা'আরিজ : ৭০ : ৪)। ষষ্ঠ স্বর্গের দেবতাদের আয়ুষ্কাল ১৬০০ বছর হিসাবে ৯২১ কোটি ৬০ লক্ষ বছরের সমান। দেবতারা যেসব স্বর্গে আছেন বলে বলা হচ্ছে সেগুলো পৃথিবীর আপেক্ষিকে দ্রুততরভাবে গতিশীল কোন গ্রহ যা আমাদের সৌরমণ্ডলের যথেষ্ট বাইরে অবস্থিত। বিভিন্ন স্বর্গ বিভিন্ন বেগে গতিশীল ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের কথাই বলে। আর সবগুলোই পৃথিবীর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন বলেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে কাল-প্রসরণ। অঙ্ক কষে প্রমাণ করা গেছে, দেবতারা যে লোকে অবস্থান করেন তা আলোর বেগের ৯৯.৯৯৯৬১% গতিবেগসম্পন্ন। এই দেবতাদের এক বছর হয় ৩৬০ পার্থিব বছরে। এঁদের পরমায়ু ১০০ দিব্য-বছর যা আমাদের ৩৬০০০ পার্থিব বছরের সমান।

ভারতীয় দর্শন বলছে, পৃথিবী কর্মভূমি, সাধন ভূমি। পৃথিবীর কর্মফল দিয়ে সাতটি ঊর্ধ্বলোক এবং সাতটি অধঃলোক গড়া। সপ্তম ঊর্ধ্বলোক হলো 'সত্যলোক। সেখানে উপলব্ধ সত্য মহাসত্যের সঙ্গে মিশে যায়—ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় মহাপ্রলয়ের সময়। এই লোকগুলো প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো যেন এক একটি স্তর! বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন এইসব লোককে আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিকাঠামো বলে ধরা যায়। গতিশীল এইসব লোকে পৌঁছতে হলেও বিভিন্ন ধরনের গতির প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনে তাই বিভিন্ন লোকের উপযোগী বিভিন্ন গতির কথা বলা হয়েছে। আলোর গতি বা বিদ্যুৎ গতির চাইতেও অনেকগুণ বেশি সেসব গতিবেগ। বিভিন্ন গতির নাম হলো বিদ্যুৎগতি, ধূম্রযানগতি, দেবযানগতি, আকাশগতি, মহাকাশগতি, ইচ্ছাগতি, ঐশীগতি ও স্থিরা গতি। বিদ্যুৎ আলোর গতির দশগুণ হলো ধূম্রযানগতি। সর্বশেষ স্থিরগতি হল আলোর বেগের $১০^৭$ বা এক কোটি গুণ-ট্যাকিয়নের গতি। স্থিরা গতিকে বলা হয়েছে পরব্রহ্মের গতি, যে গতিতে নাকি গতি নেই। পরব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) তাই সর্বত্র সব সময়েই উপস্থিত। তাঁর কাছে সময় নেই। ব্রহ্ম নিজে দেশকাল নিমিত্তর মধ্য দিয়েই গত হয়েছেন। ব্রহ্মে দেশকাল নিমিত্ত নেই।

দেশ বলতে আমরা মহাকাশ আর কাল বলতে সময়, নিমিত্ত বলতে কার্য-কারণ বুঝি। আইনস্টাইন এই কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে পা বাড়ান নি একবারও। সুতরাং ব্রহ্ম মহাকাশ সময়-সন্ততি ও কার্যকরণ সম্পর্কের ভেতর দিয়েই বিশ্বজগত হয়েছেন। আর পরব্রহ্ম বলতে উপনিষদ যা বলছে তা হল বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টি, যাকে আমরা চৈতন্য বা তথ্য বলি, সেই চৈতন্যবিজড়িত 'প্রকৃতি', যে প্রকৃতিকে আমরা বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও শক্তির সমষ্টি বলতে পারি অর্থাৎ চৈতন্যবিজড়িত মহাজাগতিক ডিম্বই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা বা পরব্রহ্ম। আর সেই ঈশ্বরই দেশকালের চতুর্থমাত্রা ও কার্যকারণ সম্পর্কের

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান জগত হয়েছেন। এই ঈশ্বরই পরব্রহ্ম। সময়ের মাত্রা জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে নয়। কারণ কসমিক এগের কোন মাত্রা থাকবে এটা বিজ্ঞানও মনে করে না। সুতরাং ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা সময় নিরপেক্ষ। সেখানে মহাকাশ সময়-সন্ততি ও কার্যকারণ সম্পর্ক সবই অনুপস্থিত।

পরব্রহ্মের স্থিরা গতিতে বা তার আগের ঐশী গতির মধ্যে কোন একটিতে মি'রাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলে আভাষ পাওয়া যায়। আল্লাহ্পাক মক্কাতেও আছেন, জেরুজালেমেও আছেন, মহানবীর সঙ্গেও আছেন, আবার জিবরাইলের সঙ্গেও আছেন, মহাবিশ্বের সপ্তাকাশ ও সপ্তজমিনের মধ্যে আছেন—**সর্বত্রই তিনি আছেন একই সময়ে। অথচ সময়ের মাত্রা বিভিন্ন।** আল্লাহ পাক মাত্রাহীন বা dimensionless এবং মাত্রার বাইরে তাঁর অবস্থান। তাই তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে মহানবীকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসেন ট্যাকিয়ন যানে করে। কয়েক পলকে সমগ্র স্বর্গ মর্ত্যকে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরা হোল, তাঁকে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহ তাঁর রসূলকে স্থানপাত্র ও কালের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি অবলীলাক্রমে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর অতীত ও ভাবী-মানবধারাকে। তিনি দেখেছিলেন সমস্ত যুগের নবী ও সব মানবাত্মাকে। তিনি দেখেছিলেন ফেরেশ্তাদের কার্যকাল। মহানবীর আত্মা নবুওয়াতের বহু পূর্বেই বিশ্ব রহস্য জানার জন্য আকুল প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। নবুওয়াতের দশম বছর পর্যন্ত অনুধাবন ও অনুশীলন চলছে। সুতরাং এ বিশ্ব রহস্য প্রহেলিকার মাঝে মুহাম্মদ (সা.) যে কেমন মানুষ ছিলেন, এ নিগূঢ় রহস্য উদ্ধারে আরো লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। হযরতের জীবনের যে কোন একটি দিক একটু ধীর ও স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে যে কোন চিন্তাশীল মানুষই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেন না। তাঁকে নিছক একজন ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক মহামানবরূপে দেখলে সূর্যকে একটি সর্ষের দানার রূপেই দেখা হবে। এমনটি পড়েছিলাম কোন এক মনীষীর লেখায়।

আল্লাহ্ তাঁর সকল নবীকেই বিশ্বরহস্য জানিয়ে দেন। ঐ জ্ঞান ব্যতীত তাঁরা বিশ্বের গতি নির্দেশ করবেন কি করে? "আমি এভাবে ইবরাহীমকে আসমান ও যমিনের পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়" (আনআম : ৭৫) যে ব্যক্তি কখনও হাতী দেখেনি, যে যত বড়ই জ্ঞানী হোক তার পক্ষে অন্যকে হাতী সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করা অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেক নবীরই প্রয়োজন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁরা পেয়েছেন মি'রাজের মাধ্যমে। কোন নবীই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নন। বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বরহস্য সম্পর্কে যতটা বলতে পারেন, নবীগণ তা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি বলতে পারেন। অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান ও ধারণা সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই জগত—সত্য সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। তারাই বলতে সক্ষম হয়েছেন যাঁরা বাস্তব দৃষ্টিতে সবকিছু উপলব্ধি করেছে।

মি'রাজ সেই বাস্তব দৃষ্টির বাইন, যা অন্য নবীগণও পেয়েছেন। রসূল (সা.) যদি পরকাল স্বচক্ষে না দেখতেন, বেহেশ্ত-দোযখ প্রত্যক্ষ না করতেন, তা হলে এতটা ঈমানের জোর কোথায় তিনি পেতেন যা দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিধর্মী আরবদের তিনি

www.pathagar.com

মুকাবেলা করেছিলেন? চরম ও পরম সত্য যে কি, তা তিনি জানতেন বলেই তিনি অসত্যের বিরুদ্ধে অটলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা জানি যে, এখন থেকে কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল পরে (যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না) বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, (বিজ্ঞান ও কুরআন এভাবে একই কথা বলে।) তারপর আল্লাহ্পাক আবার সৃষ্টি করবেন, হাশরের মাঠে শেষ বিচার করবেন সবার পাপ-পুণ্যের, তারপর রায় অনুসারে সবাই বেহেশ্ত ও দোযখে চলে যাবে। অথচ মহানবী মি'রাজের রাতেই অগ্রিম তা দেখে ফেলেছেন। প্রশ্ন দাঁড়াবে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব না। এই পুরো প্রবন্ধ জুড়ে এমনি বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে যে, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণ (গাণিতিক) ছাড়া বর্তমান মুহূর্তে বিজ্ঞানের হাতে কিছু নেই।

খুব সম্ভবত বিশ্বসৃষ্টি শুধু ১৫০০ কোটি বছর আগে একবারই হয়নি। তারও আগে এমনি লক্ষ কোটিবার মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, কোনো বার বিগব্যাং প্রক্রিয়া দ্বারা, কোনবার ফেঁপে উঠেছে বিশ্বজগত (Inflated universe), কোনো বার অসংখ্য বুদ্বুদ-মহাবিশ্ব ভেসে উঠেছে, এমনি ধরনের বহু আইডিয়া বা প্রকল্প বিজ্ঞানীরা মডেল হিসাবে দিয়েছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্যায় বলে যে, যত উদ্ভট চিন্তাই মাথায় আসুক না কেন, সব কিছু কোন অতীত কালে সংঘটিত বাস্তব অবস্থার প্রক্ষেপণ (Projection) ও প্রতিফলন প্রক্রিয়ামাত্র। তাই মনে হয়, যতবার যতগুলো বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সবি রয়ে গেছে সৃষ্টিকর্তার মানসনেত্রে; তারা আছে "কম্পিউটারের মেমোরী"তে সংরক্ষিত হয়ে, বিশ্বগুলি পরপর সাজানো রয়েছে সুতার কুণ্ডলীর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। একের ভেতর এক বিশ্ব এক এক মাত্রার। তাই সাত আকাশ সত্তর পর্দা এই কথাগুলো ঠিক সাত, সত্তর না বুঝিয়ে অসংখ্য সংখ্যা বোঝাতে পারে। এই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ও সময় নিয়ে গঠিত চতুর্থ মাত্রার বিশ্বের বাইরে অন্য কোন ডাইমেনশনের বিশ্বে বেহেশ্ত ও দোযখ রয়ে গেছে। স্রষ্টার কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত কিছুই নেই। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, স্রষ্টা সব কিছুই একবারেই সৃষ্টি করে ফেলেছেন, তিনি বিশ্ব জগতকে প্রসারিত করছেন, বেলুনে ফুঁ দেবার মত করে। তাই তার কাছে সবই জ্ঞাত, সবকিছুই এক স্কেলে মাপা।

আঠার হাজার আলম (সৌরজগত) সম্পর্কে তাঁকে মহানবীকে জ্ঞান দেয়ার পর তাঁকে মানবমণ্ডলী সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হল। প্রত্যেক মানুষেরই একটি জীবনী খাতা আছে। সেখানে দিবা-রাত্রি রেকর্ড হচ্ছে। যে যা করছে, ভাল-মন্দ সবাই তাতে লেখা হচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ্তা'আলা তাঁর রসূলকে জগতের ভূত ভবিষ্যত ও উত্থান-পতন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান দান করেন। মানুষ যেন মনে না করে যে রাজত্ব শুধু তাদেরই কৃতিফল মাত্র। এরপর আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় রসূলকে জাগতিক কয়েকটি সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন। এইগুলো মানুষ যদি তাঁর দৈনন্দিন চলার পথে এতটুকুও স্মরণ করে চলে, তাহলে সাধারণ মানুষ মহামানব বা অতিমানব না হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত সে অমানুষ হবে না।

এরপর সমগ্র বিশ্বজগতের পরিচালক (আল্লাহ) সম্পর্কে তাঁকে সম্যক্ জ্ঞান দান করা হয়। এই বিশ্বজগতে আল্লাহর কোন সহকারী, পুত্র, সাহায্যকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।, তিনি এক ও একক। "বল, ওদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরো উপাস্য থাকত, তবে তারা

www.pathagar.com

আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।" (১৭ : ৪২-৪৩)। মহানবী জানতে পারলেন পরিচালক একজনই আছেন এবং জগতসংসার সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীনে। যখন কেউ এক ও অদ্বিতীয়ের উপাসনা হতে বিরত থাকত, তখন মহানবীর মনে খুবই কষ্ট হত। তাই তাঁকে দেখানো হলো সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না। (১৭ : ৪৪)

১১.৫ : কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখে সময়, স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রকৃতি

বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্যালাক্সি, কোয়াজারগুলো গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিকণা বা Elementary Particle দ্বারা। ৯২ টির মত মৌলিক পদার্থ দিয়ে বিশ্ব গঠিত, আরো ১২টি স্বল্পস্থায়ী মৌলেরও হঠাৎ দেখা মেলে পরীক্ষাগারে। প্রতিটি মৌল বা মৌলিক পদার্থের প্রতিটি কণার পরমাণুর অভ্যন্তরে রয়েছে কেন্দ্রে প্রোটন, নিউট্রন বা পজিট্রন, কেন্দ্রের বাইরে কক্ষপথে পভ্রিমণরত ইলেকট্রন। সেকেন্ডের দশকোটি ($১০^{-১৫}$) ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটনকে একবার ঘুরে আসে। $১০^{-১৮}$ থেকে $১০^{-২২}$ ভাগ সময়ের মধ্যে এক্সরশ্মি বা গামারশ্মি কোন নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে পারে। কেন্দ্রকে ভেঙ্গে ফেললে পাওয়া যায় প্রাথমিক কণিকা বা Elementary particle। এ ধরনের প্রায় ২০০টি কণিকার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা—যাদেরকে বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান (ইট) মনে করা হচ্ছে এখন। এই কণিকাগুলো (Quark) $১০^{-২৪}$ সেকেন্ড সময় টিকে থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঐতিহ্যবাদী পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণামতে আরো হল বিদ্যুৎ চুম্বকায়িত তরঙ্গ বা বৈদ্যুতিক চুম্বক ক্ষেত্রের ঢেউ। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রমাণ করেন যে, আলো অদৃশ্য কিছু পিণ্ডের বা প্যাকেটের আকারে চলে। ল্যাটিন ভাষায় এই পিণ্ড বা প্যাকেটের নাম কোয়ান্টাম। সেই থেকে কোয়ান্টাম-পদ্ধতির উদ্ভব। তবে সাধারণ্যে আজও তা তেমন প্রচারিত নয়। এই তত্ত্বের মধ্যে এমন কিছু বক্তব্য আছে যা মানুষকে মন ও বস্তুজগতের গভীর অন্তঃপুরে তাকাবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন আল্লাহ্‌কে বুঝতে গেলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। অনেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও প্রাচীন মরমিয়াবাদের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ খুঁজে পাচ্ছেন। বর্তমানে যার যে ধর্মই থাকনা কেন, কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বাদ দিয়ে তার যথার্থতা কারো পক্ষেই সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির যথার্থ ভাগ্য যেন এই তত্ত্বের মাধ্যমেই পরিষ্কার হচ্ছে। এই তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল অণুর কার্যকারণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা থাকে। ফলে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ক্ষুদ্র বিশ্বের (Microworld)-এর সঙ্গে যুক্ত। এই তত্ত্ব থেকেই আমরা পেয়েছি লেজার, ট্রাঞ্জিস্টার, টেলিভিশন, সুপার কন্ডাকটর ও পরমাণু শক্তি। বিশ্বজগতের স্বরূপ বুঝতে এই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখন করব।

www.pathagar.com

অতীতে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করত ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মুখনিঃসৃত। তারপর প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বাড়ল, প্রকৃতির অলৌকিক ব্যাপারগুলো একটু একটু করে ঢুকতে লাগল লৌকিকতার ভাণ্ডারে। ফলে জানার স্পৃহা বাড়ল আরো, জাগল নতুন নতুন প্রশ্ন। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখার সঙ্গে সংঘাত লাগল নতুন পাওয়া জ্ঞানের। শুরু হয়ে গেল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। বিজ্ঞানমনস্কদের ধারণা হল যা কিছুরই অস্তিত্ব আছে, তাই জানা যাবে, মাপা যাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে। একদিকে বস্তুজগৎ, অন্যদিকে মন-আত্মা-চৈতন্য : একদিকে আধিভৌতিক—আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্যদিকে আদিদৈবিক-সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে—এই দুয়ের মাঝে কিভাবে হয়েছে সমন্বয়। এ প্রশ্নের জবাব নিয়ে চিন্তাবিদরা হাজার হাজার বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন। দেকার্তে বল্লেন (১৫৯৬—১৬৫০), দুটোই সত্য, কিন্তু দুটো চলে সমান্তরালভাবে, তাই সমন্বয়ের প্রশ্ন নেই। পরবর্তী চিন্তাবিদদের কেউ গেলেন আদিদৈবিকের দিকে, সৃষ্টি করলেন নানা ভাববাদ। অন্যরা গেলেন আদিভৌতিকের দিকে, তৈরি হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদী বিজ্ঞান সারা জগতের সব রহস্য ভেদ করতে চাইল নানা রকমের কৌশল শিখে প্রকৃতিকে কব্জা করতে। কিন্তু মাথার ওপরে যদি স্রষ্টা থাকেন, কিভাবে সম্রাট হবে মানুষ? এই উপলব্ধিই বিজ্ঞানের নাস্তিকতার মূলে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা গেল বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিকর্তার দিকে ঝুঁকেছেন। দর্শনে দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আদিভৌতিক ও আদিদৈবিকের সমন্বয় এবং জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা) মন ও বস্তুর সমন্বয় করতে পারেনি। বিজ্ঞানের বস্তুবাদী তত্ত্ব মগজের নিউরণগুলির মিথষ্ক্রিয়াকেই মন বলতে চায়। কিন্তু ১৯৮১-র নোবেলজয়ী মার্কিন মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ রজার পেরি বলেন যে, মনের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে যা বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্য জীববিজ্ঞানীরাও আদিদৈবিকের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এই দ্বৈতবাদ সমন্বয়কামী। এদিকে পদার্থবিদরা দ্বৈতবাদ থেকে তুরীয় অদ্বৈতবাদের (transcendental monism) দিকে ঝুঁকেছেন। বস্তুবাদের ওপর প্রথম আঘাতটা ছিল আইনস্টাইনের। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী বস্তুকে তিনি স্পেসটাইমের ভাঁজ বানিয়ে দিয়েছিলেন, এই ভাঁজ-সৃষ্টির কারণ মহাকর্ষ। বস্তুকে নাকচ করার পর পদার্থবিদরা ক্রমশ চৈতন্যে গিয়ে পৌঁছলেন। এখন বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে, কণাগুলোও চৈতন্যময়। ঢেউ গতিবিদ্যার জনক এরভিন শ্রডিঙ্গার এই জগতব্যাপী চৈতন্যকে বহুখণ্ডে বিভক্ত না করে এক ও অখণ্ড ধরতে চাইলেন। পদার্থ বিজ্ঞানীরা জটিল তত্ত্ব ও জটিলতার অঙ্ক নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বস্তুজগত ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অখণ্ড পরমচৈতন্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। এটি কিভাবে সম্ভব হল তার কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা সংক্ষেপে করা যাক।

আগে ধারণা ছিল বস্তু ও শক্তি আলাদা। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন যে, ভর ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য এবং এরা আপেক্ষিক কিন্তু ক্রিয়া হল অনপেক্ষ। মহাকর্ষ নেহাতই একটি কল্পিত জিনিস। পুরো জগতটাই স্পেস-টাইমের গতিশীল ভাঁজ, এর বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবু আমরা এই রূপহীন জিনিসটাকে নানারূপে দেখি। এইভাবে আধুনিক পদার্থবিদ্যা বস্তু ও শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদন করে শেষে পুরোটাকেই অস্তিত্বহীন করে

www.pathagar.com

দিল। ১৯২৬ সালে জার্মানীর হাইসেনবার্গ দিলেন তাঁর অনিশ্চয়তা সূত্র। এই সূত্রানুযায়ী একটা কণার অবস্থান ও ভর বেগ দুটোই একই সঙ্গে নিখুঁতভাবে মাপা যায় না। একটা যত নিখুঁত হয়, অন্যটা অনিশ্চিত হয়ে যায়। এই নিয়ম শুধু কণাজগতের নিয়ম নয়, সাধারণভাবে এটা সমগ্র জগতের বেলায় খাটে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কোন কিছু জানা সম্ভব নয়। প্রকৃতির আচরণে কার্যকারণ সূত্র আবশ্যিক নয়, যদৃচ্ছভাবে ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি দ্বৈত বিশ্বের ধারণা দিলেন—একটি হচ্ছে বহু সম্ভাবনার সমষ্টি; অন্যটা হচ্ছে একটি মাত্র বাস্তব যা ছিল, সেই সম্ভাবনায় লীন। এটিকে না মেনে হিউ এভারেট দিলেন বহু বিশ্বের ধারণা অর্থাৎ সবকটি সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হয় কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা চতুর্মাত্রায়। বিজ্ঞানীর অবস্থান একটিমাত্র চতুর্মাত্রায়, তাই তিনি যখন দেখতে যান, তখন একটা বাস্তব পান, অন্যগুলো পান না।

জন বেল এবং ১৯৮২ সনে আস্পেক্ট পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে দেখলেন অনিশ্চয়তা সূত্র সত্য। প্রমাণিত হল, দুটো কণা একদা কাছাকাছি থেকে মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে পরে দূরে চলে গেলেও পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে। জগত সৃষ্টির সময় সব কণাই কাছাকাছি ছিল। পরে বহু দূরে (কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে) চলে গেছে। অতএব এখনও তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। একেই বলে ম্যাকের নীতি অর্থাৎ যে কোন একটি ঘটনা বাকি জগতকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে। এমনি কথা কিন্তু কুরআন ১৪০০ বছর আগেই বলেছে। শুধু একটি আয়াত নয়, ডজন ডজন আয়াত রয়েছে এ সম্পর্কে যার কিছু প্রবন্ধের প্রথম দিকে উদ্ধৃত হয়েছে।

কিভাবে জগতের একটা খণ্ডাংশ (কণা) বাকি সমস্তটাকে প্রভাবিত করে? এ কারণেই ডেভিড বোহম খন্ডের বদলে অখণ্ডকে স্বীকার করেছেন। এই অখণ্ড সত্তাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় বলে ফিল্ড-শূন্য ফিল্ড। কিন্তু দেখা গেল, এই শূন্য থেকে 'ভারচুয়াল' (অলীক) কণার দল আচমকা লাফিয়ে উঠে নেচে বেড়ায়, আবার ডুবে যায়। কণা হয়েও যা কণা নয়, তাই হচ্ছে ভারচুয়াল কণা, আস্তি ও নাস্তির মাপে তা ডিগবাজি খায়। মৌলিক বলগুলোর পরিবাহী-গ্লুওনগুলো হচ্ছে ভারচুয়াল কণা। যথেষ্ট শক্তি জোগালে এরা কণা হতে পারে। তাই এখন ভাবা হয় শূন্য—আসলে শূন্য নয়, আসলে এটা পূর্ণ (এনার্জি)। বাস্তব সবকিছুরই রূপান্তর ঘটে, কিন্তু নাস্তি কিভাবে অস্তি হয়? শূন্যটা আসলে পূর্ণ। কিন্তু তাঁর চরিত্র কি? এক অংশে আন্দোলন ঘটলে কিভাবে তা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয় সর্বত্র?

এ থেকেই বিজ্ঞানীরা এই পূর্ণ চৈতন্যময়তার ধ্বংস করেছেন, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের এখন একটি চেষ্টা শুরু হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়ে থাকে—তার নাম মানুষমুখী নীতি (anthropic principle)। এতে দেখানো হয় যে, জগতের সৃষ্টির বিভিন্ন সময়ে বহু সম্ভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ ও নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এভাবে বহু সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ঘটনা বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে মানুষ পর্যন্ত এসেছে। যদি একবারও এর ব্যতিক্রম হত, তবে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হত না। সত্যিই ত আল্লাহ্ যদি মুহাম্মদ (সা.)-কে সৃষ্টি না করতেন তাহলে তিনি সৃষ্টিই করতেন না। অধিকন্তু আল্লাহ্ ছিলেন নির্ব্যক্ত, তিনি ব্যক্ত (প্রকাশ) হতে চাইলেন, তাই ত প্রকাশ করলেন নিজকে, সৃষ্টি হল বিশ্বজগত, সর্বশেষে মানুষ অর্থাৎ প্রথম থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানুষমুখী, ক্রিয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য থাকে কর্তার মনে, কাজেই এই উদ্দেশ্যটা আল্লাহরই ছিল (See, The cosmology of life and mind : Synthesis of science and religion by George Wald, 1988, Novel Lauret of 1967)।

কিন্তু হিন্দু দর্শনের লীলাবাদের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। 'উল্টো বুঝলি রাম'। এখানে সৃষ্টিটা যেহেতু স্রষ্টার লীলা, কাজেই এতে উদ্দেশ্যে নিহিত নেই। ফলে হিন্দু দর্শন নির্ণয়বাদী নয়, যদৃচ্ছাবাদী (Randomistic) আমরা মুসলমানেরা উদ্দেশ্যবাদী বিশ্বাসী—কুরআন আমাদের এটা শিখিয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলো (কুরআন সমেত) বলে, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং আল্লাহ্ পাক সেটা করেছিলেন। কিন্তু বস্তুবাদীরা (মার্কস-লেনিনবাদী কমিউনিস্টরাসহ) বলতেন, বস্তুর রূপান্তর ঘটে, ধ্বংস নয়। বস্তু অনাদি ও অনন্ত। অতএব জগতের সৃষ্টি বা ধ্বংসের প্রশ্ন নেই। এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে এল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র। এই সূত্র অনুযায়ী কাজ করলে শক্তি ক্ষয় হয়। শক্তি ধ্বংস হয় না, কিছুটা শক্তি অপ্রাপ্য হয়ে যায় (এন্ট্রাপি)। যত কাজ হয়, এন্ট্রাপি তত বাড়ে। এভাবে এমন একটা সময় আসবে যখন পুরো শক্তিটাই অপ্রাপ্য হয়ে যাবে, তখন কাজও হবে না। ফলে জগতের তাপমৃত্যু ঘটাবে। কারণ রূপ ধারণ করার জন্যও শক্তি দরকার। সেক্ষেত্রে একদিন প্রাপ্য শক্তির পরিমাণ সর্বাধিক ছিল অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি হয়েছিল। জগত সসীম হলে তার জন্ম মৃত্যু আছে। এই সূত্র মার্কসীয় ও অন্যান্য বস্তুবাদীর প্রচুর গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী জগত অসীম, বস্তু ও গতি সদানিত্য। জগতের ধ্বংস নেই, শুধু প্রসারণ ও সংকোচন হয়।

এইসব দার্শনিক তর্কের মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করলেন, ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বস্তু যে নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব নয়, সেটা দেখাল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। স্থানকাল যে সসীম, তা দেখাল আপেক্ষিকতাবাদ। জগতের সৃষ্টির প্রমাণ যোগাল জ্যোতিঃপদার্থ বিদ্যা। ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল আবিষ্কার করলেন জগত প্রসারণশীল। এই প্রসারণ মহাকর্ষের বিরোধী, সুতরাং এটা এল কোত্থেকে? মহাজাগতিক ডিম ফেটে জগত সৃষ্টি হয়—এই তত্ত্ব হাবলের আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দিতে পারল। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় অতি ভয়ঙ্কর তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তু ছিল না, ছিল ছিল শুধু বিকিরণ আর নৃত্যরত কণার দল। পরে জগত আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রাথমিক বিকিরণ কি হারিয়ে গেছে? না, হারায়নি, তা ১৯৬৫ সালে পেনিজিয়াস ও উইলসন ধরতে সক্ষম হয়েছেন। প্রমাণিত হল জগত সসীম এবং তার জন্মমৃত্যু আছে। ১৯৯২ সালে মহাশূন্যে হাবল টেলিস্কোপ খুঁজে পেল ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়শান। তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে বর্তমানে মাত্র ৩ ডিগ্রী কেলভিন (অর্থাৎ শূন্যের নিচে মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রী কেলভিন হলে বিশ্বজগত তাপের অভাবে পরম শূন্য ডিগ্রীতে জমে গিয়ে মরে যাবে)। সে জায়গায় মাইনাস ২৭০ ডিগ্রী হয়ে গেছে, বাকী আছে মাত্র ৩ ডিগ্রী। সৌরজগতের বাইরে আন্তঃনাক্ষত্রিক মণ্ডলে অন্ধকার স্থানে এই হিম শীতল অবস্থা চলছে। প্লেনে করে ৫ মাইল ওপরে উঠলেই দেখা যায় মাইনাস ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস শীত।

www.pathagar.com

দেখা গেছে জগতের প্রসারণ বেগ মহাকর্ষের টানে ক্রমশ কমছে। কমতে কমতে প্রসারণ একদিন থেমে যাবে।' তারপর শুরু হবে মহাসঙ্কোচন। ব্যক্ত জগত অব্যক্তে পরিণত হবে। সংকোচন শেষ হবে শূন্যতে। অঙ্কশাস্ত্র তাই বলে। এত সাধের জগত এভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এটি মানতে বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা শূন্যের বদলে একটা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন—সিংগুলারিটি অর্থাৎ বহুবচন একবচন হবে। তাঁদের বক্তব্য এক বচন থেকে ঘুরে জগত আবার বহুবচনের দিকে এগোবে। এভাবেই বহু-এক-বহু, প্রসারণ-সঙ্কোচন-প্রসারণের চক্র চলতে থাকবে। এ চক্র অনাদি, অনন্ত। এই আজগুবি এক বচনকে মানলে ব্যক্ত জগত অব্যক্তে যায় না। প্রাপ্য শক্তি আবার সর্বোচ্চ না হলে পরবর্তী বিগ ব্যাংগটা হবে কি করে?

১৯৯৪ সনে ফ্রাঙ্ক টিপলার সপ্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, সেই অতীতকাল থেকে ধর্ম নামে অস্তিত্বমান এক কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোলের দিকেই বিজ্ঞান ধাবিত হয়ে চলছে। এই উক্তি তিনি করেছেন 'দি ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটিঃ মর্ডান কসমোলজি, গড এন্ড দি-রিসারেকশান অব দ্যা ডেড" (অবিনশ্বরতার পদার্থ বিজ্ঞান : আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব, আল্লাহ্ ও মৃতের পুরুত্থান) গ্রন্থে। টিপলার দাবি করেছেন সময়ের চূড়ান্ত বিভাজনে আমাদের এমন তথ্য ও কম্পিউটার শক্তি করায়ত্ত হতে পারে যার সাহায্যে মৃত সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটানো সম্ভব। তিনি বলেছেন, "ওমেগা পয়েন্টে" অর্থাৎ যেখানেই স্থান ও কাল শেষ হয়ে যায় সেই মুহূর্ত বা বিন্দুতে পৌঁছলে মৃত সকল মানুষই জেগে উঠবে। আল্লাহ্ আছেন, আছে বেহেশ্‌ত। টিপলারের গণনা অনুযায়ী সেই পুনর্জন্ম ঘটবে অবশ্যই কম্পুটারে অর্থাৎ ভারচুয়াল রিয়ালিটিতে। আর মানুষ মৃত্যুর পরে বেহেশ্‌তের অনুরূপ রাজ্যে জীবন কাটাতে পারবে।

ইদানিং আরো কিছু পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এক রোমহর্ষক সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন, এই জগতে যে সিংগুলারিটির সন্তান তার জন্ম হয়েছিল অন্য কোও বিশ্বে। সেখানে এক পারটিক্‌ল অ্যাকসিলারেটরে দুই কণার সংঘর্ষে। সেই বিন্দু থেকে এই বিশ্ব!! বিজ্ঞানী কিটি ফার্গুশন অন্যভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতির বিধি-নিয়ম বা সূত্রাবলীকে অগ্রাহ্য না করেও আল্লাহ্‌র পক্ষে এই বিশ্ব জগতে এমন কি ব্যক্তির জীবনেও হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব এবং সেটা সম্ভব বিজ্ঞানসম্মতভাবেই। পল ডেভিস যুক্তি দিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ বা কোন না কোন রকমের এক সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বই "গড এণ্ড দি নিউ ফিজিক্স" দিয়েই বিজ্ঞানীদের এই আল্লাহ্ চর্চা শুরু। তারপর ১৯৮৮ সনে স্টিফেন হকিং তাঁর 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' বলেনঃ আমরা যদি মহাবিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব খুঁজে পাই তাহলে সেটা হবে মানুষের যুক্তি বা বিচারশক্তির চূড়ান্ত বিজয়। কেননা তখনই আমরা আল্লাহ্‌র মনকে যথার্থ অর্থে জানতে পারব। ডেভিস ১৯৯২ সালে লেখেন 'দি মাইন্ড অব গড', লেডার ম্যান লিখলেন 'দি গড পার্টিকেল', ১৯৯৪ সনে ফার্গুসন লিখলেন, 'দি ফায়ার ইন দ্যা ইকুয়েশানস : সায়েন্স, রিলিজিয়ন এন্ড দ্যা সার্চ অব গড।'

www.pathagar.com

পদার্থ বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন স্বয়ম্ভূ বিশ্বের কথা যা কুরআনে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। লেডারম্যানের বইয়ের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'হিগ্‌স কণা' যার সন্ধান এখনও মেলেনি। অথচ পদার্থ বিজ্ঞানীদের মনে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন দ্বিধা নেই। নানারকম কণার ভর কেন নানারকম হয়, তার রহস্য বিজ্ঞানীদের জানা নেই। একটা ইলেকট্রনের ভর কেন কোনও একটি কোয়ার্কের ভরের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, তার কোনও কারণ জানা নেই। অদ্যাবধি। মনে হয় প্রকৃতি যেন একেকটা কণাকে একেক রকম ভর দিয়ে রেখেছে খেয়ালখুশি মত এই রহস্যময় ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানী পিটার হিগস দিয়েছেন 'হিগস ফিল্ডের ধারণা। কোন কণা যেমন ইলেকট্রিক চার্জ পায় ইলেকট্রন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্য দিয়ে চলার সময়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন কণাও তাদের ভর লাভ করে হিগ্‌স ফিল্ড-এর মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটার সময়। আর ওই হিগ্‌স ফিল্ড-এর সমুদ্রে উপস্থিত কণাই হল হিগ্‌স পারটিকল। তাই হিগ্‌স কণাই আপাতত 'গড পারটিকল'। সত্যিই আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, দেশকাল কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক দিয়ে তৈরি। দেশ কোন স্থান নয়, সময় কোন মুহূর্ত নয়, নৈর্ব্যক্তিক এককের সমষ্টিমাত্র। এরই মধ্যে রয়েছে কোয়ান্টাম চরিত্র। এমনও হতে পারে যে, বস্তুগ্রাহ্য বিশ্ব আমাদের সাধারণ ধারণার দেশকাল ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত। এর সামান্যতম কিছু এককমাত্র একটা নিয়ন্ত্রকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে। সমুদ্রসদৃশ আরও অসংখ্য একক রয়েছে অন্যত্র। তাহলে আমাদের সীমিত দেশকালের বাইরে সেই অনন্ত সমুদ্রে কি আত্মার যথার্থ বাসস্থান? কেননা আত্মার তো কোন আয়তন নেই।

কোয়ান্টাম কসমোলজীতে বৈজ্ঞানিকেরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের বিশ্বের অনুরূপ বিশ্ব আছে। প্রতিটি বিশ্বই বাস্তবিকভাবে সত্য। তবে বিভিন্ন বিশ্বের অধিবাসীদের দর্শন ভিন্ন রকম হতে পারে। জগত যখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়, মানুষের মনও সেই সঙ্গে বিভক্ত হয়ে যায়। যাঁরা বলেন যে, বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তাঁরা অনুভব করতে পারেন না, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ওটাও বুঝতে পারেন না। এই পৃথকীকরণ হামেশাই ঘটে চলেছে। প্রতিটি অনু পরমাণুর নৃত্যছন্দে এই পৃথকীকরণ ঘটে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে অসংখ্যবার বিশ্বজগতের প্রতিলিপিকরণ ঘটছে। এটা ধরার জন্য কোন পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই। অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সঙ্গে বৃহৎ বস্তুজগতের প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়া ঘটছে। সত্যের স্বরূপই রয়েছে এই অনন্ত পৃথকীকরণের মধ্যে।

অন্যান্য যে বিশ্ব রয়েছে, তা দেখতে কি রকম? আমরা কি সেই সব বিশ্বে যেতে পারব? না, বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের দেশকালের পথ ধরে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। বিভক্ত বিশ্ব যত দূরে সরে যাচ্ছে ততই আমাদের সাথে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্বে জীবের অস্তিত্বও বিভিন্ন প্রকার। এসব বিষয়ে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য সময়ের রহস্যের মধ্যে ডুব দিতে হবে। একদিকে থেকে দেখতে গেলে আমরা সবাই সময়ের পিঠে চেপে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু এই ভবিষ্যতে কেউ আমাদের অনেক আগেই গিয়ে পৌঁছুতে পারে। এই পারার কারণ সময়ের সংকোচন-

www.pathagar.com

বিকোচনশীলতা। যেমন একই বয়সের দুই ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেল ভবিষ্যত বার্ধক্য কারো ক্ষেত্রে আসছে আগে, কারো পরে। সময়ের গতিতে লাগাম পরিয়ে কেউ তাকে অনেকটা কম গতিসম্পন্নকরে তুলতে পারে। আবার কেউ হয়তো কয়েক ঘন্টার মধ্যে দু'হাজার বছর স্পর্শ করতে পারে। **আলোর গতির কাছাকাছি এলেই সময়ের বুনন ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য কেউ যদি সময়ের গতিও অতিক্রম করতে যায়—তাহলে সময়ের অভ্যন্তরস্থ সবকিছু বাইরে চলে আসবে।** বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আজ এসব কথা বলছে। এ যেন মহানবীর মি'রাজের তাৎপর্য—ব্যাখ্যা করার জন্যই কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্বের এই ব্যাখ্যার অবতারণ।

পদার্থবিদদের মতে, বহির্বিশ্বের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। কোন কিছুকেই পরিবর্তিত করা যায় না। 'স্বাধীন ইচ্ছা' শব্দটি একটি ধোঁকা মাত্র। ভবিষ্যত এখনি আছে এমন হতে পারে না। আণবিক স্তরে ঘটনাপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে, এর জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। সময়ের প্রবাহে প্রতিটি বিন্দুতে ঘটনা ঘটে চলেছে। এর মধ্যে কতকগুলো ঘটনার পেছনে কারণ আছে। কারণ থাক বা না থাক সবই আছে। সুতরাং যথার্থ অর্থে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। আধুনিক কসমোলজি-দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের বিশ্ব নিত্যদিন দেশের বুকে নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই দিগন্তের ওপর থেকে নিত্যদিন নানা প্রভাব এসে জগতের ওপর পড়ছে।

আমাদের মন এই বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মনের ক্রিয়া এই স্থূল বস্তুজগতে ঢুকে পড়ে একে প্রভাবিত করতে পারে। এখন প্রশ্ন হল: মনকে কিছু একটি করতে, চিন্তা করতে নির্দেশ কে দেয়? মানুষের যদি স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে তাহলে স্রষ্টারই বা থাকবে না কেন? স্রষ্টা যদি নিজের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে তার সব ইচ্ছাই অবশ্য পূর্ণ হবে। তিনি মানুষকে তাঁর (স্রষ্টার) পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করতে দিতে পারেন যদি অবশ্য তেমন ইচ্ছে তাঁর হয়। অণুপরমাণুকে তিনি কোয়ান্টাম সূত্রে বিশ্বজগতে আকস্মিকতার খেলা খেলবারও সুযোগ দিতে পারেন। সর্বশক্তিমানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার যে ধারণা, মানুষের ক্ষেত্রেই সেই ধারণা ভিন্নতর। মানুষ যা ইচ্ছা তাই করবার ক্ষমতা তার নেই। আসলে মানুষের ক্ষমতা সীমিত। সীমিত ক্ষেত্রেই শুধু সে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। অপরপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। মানুষ ভবিষ্যতকে জানতে পারে না। সুতরাং সমস্যা প্রায় দুরতিক্রম্য। কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও আপেক্ষিকত্ত্ব যত কিছুই চমকপ্রদ তত্ত্ব আমাদের জানিয়েছে (সবগুলোই কুরআনে আছে) তার চেয়ে বহু প্রশ্নের জবাব অনুত্তরই রেখেছে। হয়তো সময় সম্পর্কে আমাদের ভাবী জ্ঞান আমাদের অস্তিত্বের ওপর নতুন আলোকপাত করবে।

অনিশ্চয়তাবাদের উদ্ভাবক হাইজেনবার্গ বলেছেন যে, বস্তুসত্তাকে ভাঙতে ভাঙতে যত ক্ষুদ্র উপাদানই আমরা আবিষ্কার করি না কেন জগতের মৌল উপাদানের সাক্ষাৎ এখনও আমরা পাইনি; বরং বস্তুর এই সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিভাজন আমাদের কার্যে অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককেন্দ্রিক একটি ধারণা এ ব্যাপারে অনেকটা সহজ উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছে।

www.pathagar.com

বিশ্বজগত শৃঙ্খলাবদ্ধ-কঠোর নিয়মকানুন গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ। গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত এই নিয়মানুবর্তিতা বিদ্যমান। সৌর জগতে অদ্ভুত ছন্দ বর্তমান। জীবকোষের মধ্যেও ছন্দের অভাব নেই। বৃহৎ জগতে রয়েছে একটি সার্বিক ছন্দ। সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম ছন্দ। সূক্ষ্ম জীব-সত্তার মধ্য দিয়ে যেন একটা বিচিত্র ছন্দ নেচে নেচে চলেছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের দিকে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন একটা অদ্ভুত ছন্দ ধরে রেখেছেন। সূক্ষ্ম আণবিক জগতেও এই সুর-ছন্দের অভাব নেই। কী এক প্রচণ্ড আনবিক শক্তি অণুগুলোকে ধরে রাখছে। নিউট্রন ও প্রোটনকে এই প্রচণ্ড নিউক্লিয়ার ফোর্স বেধে রেখেছে। এই প্রচণ্ড শক্তির জন্যই নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) ভাঙতে হলে প্রচুর তেজের দরকার হয় (পরমাণু কণা)। এ কথা সব সময়েই স্বীকৃতি পেয়েছে যে, প্রকৃতির গঠনশৈলীতে সিমেট্রির (সংমিতি) একটা বিষয় মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। সাব-নিউক্লিয়ার বা সাব-আণবিক জগতের চরিত্র অনুসন্ধানকালে বৈজ্ঞানিকদের মনে এই ধারণাই জন্ম নিয়েছে যে, প্রাকৃতিক সর্বপ্রকার জটিলতার অন্তরালে কোথাও একটি সহজ ভাব আছে।

বিজ্ঞানের সামনে এখন এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হল শক্তি ও সময়ের। এই দুটি ধারণাকে একত্রে যুক্ত করার চেষ্টা হলে এই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে—Know one and you unknow the other? বৃহৎ জগতে আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপ (স্থিরীকৃত) দেখি। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে ক্ষুদ্র বিশ্বে শক্তিশূন্যতা থেকে যেন অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার তেমন করেই মিলিয়ে যায়! এর কার্যকারণ পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্ততা—বিজ্ঞানীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এখন সত্যিই দেখা যাচ্ছে বস্তুসত্তাসম্পন্ন পার্টিকেল বাইরের কোন প্রভাব ছাড়াই সৃষ্টি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র বিশ্বে হঠাৎ শক্তির আবেগ উড়ন্ত ইলেকট্রন পজিট্রন যুগলের সৃষ্টি করছে অল্পক্ষণের জন্য। এই সব ভৌতিক আবির্ভাবের সার্বিক সম্মেলন দেশ (Space)-কে একটি গতিশীল ধূম্রাকার অবাস্তবিক অস্তিত্ব দান করছে। এই নিঃশেষ কার্য প্রবাহের মধ্য দিয়েই অণু-পরমাণুগুলি যেন সাঁতরে বেড়ায় (Higgs Field)।

একটি ইলেকট্রন এ সব ভৌতিক অনুষঙ্গী ছাড়া একা থাকতে পারে না, (আল্লাহ্ জোড়ায় জোড়ায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন)। এই জোড় বাঁধার শক্তি বা ইলেকট্রনের ভেতরের হার্ট স্পিনের পরস্পর বিপরীতমুখী চলাতেই (এদের সার্বিক অবস্থাই) এদের গতি সঞ্চার করে। এ থেকে এই ধারণাই স্পষ্ট হয় যে, বস্তুগ্রাহ্য প্রকৃতির কোয়ান্টাম অবস্থায় একটা সার্বিক ভাব (holistic flavour = God) আছে। প্রতিটি জিনিসই অপরের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, অথচ ঐক্যের মধ্যে ক্রমধারার একটা সাংগঠনিক অবস্থাও বিরাজ করছে। এই সার্বিক অবস্থার মধ্য থেকেই পদার্থবিদরা বস্তুর মৌল উপাদান খুঁজবার চেষ্টা করছেন। এই সর্ব সত্তার একক উৎস জানার জন্য নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। বস্তুত বিজ্ঞানীরা বস্তুর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যা পেয়েছেন তা **এই যে, উৎসে বস্তু বলে কিছু নেই—আছে শক্তি।** মহাশূন্যের বুকে শক্তির নৃত্য থেকেই পার্টিকলরূপে বস্তুর উপাদান ফুটে উঠে ডুবে যাচ্ছে। অনন্ত এই লীলার মধ্যে থেকেই অণু-পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগে একটি ধোঁয়াটে ধরনের সার্বিকতা তৈরি হচ্ছে এবং তার মধ্য থেকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে অণু-পরমাণু বস্তুসত্তা সৃষ্টি করছে, যা নাকি তুলনামূলকভাবে স্থায়ী বিশ্বের রূপ নিচ্ছে।

www.pathagar.com

এই যে, বিশ্বসৃষ্টি, এখন প্রশ্ন, এর পেছনে কোন সুপরিকল্পনাসম্পন্ন চিৎশক্তি কাজ করছে, না অকস্মাৎই জগত ফুটে উঠছে? বৃহৎ বিশ্বে নিয়মের শৃঙ্খলা দেখে ধারণা হয় সৃষ্টির পেছনে কোন চিৎসত্তা অবশ্যই আছে যাকে বলা যেতে পারে আল্লাহ্। অপর পক্ষে অণু-পরমাণুসমূহের পারস্পরিক সংযোগ, নির্বাচন, প্রত্যাখ্যান প্রভৃতিই যে সৃষ্টির আদিতে কাজ করেছে এবং এখনও করছে, অনেকে সে রকমও মনে করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগ একটা অঙ্গ-শক্তির ঠেলাতেই অকস্মাৎ সৃষ্টির উপাদান তৈরি করেছে (জৈব ও অজৈব বৃহত্তর দেহ)। তারপর তাপগতির স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে জগৎ একটা ছন্দময় শৃঙ্খলায় চলে এসেছে। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাও দেশের বুকে মহাশক্তির স্বাভাবিক পরিণতি।

এর পেছনে অনেকে স্রষ্টার উপস্থিতি দেখেন না, যেহেতু অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে যে, জগতে অধিকাংশ সময়েই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কেটে যায়; সেখানে কোন সাংগঠনিক শৃঙ্খলার বালাই-ই নেই। তবে মাঝে মধ্যে কোটি কোটি বছরের জন্য সেখানে আকস্মিক শৃঙ্খলা দেখা দেয়। সৃষ্টি এখানে একটি রূপায়িত ভঙ্গিতে একবার ফুটে উঠে নিবে যায়। এখানে জীবন বিশেষ একটি বাস্তব অবস্তার সুযোগেই আত্মপ্রকাশ করে।

চৈতন্যের উদ্ভবও একটি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই। মহাবিশ্বের ধূম্রাকৃতি অণু-পরমাণুসমূহ যেভাবেই হোক কোথাও এমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পড়ে যায় যে, বস্তুকণাসমূহ সেই প্রবল আকর্ষণে কোথায় যে হারিয়ে যায় তার আর হদিস পাওয়া যায় না। সেই স্থান জুড়ে থাকে একটি কৃষ্ণগহ্বর।

এ সব দেখে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করছেন বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। এখানে একটি স্বভাবের খেলাই মাত্র বিদ্যমান। স্বভাবে সৃষ্টি, স্বভাবেই লয়। এমন ধরনের মতবাদী বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। মার্কসীয় দর্শনের পতন হয়েছে। বস্তুবাদীদের চিন্তাধারায় ফাটল ধরেছে। আরো কিছু পরীক্ষার প্রমাণ পাওয়া গেলে এইসব নাস্তিক্যবাদীরা হারিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের আলোচনা এজন্য সম্ভব হয়েছে, কারণ আপাতদৃষ্টিতে যে বিশ্বজগতে আমরা বাস করি তা একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ জগত। অঙ্কের সহজ গতি অনুসারে এটা চলছে। বিজ্ঞানের কাজ হল এ বিষয়ে চর্চা করে এই শৃঙ্খলার চরিত্র আবিষ্কার করা—কিভাবে কি হয়েছে সে প্রশ্ন করা নয়। তর্ক দ্বারা এটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য যে, আল্লাহ্ একই সঙ্গে সর্বশক্তিমান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছেন। তাই ধর্মগ্রন্থে, বিশেষ করে হাদীসে নিষেধ করে দেয়া আছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করবে না, কেননা এটি মানব মস্তিষ্কের বোঝার বাইরের ব্যাপার। মানুষ কেবল আল্লাহর সিফাত বা প্রকাশজাতের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে পারে। বেদান্তদর্শন অনুযায়ী পরমজ্ঞান প্রসারণশীল, যত জানার চেষ্টা করা যায়, ততই তা বেড়ে যায়। এজন্য এর নাম হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মা-যা বর্ধিত হয়। আর এর প্রতিশব্দ হল বিশ্ব, জগৎ, সংসার। বিশ্ব অর্থাৎ সব। সবকিছুই যার অন্তর্ভুক্ত। তাই বিশ্ব। কার্ল সাগানের ভাষায় "The cosmos is all that is as even was or even will be" অর্থাৎ যা চলমান, সম্পর্ণ জগৎ এবং তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই সব সময় গতিশীল। ধর্মতত্ত্ববিদেরা জাগতিক শৃঙ্খলা দেখে বলতে চান যে, এটাই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ

www.pathagar.com

করে। এরকম হলে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ঈশ্বরের (God) কার্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

আরো অনেক বছর কেটে যাবে, বিশ্বজগতের রহস্য বুঝতে। সেদিনই অমুসলিম জগত মি'রাজের সত্যতা বুঝতে পারবে। বিজ্ঞান যে ঐ দিকেই মুখ নিয়েছে এতক্ষণ এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচিত হল। উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের ডজন খানেক বই পড়লেই এটি বোঝা যাবে। বাংলায় জাহান মিয়া, মেজর কামাল ও আশরাফুল কাদেরের তিনটি বই রয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য মি'রাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার। এই প্রচেষ্টাগুলো আশাব্যঞ্জক। অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে গবেষণার মাধ্যমে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ বোঝবার জন্য তাগিদ রয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধকার বিশ্বাস করেন যে, কোন একটি অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন মহাকাশযানে করে মহানবী (সা.)-এর মি'রাজ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের পেছনে কারণ হচ্ছে তিনি এমনটিই একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন। দীর্ঘ একুশ বছর আগে আরেকটি স্বপ্নের পর এই প্রশ্নটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল। মহানবীকে দেখা স্বপ্ন যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে নিবন্ধকার আমৃত্যু এই বিশ্বাস নিয়ে থাকবেন। মি'রাজে মহানবী (সা.) স্রষ্টার ও সৃষ্টির নিগূঢ় সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেকের মি'রাজ তার নিজের সঙ্গেই রয়েছে। দরকার শুধু ধ্যান ও সাধনার।

বাকী রয়েছে আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম সূত্রের বাইরে এমন এক "সব কিছুর সূত্র" যাতে প্রমাণ হবে God does not play dice. সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবেই চলছে স্রষ্টার হুকুমে। এখানে Chaos ও একটি শৃঙ্খল (Chain) মাত্র।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও বিজ্ঞান

১২.১ : ধর্মমুখী বিজ্ঞান নাকি বিজ্ঞানমুখী ধর্ম?

পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা কি ইদানীং ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন? ষাটের দশক থেকে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে তারা ব্যস্ত রয়েছেন। ঈশ্বরের মন-মানস, বুদ্ধিবৃত্তি, চেতনা এবং মৃতের পুনরুত্থানের মত বিষয় নিয়ে তারা কিছু তত্ত্ব হাজির করেছেন। কোন সচেতন পাঠকন বিজ্ঞানী মহলের এ নতুন চিন্তার ঘ্রাণ পাবেন যদি তিনি পাশ্চাত্যের বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারেন।

শুধু বিশ্বাস বা উপলব্ধির ব্যাপার নয়, বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিকগুলোর আলোচনায় মেটাফর হিসেবে ঈশ্বর যে হতে পারেন চমৎকার এক চিত্র, সেটা টের পান ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী পল ডেভিস। আর ১৯৮৩ সালে লেখেন তাঁর অসামান্য জনপ্রিয় বই 'গড এন্ড দ্যা নিউ ফিজিক্স'। ডেভিসের মতে, "মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞান যে এ বিশ্বে মানুষের অবস্থান অনুধাবনে এক নতুনতর পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে, সে ধারণা ক্রমশ বাড়ছে বলে আমার মনে হয়। আমাদের অস্তিত্বের গভীর প্রশ্নগুলো—যেমন, এই ব্রহ্মাণ্ড কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল অথবা কেমন করে ক্ষয় হবে একদিন? পদার্থ আসলে কি? প্রাণের স্বরূপ কি? মন কাকে বলে?—এসব মোটেই নতুন নয়। নতুন কথা হল এইটি যে আমরা হয়ত এখন ওসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার অবস্থায় এসেছি। এই আশ্চর্যজনক সম্ভাবনার মূলে রয়েছে ভৌত বিজ্ঞানের পদার্থ বিজ্ঞান শাখায় নব্য ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের চমৎকার কিছু সাম্প্রতিক আবিষ্কার। সম্ভবত এই প্রথম মুল সৃষ্টির একটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হাতে আসছে আমাদের। বিশ্বসৃষ্টির চেয়ে গুরুতর ও কঠিনতর সমস্যা বিজ্ঞানে আর নেই। এটা কি অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ বিনা সম্ভব? কিছু-না-দিলে কিছু-মেলে-না—এই যে প্রাচীন ধারণা, তার ত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছে কোয়ান্টাম ফিজিক্স। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন স্বয়ম্ভূ বিশ্বের কথা—এমন এক ব্রহ্মাণ্ড যা আবির্ভূত হয়েছে আপনা আপনি, ঠিক যেমন কিছু প্রচণ্ড এনার্জি-নির্ভর বিক্রিয়ায় কখনও-কখনও একটা কণা শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়।"

তবে বিজ্ঞানী মহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে যে নতুন মাতামাতি শুরু হয়েছে তার জন্ম ১৯৮৮ সালে। বলা যায়, ঠিক এসময় থেকেই ঈশ্বর বা পরলোক নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। স্টিফেন হকিং-এর **"সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"** এতসদংক্রান্ত আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। বইটির শেষ বাক্যটি হচ্ছে, "আমরা

www.pathagar.com

যদি সেই উত্তরটি (মহাবিশ্বের একটি পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব) খুঁজে পাই তাহলে সেটা হবে মানুষের যুক্তি বা বিচার শক্তির চূড়ান্ত বিজয়—কেননা তখনই আমরা ঈশ্বরের মনকে যথার্থ অর্থে জানতে পরাব।"

হকিং-এর উক্ত বইটির পর পল ডেভিসও ১৯৯২ সালে *'দ্যা মাইন্ড অব গড'* নামে একটি বই বের করেন। এতে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন 'সায়েন্স এন্ড দি সার্চ ফর আলটিমেট মিনিং' হচ্ছে—থিওরি অব এভরিথিং। এটি হাতে এসে গেলে বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রতিভাত হবে একটিমাত্র নিয়মে। তিনি মনে করেন 'এই বিশ্ব উদ্দেশ্যহীন একটা দুর্ঘটনা মাত্র নয়, বরঞ্চ এটি এমন একটা আশ্চর্যজনক কুশলতায় রচিত যার পেছনে গভীরতর একটা ব্যাখ্যা (গড) নিশ্চয়ই আছে।'

'দ্যা ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' (১৯৭৭) এর লেখক নোবেলজয়ী ওয়েনবার্গ তার নতুন **'ড্রিমস অব এ ফাইনাল থিওরি'** লিখতে গিয়ে (১৯৯২) ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছেন ওই ফাইনাল থিওরি বা 'থিওরি অব এভরিথিং-এর প্রসঙ্গেই। তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে কোনও পরিকল্পনা দেখতে পান না। উদ্দেশ্যবিহীন থাকে তাঁর কাছে সবকিছু। বিজ্ঞানের নিয়মাবলী—তাকে ঈশ্বর বা অন্য যে নামেই ডাকা হোক না কেন—ওয়েনবার্গ জানাচ্ছেন, সে আমাদের কথা ভাবে না। ১৯৯৩ সালে অপর নোবেলজয়ী লিও লেডারম্যান লিখলেন *'দি গড পার্টিকেল'*। প্রতিপাদ্য 'হিগস' কণা, যার সন্ধান এখনও মেলেনি, অথচ পদার্থ বিজ্ঞানীদের মনে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন দ্বিধা নেই—ঐ কণার সন্ধান মিললে উন্মোচিত হবে বহুকালের একটা রহস্য, পদার্থের ভর-রহস্য। নানারকম কণার ভর কেন বিভিন্ন তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। একটা ইলেক্ট্রনের ভর কেন কোনও একটা কোয়ার্কের ভরের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ তার কোনও কারণ নেই। মনে হয় প্রকৃতি যেমন একেকটা কণাকে একেক রকম বর দিয়ে রেখেছে খেয়ালখুশি মতো। মনে হয় বিশ্ব সমুদ্র ফিল্ড (হিগ্‌স ফিল্ড) এর মধ্য দিয়ে চলার সময় বিভিন্ন কণা তাদের ভর লাভ করে। তাই হিগস কণাই 'গড পার্টিকেল।

১৯৯৪ সালে হকিংয়ের জীবনীকার কিটি ফার্গুসন প্রকাশ করলেন *"দ্যা ফায়ার ইন দি ইকুয়েশানস—সায়েন্স, রিলিজিয়ন এন্ড দ্যা সার্চ ফর গড"*। ১৯৯৫ সালের ফ্লোরিডার ফ্রাঙ্ক টিপলার *"দি ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটি : মডার্ন কসমোলজী, গড এন্ড দি রিজারেকশন অব দ্যা ডেড"* নামে এক পুস্তকে বললেন, মহাবিশ্বের সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের আবির্ভাবের একটা যোগসূত্র রয়েছে (কসমোলজিক্যাল অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপ্‌ল)। সেই সূত্রের কথা হচ্ছে : মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে এই জন্য যে, আমরা যেন তথায় থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবলোকন করতে পারি। টিপলার তাঁর বইয়ে গাণিতিক প্রমাণ দিয়েছেন এমন : সময়ের চূড়ান্ত বিভাজনে আমাদের এমন তথ্য ও কম্পিউটার শক্তি করায়ত্ব হবে যার সাহায্যে মৃত সকল মানুষের "পুনরুত্থান" ঘটানো সম্ভব হবে। সেটা হবে "ওমেগা" পয়েন্টে, যেখানে স্থান ও কাল শেষ হয়ে যায়। সেই মুহূর্ত বা বিন্দুতে পৌঁছলে মৃত সকল মানুষই জেগে উঠবে।" একেবারে ধর্মগ্রন্থের কথা। টিপলার বলতে চান *যে থিওলজি বা ঈশ্বরতত্ত্ব হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানেরই শাখা এবং পদার্থবিজ্ঞানীরা গাণিতিক হিসেব নিকেশের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন।*

www.pathagar.com

পল ডেভিস যুক্ত দিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে *ঈশ্বর বা কোন না কোন রকমের এক সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে।* এই মহাবিশ্ব কত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। তাই তিনি দেখছেন ঈশ্বরের মন কতখানি বিজ্ঞানমুখী। সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের মধ্যে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির (intelligence) অস্তিত্ব তিনি পেয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও ভাবনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকাল, ও মৃতের পুরুত্থানের মতো বিষয়গুলো যেভাবে আসছে তাতে করে নাস্তিকরা প্রমাদ গুনছেন। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিজ্ঞানকে এতদিন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার ধার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, এত সবের মানে কি এই যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধমূলক সম্পর্ক মুছে গিয়ে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়ের সৃষ্টি হয়েছে?

আদিম মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় ছিল। সেদিন প্রকৃতির সব খেলাই তার কাছে ছিল অলৌকিক। প্রকৃতির রুদ্ররোষকে তুষ্ট করতে সবাইকেই সে দিত পূজার অর্ঘ্য। মধ্যযুগে ধর্মের আবির্ভাব হল। সন্দেহবাতিক কিছু মানুষের প্রশ্নের ফলে প্রকৃতির অলৌকিক ব্যাপারগুলোর কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ফলে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার সঙ্গে সংঘাত লাগল নতুন পাওয়া জ্ঞানের। শুরু হয়ে গেল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। তখন মানুষের জ্ঞান বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত। ইউরোপে শুরু হয়েছে রেনেঁসা। বিজ্ঞানমনস্কদের ধারণা হল যা কিছুরই অস্তিত্ব আছে তাই জানা যাবে, তাই মাপা যাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই পজিটিভজম তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান সবকিছুরই জবাব খুঁজতে চাইল। একদিকে বস্তুজগৎ, অন্যদিকে মন-আত্মা-চৈতন্য; একদিকে আধিভৌতিক—আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্যদিকে আধিদৈবিক—সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। কীভাবে হয়েছে সমন্বয়? এর সমাধান খুঁজতে ব্যস্ত হলেন তখনকার চিন্তাবিদরা।

এলেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) তাঁর দ্বৈতবাদ নিয়ে। তিনি বললেন, আধিদৈবিকও সত্য, আধিভৌতিকও সত্য, কিন্তু দুটো চলে সমান্তরালভাবে, একটার সঙ্গে আরেকটির কোনও সম্পর্ক নেই; তাই তাদেরকে সমন্বয়ের কোনও প্রশ্ন নেই। পরবর্তী চিন্তাবিদদের কেউ গেলেন আধিদৈবিকের দিকে, সৃষ্টি করলেন নানা রকমের ভাববাদ। অন্যরা গেলেন আধিভৌতিকের দিকে, তৈরি হল বস্তুবাদ। এর দুটি শাখা-ব্যাষ্টিবাদ ও সমষ্টিবাদ। বস্তুবাদীরা মনে করল দেহটা যেহেতু যন্ত্র, তাই সেটাকে অমিতভোগের কাজে লাগান যাক। কিন্তু রসদের পরিমাণ যে অসীম নয়। কাজেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ ঢোকানো হল সমাজতত্ত্বে। বলা হল, শুধু শ্রেষ্টরই আছে টিকে থাকার অধিকার, দুর্বলেরা চুলোয় যাক। হিউম, বার্ক, রুশো, হার্বার্ট স্পেনসার এরা ছিলেন এই পুঁজিবাদ দর্শনের প্রবক্তা। এই ব্যাষ্টিবাদের বিপরীতে গড়ে উঠল মার্কসীয় সমষ্টিবাদ, যা ব্যক্তিকে করতে চাইল সমষ্টি বা রাষ্ট্রের অধীন। 'বাঁচার লড়াই' না হতে দিয়ে এই দর্শন সুযোগ-সুবিধার সমবন্টনের দায়িত্ব দিতে চাইল রাষ্ট্রের হাতে। বস্তুবাদী বিজ্ঞান সারা ব্রহ্মাণ্ডের সব রহস্য ভেদ করতে চাইল, চাইল প্রকৃতিকে কব্জা করতে। কিন্তু মাথার ওপরে যদি স্রষ্টা বা ঈশ্বর থাকেন, কীভাবে তাহলে সম্রাট হবে মানুষ? এই উপলব্ধিই বিজ্ঞানের নাস্তিকতার মূলে।

www.pathagar.com

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে। ধর্মীয় শোষণের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে ঈশ্বরের ধারণাটা কেন দরকার হয়েছিল মানুষের? দুটো কারণ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। বিপদের সময় কারোর সাহায্য চেয়ে মনের জোর বাড়ানোর জন্য কিংবা দুঃখজর্জর দিনগুলোতে কারোর কাছে শোকের বোঝা হাল্কা করে দিয়ে সান্ত্বনা পাবার জন্য ব্যক্তি-মানুষের দরকার হয় ঈশ্বরের ধারণার। আবার সমষ্টিগত পর্যায়ে মানুষের বন্য স্বভাব ও রিপুগুলিকে বশে না রাখতে পারলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। আইন দিয়ে সবটা সম্ভব নয়, কারণ আইনকে লোকে ফাঁকি দিতে চায়। তাই এমন একটা পদ্ধতির দরকার হয়েছিল যা লোক ফাঁকি দিতে চাইবে না। তাই দরকার হয়েছিল ভগবানের, যিনি দোষ করলে শাস্তি দেবেন, ভাল কাজ করলে পুরস্কার দেবেন—ইহলোক বা পরলোক। এই পাপ-পুণ্য তত্ত্বই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে ছিল মরালিটিতে। বিপদ বা দুঃখের সময় যার যেগুলো বন্টনের জন্যে ভগবানের দরকার পড়ে না, তিনিই নাস্তিক। নাস্তিকতা বা আস্তিকতা দুটোই বিশ্বাস মাত্র। এর সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কত মূল প্রশ্নটার সম্পর্ক নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডার অনুযায়ী ভগবান বা ঈশ্বরের ধারণা প্রাসঙ্গিক কি? হলে এখনকার জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাইলে সে ধারণা কীরকম হবে? দর্শনে দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব টানতে হয়েছিল আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সমন্বয় এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাখ্যাতে। এই দুই প্রসঙ্গের বর্তমান অবস্থা দেখা যাক।

দেকার্তে মন ও বস্তুর সমন্বয় করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন, এ দুটো আলাদা পরস্পর-নিরপেক্ষ। অথচ আজকের বিজ্ঞানে বলে অন্য কথা। ১৯৮১-র নোবেলজয়ী রজার পেরির (মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ) মতে, বিজ্ঞানের বস্তুবাদীতত্ত্ব মগজের নিউরনগুলির মিথষ্ক্রিয়াগুলিকেই মন বলতে চায়। তবুও মনের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে যা বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের তালেবর গবেষকরা বস্তুগত অদ্বৈতবাদ ছেড়ে আবার দ্বৈতবাদের দিকে ফিরে যেতে চাইলেন। আধিদৈবিকের আলাদা অস্তিত্ব তাঁরা আর অস্বীকার করতে পারছেন না। তবে এই দ্বৈতবাদ সমন্বয়কামী, এটি দেকার্তের সমান্তরাল দ্বৈতবাদ থেকে আলাদা। পদার্থ বিজ্ঞানীরা ক্রমশ ঝুঁকে পড়েছেন তুরীয় অদ্বৈতবাদের (Transcendental Monism) দিকে। বস্তুবাদের উপর প্রথম আঘাতটি ছিল আইনস্টাইনের। তিনি তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী বস্তুকে স্পেস-টাইমের ভাঁজ বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভাঁজ-সৃষ্টির কারণ মহাকর্ষ; We may therefore regard matter as being constituted by the regions of space in which the field is extremely intense ... there is no place in this new kind of physics both for this field and matter, for this field is the only reality. অর্থাৎ matter বলে আর কিছু রইল না; তা হয়ে গেল ফিল্ড।

বস্তুকে নাকচ করবার পর পদার্থবিদরা ক্রমশ চৈতন্যে গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে তাঁরা পেলেন বিজ্ঞানী তথা দর্শকের চৈতন্য, যা দ্রষ্টব্য বস্তু অর্থাৎ কণাগুলোকে প্রভাবিত করে। নিল্‌স বোর, পল হিগনার এরা একেবারে পরম চৈতন্যের দিকে ঝুঁকলেন। কারণ ততদিনে নিশ্ছিদ্র পরীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণার দরুন বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে

www.pathagar.com

কণাগুলিও চৈতন্যময়। তারা বুঝলেন যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহু কিছুর আলাদা আলাদা অংশ মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে অখণ্ডই। এভাবে বিজ্ঞানে বস্তুর অতিরিক্ত চৈতন্যের ধারণা এক— শেষ পর্যন্ত অখণ্ড পরম চৈতন্য।

ঢেউ গতিবিদ্যার জনক শ্রোডিঙ্গার এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চৈতন্যকে বহু খন্ডে বিভক্ত না ধরে এক ও অখণ্ড ধরতে চাইলেন (unification of minds বা consciousness)। আইনস্টাইন দেখলেন পুরো ব্রহ্মাণ্ডটাই স্পেস-টাইমের গতিশীল ভাঁজ, এর বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছু নেই। তবু আমরা এই রূপহীন জিনিসটাকে নানারূপে দেখি (বাড়ি, ঘর, দৃশ্য, গাছ, জীবজন্তু...)। *এইভাবে আধুনিক পদার্থবিদ্যা বস্তু ও শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদন করে শেষে পুরোটাকেই অস্তিত্বহীন করে দিল।* ১৯২৬ সালে হাইজেনবার্গ দিলেন তাঁর অনিশ্চয়তা সূত্র। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কোন কিছু জানা সম্ভব নয়। প্রকৃতির আবরণে কার্যকারণ সূত্র আবশ্যিক নয়, যদৃচ্ছভাবেও ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি একটা দ্বৈতবিশ্বের (Duplex world) ধারণা দিলেন। একটা বহু সম্ভাবনাময় সমষ্টি, অন্যটা একটিমাত্র বাস্তব যা ছিল, সেই সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হয় কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা চতুর্মাত্রায়। বিজ্ঞানীর বা দর্শকের অবস্থান একটিমাত্র চতুর্মাত্রায়। তাই তিনি যখন দেখতে যান, তখন একটা বাস্তব পান, অন্যগুলো পান না। এই অবাস্তব, অনির্ণেয় বিশ্ব সম্বন্ধে নির্ণয়বাদী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ক্ষেপে গিয়ে বললেন **"ভগবান এভাবে পাশা খেলতে পারেন না"**। তিনি-পোদোলস্কি-রোজেন (ই. পি. আর) মিলে একটা প্যারাডক্স দিলেন হাইজেনবার্গের তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করার জন্য। অতঃপর ডেভিড বোহম, তারপর জন বেলের অসাম্য নীতি থেকে পরে প্রমানিত হল আইনস্টাইনই ভুল। বেল নিজে প্রোটন নিয়ে পরীক্ষা করলেন— অন্যরাও (১৯৮২ সনে অ্যাসপেক্ট ফোটন নিয়ে পরীক্ষা করেন) বিভিন্ন কণা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন 'অনিশ্চয়তা সূত্রই সঠিক'।

প্রমাণিত হল *দুটো কণা একদা কাছাকাছি থেকে মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে পরে দূরে চলে গেলেও পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় সব কণাই কাছাকাছি ছিল। পরে দূরে চলে গেছে। অতএব এখনও তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে।* একেই বলে ম্যাকের নীতি, অর্থাৎ যে কোনও একটি ঘটনা বাকি ব্রহ্মাণ্ডকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে। আপাত বিশ্বের খণ্ডাবস্থার নিচে অধিষ্ঠান (substratum) হিসেবে আছে একটা অখণ্ড সত্তা। এই অখণ্ড সত্তাকে কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যায় বলে ফিল্ড। মনে হত এই ফিল্ডটা আসলে শূন্য। কিন্তু দেখা গেল, এই শূন্য থেকে 'ভারচুয়াল কণার' দল আচমকা লাফিয়ে উঠে নেচে বেড়ায়, আবার যায় ডুবে। কণা হয়েও যা কণা নয়, তাই হচ্ছে ভারচুয়াল কণা; অস্তি ও নাস্তির মাঝে তা ডিগবাজি খায়।

মৌলিক বলগুলির পরিবাহী গ্লুয়নগুলি হচ্ছে ভারচুয়াল কণা। যথেষ্ট শক্তি জোগালে এরা প্রকৃত কণা হতে পারে। তাই এখন ভাবা হয়, শূন্য আসলে শূন্য নয়, আসলে এটা পূর্ণ (তবে পুরোপুরিভাবে নয়)। কিন্তু নাস্তি কীভাবে অস্তি হয়? ছিল 'না' হল 'হ্যাঁ'— কিভাবে? কাজেই যখন দেখা যাবে বাস্তব জিনিস শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে তার রূপান্তর ঘটছে, শূন্যটা আসলে পূর্ণ। কিন্তু কী সেই পূর্ণের চরিত্র? এক অংশে আন্দোলন ঘটলে কীভাবে তা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয় সর্বত্র?

www.pathagar.com

শ্রোডিঙ্গারও 'ক্যাট প্যারাডক্স' পরীক্ষা হাজির করলেন। এতে বলা হল, একটা ইলেক্ট্রন যাওয়ার যদি দুটো পথ থাকে, আর একটা পথের সঙ্গে বিষ-নিঃসরণের ব্যবস্থা থাকে যাতে একটা বাক্সবন্দী বিড়ালের মৃত্যু হয়, তবে দর্শকের অনুপস্থিতিতে ইলেক্ট্রনটা তরঙ্গের মত আচরণ করে দুটো পথ দিয়েই যাবে। ফলে বিড়ালটা বাঁচা, মরা বা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে না, বরং একই সঙ্গে বাঁচা ও মরা উভয় অবস্থায় থাকবে। ফলে প্রকৃত অবস্থা অনির্ণেয়। এসব পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা এই পূর্ণের চৈতন্যময়তার ধারণা করছেন। আধিভৌতক ও আধিদৈবিকের সমন্বয় করতে গিয়ে এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান আধিভৌতিককে নাকচ করে তুরীয় অদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকেছে। এই অবস্থায় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়ে থাকে, তার নাম মানবমুখী নীতি (Anthropic principle)। এতে দেখানো হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বিভিন্ন সময়ে বহু সম্ভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এভাবে বহু সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ফলে মানুষ পর্যন্ত এসেছে। যদি একবারেও এর ব্যতিক্রম হত, তবে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হত না। অর্থাৎ প্রথম থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানুষমুখী। ক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে কর্তার মনে, কাজেই এই উদ্দেশ্যেটা ভগবানের ছিল। এই নীতি খ্রীষ্টিয়, ইহুদীয় এবং মুসলমানী ধর্মতত্ত্বের একটা বৈজ্ঞানিক রূপ। এর একটা হিন্দু দর্শন (লীলাবাদ) হচ্ছে যদৃচ্ছবাদী (Randomistic).

১২.২ : কোরআনে প্রাণের প্রসঙ্গ

গত বিশ বছরে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বহু থিওরি বের হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বহু মহাবিশ্ব, স্ফীতিতত্ত্ব ইত্যাদি। এতসব কিছুর পর স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, জীবন ও চেতনার জন্য এই মহাবিশ্বকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'মানুষের চেতনা সৃষ্টিকর্তার সাথে এক সূত্রে গ্রথিত'—বলেছেন নিউইয়র্কের বিজ্ঞানী কার্লফেইট। এটা কোরআনে বর্ণিত 'রূহ' এর ধারণার মত। অধুনা বহু বিজ্ঞানীই কোয়ান্টাম বা অতি পারমানবিক স্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করছেন। *এই কোয়ান্টাম স্তরে কণাগুলোর আচরণের রূপরেখা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে।* কেওযাস থিওরী, আবহাওয়া এবং কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়— এসবের সঠিক কোনো পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। বিজ্ঞানী পল কিং হর্ন বলেন, "স্রষ্টা যা চান, তাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। স্রষ্টার কার্যকলাপ ভৌত নিয়মকেও লঙ্ঘন করে না।" এই বক্তব্য কোরআনের **'কুন ফাইয়াকুন'** কথার সঙ্গে মিলে যায়। পদার্থ বিজ্ঞানী মেহেদী গোলসাতন **পবিত্র কোরআনের** বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "প্রাকৃতিক ঘটনাবলীই মহাবিশ্বে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।" তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাটা মানুষের দায়িত্ব। কেননা **কোরআন মানুষকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুশলতা পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেয়।** গবেষণা হচ্ছে ইবাদত তথা একটা উপসনামূলক কাজ। কারণ এই গবেষণা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির রহস্যকে পুরোপুরি উন্মোচিত করে থাকে।" বিজ্ঞানী

www.pathagar.com

কার্লফেইট বলেন, "সৃষ্টিকর্তাকে পাবার একমাত্র পন্থা হল তাঁর সৃষ্ট মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করা এবং এর অন্তরালবর্তী সত্যকে গভীরবাবে উপলব্ধি করা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিভাবে চলছে তা উপলব্ধি করাটা একজন ধার্মিকের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তার অনুপম সৃষ্টি।"

বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি হচ্ছে শ্বাশ্বত সন্দিগ্ধতা (সন্দেহ); অন্যদিকে ধর্মের মূল সূত্র হচ্ছে শ্বাশ্বত বিশ্বাস। তবে সত্যিকারের ধার্মিক যারা এবং যারা মনেপ্রাণে বিজ্ঞানী, তারা মহাবিশ্বের বিস্ময় বোঝার জন্য সদাব্যাপৃত থাকেন। পূর্বে আলোচিত খণ্ড এবং সমগ্র আসলে দুটোই সত্য। যে-কোনও একটাকে বেশি গুরুত্ব দিলে বা একমাত্র সত্য মনে করলে ভুল হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের কাজই *জ্ঞেয় বিষয়কে প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে জানতে থাকা এবং উপযুক্ত জায়গামতো খণ্ড সত্য জুড়ে জুড়ে সমগ্র সত্যের দিকে এগোনো। দর্শনের কাজ এই সংযোজনের কাজকে সংঘটিত ও পরিচালিত করা।* আবার একটা ক্ষেত্রে যা সমগ্র, বৃহত্তর ক্ষেত্রের তুলনায় তাও খণ্ড। ফলে খন্ড থেকে সমগ্র—যা তর্কশাস্ত্রের ভাষায় আরোহ পদ্ধতি (inductive method) অর্থাৎ বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে উত্তরণের (particular to general) পদ্ধতি—যাওয়ার কোনও শেষ নেই।

আবার সমগ্র ধারণা থেকে কোনও একটা অজানা খণ্ড ক্ষেত্রে যাওয়ার যে পদ্ধতি—যা তর্কশাস্ত্রের অবরোহ পদ্ধতি (deductive method) অর্থাৎ সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্য নিষ্কাশনের (general to particular) পদ্ধতি বলে পরিচিত, বিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্মাণ ও প্রমাণে তারও একটা গুরুত্ব আছে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট ছোট প্রশ্ন করতে না শিখেছে, ছোট খাট বিষয় থেকে জানার প্রক্রিয়া শুরু করতে না পেরেছে, ততদিন পর্যন্ত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়নি। হয়নি আজকের এই অগ্রগতি। আবার তাত্ত্বিক বিজ্ঞান যখন কেবলমাত্র ছোট খাট প্রশ্নের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে, তখন দর্শনকে এসে হাল ধরতে হয়েছে। বলতে হয়েছে বস্তুজগতকে জানার সুবিধার জন্য আমার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স ইত্যাদি জানার বিষয়কে ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু বাস্তবে কোনও জিনিসের ভৌত বা রাসায়নিক ধর্ম এবং পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলি তো আলাদাভাবে থাকে না, একত্রে মিলে-মিশে থাকে। সেই ঐক্যের (ঐকত্র) নিয়মকেও আমাদের জানতে হবে দর্শনের সাহায্য।

পল ডেভিসের বিখ্যাত স্টাইল যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (তিনি গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে logic এবং physics সমান হস্তে চালান) অনুসরণে লিখিত রোহেল পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, থেকে প্রকাশিত *"কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য"* শীর্ষক একটি মূল্যবান বই কিছুদিন আগে আমার চোখে পড়ল। বইটির লেখক বহু পুস্তক প্রণেতা এস. এম. জাকির হুসাইন নাম্নীয় এক তরুণ চিন্তাবিদ ও হবু দার্শনিক। কোরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বই আমাকে সব সময় টানে। তাই গভীর আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়লাম। বইটিতে সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে : মনের স্বভাব বা চরিত্র, বানরের দেহে মানুষের মন, স্বভাবের ধর্ম বনাম ধর্মের স্বভাব, মহাকালের প্রাগৈতিহাসিক আত্মা, মনের অদৃশ্য সুড়ঙ্গ এবং তার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন, ধর্ম ও ধর্মবোধের প্রাগৈতিহাসিক উৎস, মানব যুক্তি বনাম বাস্তবতা।

www.pathagar.com

লেখক সামগ্রিকভাবে inductive logic প্রয়োগ করে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি সংযোজন করে কোরআনের সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে আয়াত টেনে তার উদ্ধৃত দিয়েছেন সর্বত্র। গভীর বিশ্বাসী মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি পুরো বিষয়বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে তিনি যুক্তি সিদ্ধভাবেই খণ্ডন করেছেন, এবং একই সঙ্গে বিবর্তনবাদের বিজ্ঞান-সমর্থিত দিকগুলোর পক্ষে কোরআনের সমর্থন হাজির করেছেন। প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে বাজারে প্রচলিত রয়েছে সৌদি চিকিৎসক ডা: মুহাম্মদ আলী আলবারের 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ, এবং মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমের 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব'। এ ছাড়াও 'কোরআনে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ' নিয়ে এ যাবৎ রচিত হয়েছে প্রায় ষাটটির মত বই, যার অধিকাংশ আমার সংগ্রহে রয়েছে। প্রত্যেকটি বই লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় রচিত হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত দুটি বই এবং বাকি ষাটটি বইয়ে প্রাণ, জীবন, বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে আলোচিত অধ্যায়গুলির সাথে যদি *কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য* বইটির তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে জাকির হুসাইনের বইটি আরও সুগঠিত, সুগ্রন্থিত, এবং সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্যারালাল ব্যাখ্যাগুলি তাতে দেওয়া আছে। সেই সাথে inductive logic ও স্থানে স্থানে deductive logic এর সফল প্রয়োগ তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহু গুণ। ব্যবহৃত অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে গাণিতিক প্রতিপাদ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গতিময়তা ও সাবলীলতা এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের বই আমাদের তরুণ সমাজের জন্য পথ-প্রদর্শিকা হিসাবে কাজ করবে।

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের মোট আয়াত ৬,৬৬৬টির মধ্যে শতকরা দশ ভাগ (প্রায় ৭০০টির মত) আয়াতে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ এসেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকশত আয়াত নিয়ে ব্যাপৃত প্রাণ (রূহ) প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এই বইটিতে। ভাবুক পাঠকদের জন্য এই বক্তব্যগুলি চিন্তার খোরাক যোগাবে। বইটির সার্থকতা এখানে এই যে, এতে বিচিত্রমুখী বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীয় ভাবধারার ব্যাপারে একপেশে এবং সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি লেখক চাপিয়ে দেননি—খোলাই রেখেছেন বাঙালী দার্শনিক, ধর্মভীরু সজ্জন এবং চিন্তাশীল পাঠক সমাজের জন্য। বিবর্তনবাদের ঘাটতি সূত্রটি হচ্ছে বানরজাত থেকে মানুষের উত্তরণের সময় msissing link টুকু—কখন কিভাবে বানরের মানুষের উত্তরণ ঘটল; তা চাড়া বিবর্তনবাদও সঙ্কীর্ণ অর্থে সঠিকই আছে। সব কিছুরই বিবর্তন রয়েছে; মনুষ্যজাতির একাংশও এর আওতায় পড়ে। তবে ব্যাপকভাবে কোরআনের কথাই ঠিক—এই আদম যিনি আমাদের পূর্বপুরুষ তাকে আল্লাহ নিজেই পৃথিবীর বাইরে কোনও গ্রহে, স্বর্গে বানিয়ে পরে পৃথিবীতে পাঠান, হয়ত কোনও বিরাট ডিজাইনের অংশ এক এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে। লেখক এই শূন্যস্থানকে পূরণ করার জন্য যৌক্তিক কাঠামোর ওপর বিজ্ঞান ও কোরআনের সূত্রাবলীর সমন্বয়ে নিজস্ব তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, যার মাধ্যম তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রাণ ও মনোজগতের অনেক গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে অনেক ইহুদী গবেষকের (যেমন জাকারিয়া সিচিন) রোম জাগানো প্রত্নতাত্ত্বিক বই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : *The Earth Chronicles Series এ The Stairway to Heaven, The Wars of Gods and Men, The Lost Realms,*

www.pathagar.com

Genesis Revisited, The 12th Planet, How Time Began etc.তদুপরি Raymond Walter Drake এর বইগুলিতে বিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে এক তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরা হয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য।

Free will মুক্ত চিন্তা বা স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারটিতে লেখক কোরআন থেকে প্রসঙ্গ টানতে পারতেন। এ বিষয়টি বেশ জটিল, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও, যেমন নির্ণেয়বাদ এবং হাইসেনবার্গের অনিশ্চিয়তাবাদ টানতে হত। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দর্শন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছে। ব্রিটিশ গবেষক মন্টেগোমারী ১৯৪৮ সনে এ বিষয়ে পিএইচডি নিয়েছিলেন এবং ১৯৯৪ সনেও তিনি এ ব্যাপারে নতুন করে আলোকপাত করেছেন Free will শীর্ষক পুস্তকে।

আর একটি interesting matter লেখকের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা হল কোরআনে বহুবার ঘোষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারাদির ব্যাপার। ফেরাউনের লাশ সেই খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সাল থেকে পাকা তিন হাজার বছর লুক্কায়িত ছিল। এতদিনে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয়েছে যে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের দেহকে (মমী) সংরক্ষণ করবেন। * (সূরা ইউনূস : আয়াত : ৯২) লেখক ব্যাপারটির প্রতি শুধু ইঙ্গিত করেছেন, সেটিকে বিশদ করেননি। আল্লাহ্ তার কথা রেখেছেন (নিশ্চয়ই তিনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার)। এরকম কত জনপদ তিনি ধ্বংস করেছেন। এগুলির ওপর ইংরেজিতে archaeology সম্পর্কিত বহু বই রয়েছে। বাংলায় রয়েছে : অজিত কুমার পাল : ফসিলের কথা (১৯৯১), (আনন্দ) এবং সুবোধ কুমার মজুমদারের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী (১৯৯৭), (ভারবি)। ব্যাবিলনে, মেসোপটেমিয়ায় ৫-৬ হাজার বছর আগে যে কি ঘটেছিল, মানবসভ্যতার উষালগ্নের সেই ইতিহাস না জানলে তার যোগসূত্রটা ধরা যায় না। এদিকে একটু নজর দিলে ভাল হত। লেখকের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং ধারার সাথে এই রহস্যময় বিষয়গুলি চমৎকার খাপ খেত। *(দ্রষ্টব্য : ৮৯ : ৯-৪; ৫৩ : ৫০-৫১; ৯১ : ১১-১৫; ৫০ : ১২-১৪; ৫৪ : ২৩-৩১; ৭ : ৭০-৭৯; ২৬ : ১৪১-১৫৯; ২৭ : ৪৫-৫৩; ১৭ : ৫৯; ১১ : ৬১-৬৮; ১৫ : ৮০-৮৪; ৫১ : ৪০-৪৫; ৬৯ : ১-৫; ২৯ : ৩৮; ১৮ : ৫৯ ; ১৬ : ৩৬;)

সর্বোপরি যে দুটো উদাহরণ লেখক দিতে পারতেন তা হলো (১) সাদ্দাদের বেহেস্ত। ইয়েমেনে আদ ও সমুদ জাতির সম্রাট সাদ্দাদ খোদা-বিদ্রোহী হয়ে নিজেই স্বর্গতুল্য রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিল সালেহ নবীর কথায় কর্ণপাত না করেও। এক বিশাল ঝড়ে তার প্রাসাদ, বেহেস্ত, রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং সাদ্দাদ নিজে তার প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারেনি। সাদ্দাদের এই কথিত রাজপ্রাসাদটি আমেরিকানরা খুঁজে পেয়েছে ইয়েমেন। এর ওপর ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'টাইম' ও 'নিউজ উইকে' দুইটি আকর্ষণীয় রিপোর্ট বেরিয়েছিল। মনে পড়ে পরে 'রহস্য পত্রিকা'য় এর বঙ্গানুবাদ ছাপা হয়। (২) প্যালেস্টাইনের জেরিকো শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল ১৯৯০-৯৪ সনে। এ সম্পর্কিত রিপোর্টও উক্ত পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ইব্রাহীম নবীর ভ্রাতুষ্পুত্র লুত নবীর সময়ে সংঘটিত সোডোম ও গুমোরাহ নগীর ধ্বংসের কথা (জর্ডান নদীর ধারে) আল্লাহ্ কোনআনে উল্লেখ করেছেন এবং তা পাওয়াও গেছে। এখনও উক্ত অভিশপ্ত স্থানে তেজস্ক্রিয়তা অত্যধিক। (সূরা আল-হিজর : ৭৩-৭৬-৭৯)

www.pathagar.com

যাক, এসবের কথা আমি শুধুমাত্র উল্লেখই করলাম। সিরিয়াস পাঠক হয়ত নিজেই এ বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, আর যারা জ্ঞাত নন, তারা উক্ত সূত্রগুলি থেকে বিশদভাবে জেনে নিতে পারেন। তাছাড়া লেখকও ধরে নিয়েছেন যে তার পাঠক সিরিয়াসই।

লেখক জাকির হুসাইনে পূর্ববর্তী একটি বইয়ের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তা হল : *'সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন'*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে ১৯৯৯ সালের দ্বিতীয় মাসে এটি বের হয়েছে। উক্ত বইয়ে এই সর্বপ্রথম অবরোহ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে কোনো ধর্মের মতবাদের মধ্যে না গিয়েই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের যৌক্তিক এবং গাণিতিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। লেখকের কৈফিয়ত অংশে এবং ভূমিকায় এ ব্যাপারে আকর্ষণীয় বক্তব্য রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এদিকে নজর দিতে পারেন। ঐ বইটির বিশিষ্ট্যতা হচ্ছে, এর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ইংরেজিতে "God Really Exists! Field Theory of the Absolute" শীর্ষক মনোজ্ঞ আলোচনা। সাব টাইটেল : A Science-based logico-mathematical inductive proof of the existence of God without reference to any system of religious belief. বইটির Introduction-এ লেখকের চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে lucid way-তে। বক্ষ্যমান নিবন্ধের বক্তব্যগুলিই এতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে গণিতের বিভিন্ন থিয়োরীর অবলম্বনে সহজবোধ্যভাবে। গাণিতিক ক্ষেত্র (Field) কেমন করে আমাদের চিন্তার জগতকে রূপদান করে, মানবিক যুক্তির অন্ধকূপ (black-hole) এবং এর ফলে মানবীয় জ্ঞানের দৈন্যতা, সবশেষে বাস্তবতার উপর কিছু ধ্যাণ-ধারণা আর 'অযৌক্তিক' এর ওপর কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত; এই যাবতীয় বিষয়গুলির স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। আমার মতে ইংরেজি অংশটির Conception এবং ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল হয়েছে বাংলা অংশটির চাইতে। লেখকও ভূমিকাতে সিরিয়াস পাঠককে ইংরেজি অংশটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

এমন সব চমৎকার বিষয় নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়ে অমূল্য সময় ব্যয় করে কিছু সৃজনশীল চিন্তাধারা ব্যক্ত করে যাচ্ছেন এক নিঃসঙ্গ কণ্ঠস্বর : তরুণ লেখক এস. এম. জাকির হুসাইন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম দু'একজন ক্ষ্যাপা লেখকের আবির্ভাব আমাকে আশান্বিত করে তুলছে যে বাঙালী জাতির ভবিষ্যত একেবারেই ঝরঝরে হয়ে যায়নি এখনও। যারা আগামীকালের জন্য নগদ নারায়ণের পিছনে না দৌড়িয়ে ছাপার অক্ষরে বাক্যমালা সাজানোর দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেন, এমন সব ব্যক্তিত্বকেই 'জুয়েল' বা 'রত্ন' অভিধা দেয়া হয় সমাজ জীবনে।

আসুন, আমরা এ ধরনের মানবপ্রাণের অধিকতর সাফল্য কামনা করি। এবং আশা রাখি কোরআন ভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াদি নিয়েও জাকির হুসাইন যেন তার গবেষণার লিপিবদ্ধ ফলাফল ভবিষ্যতে আমাদেরকে অবহিত করেন।

ইতোমধ্যে জানা গেছে জাকির হুসাইন 'কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস এবং অলৌকিকের সান্নিধ্যলাভ' শীর্ষক একটি মারফতী তত্ত্ব জ্ঞানের বই প্রকাশ করেছেন। এটির দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে—'অনন্তে অভিসার : পর্দার আড়ালে ফানাফিল্লাহ'। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে : গায়েবি জগৎ রহস্য, কোরআনের শক্তি এবং তার সফল প্রয়োগ, সবশেষে, পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবনেতিহাস।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহাবিশ্বকে আমরা কতটুকু জানি আর মহাকালকে কতটুকু বুঝি

১৩.১ : মহাকাশে কত হাজার কোটি ছায়াপথ রয়েছে?

১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের একটা বিশেষ ক্ষুদ্র অঞ্চলের গভীরতম অংশের ছবি তোলা হয়। স্থানটি হচ্ছে ১ ডিগ্রির ২৫ ভাগের একভাগ। ১ ডিগ্রির অর্থ হচ্ছে, এই কোণে (angle) আপনি দূরবীন দিয়ে দেখলে ২৫০০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি মোমবাতি বা পঁচিশ পয়সার মুদ্রা দেখতে পারবেন।

এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন দেড় থেকে দু হাজার ছায়াপথের। এ থেকে হিসেব করা হয় যে মহাবিশ্বের ছায়াপথের সংখ্যা ৫ হাজার কোটিরও (৫০ বিলিয়ন) বেশি। যা পূর্বের ধারণার পাঁচগুণ। আমাদের অবস্থান যে ছায়াপথে সেখানে সূর্য হচ্ছে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার কোটি (৫০-১০০ বিলিয়ন) নক্ষত্রের অন্যতম। আর আমাদের ছায়াপথটাও হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটি অতি সাধারণ মানের। কোন কোন গ্যালাক্সিতে ৪০০ বিলিয়ন স্টারের সমাবেশ ঘটেছে। কার্ল সাগান অনুমান করে বলেছিলেন কয়েক হাজার কোটি ($১০^{১১}$-একের পর ১১টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয় তাই) গ্যালাক্সি আছে এই মহাবিশ্বে যার প্রত্যেকটিতে গড়ে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সমস্ত গ্যালাক্সিতে সম্ভবত যত নক্ষত্র আছে ততই গ্রহ আছে অর্থাৎ দশ কোটি কোটি কোটি ($১০^{২২}$টি)। এই ধরনের বিশাল সংখ্যার সামনে কি ধরনের কতটুকু সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে যে শুধুমাত্র সূর্যের মতো একটি সাধারণ নক্ষত্রে প্রাণী অধ্যুষিত গ্রহ থাকার? আমার কাছে মনে হয় বিশ্ব প্রাণের বন্যায় ভাসছে!

সংখ্যাতত্ত্বের সম্ভাব্যতার সূত্রানুসারে বলা যায় যে, বর্তমানে (১৯৯৯ সনের সাধ্যমত প্রযুক্তির বদৌলতে) মহাবিশ্বে ১০ লাখ মিলিয়ন বা ১ মিলিয়ন মিলিয়ন বা দশ হাজার কোটি বা ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। শেষ সংখ্যাটি আল্লাহ্ই জানেন ভালো।

বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত মেটাফিজিক্সে আশ্রয় নিতে হবে এমন কোনও কারণ নেই। আসলে বিজ্ঞানে এক ধরনের গোঁড়ামি দেখতে পাই, যা কিনা ধর্মেরই অনুরূপ। ডালটনের অ্যাটমিক থিয়োরি আবিষ্কারের পর (১৮১২ সনে) বহু দিন পর্যন্ত ডালটনই শেষ কথা বলে ধরা হত। ডালটন অণুকেই পরমাণু ভেবেছিলেন। মাইকেলসন এবং মোরলির আলোর গতিবেগ নির্ধারক বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট প্রমাণ করেছিল ঈথারের কোনও অস্তিত্ব নেই। অথচ তার আগে পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ঈথারের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং এর সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিল।

www.pathagar.com

আসলে আমরা বিশ্বাস করতে চাই।

The will to believe becomes belief itself.

ফিজিক্স এবং মেটাফিজিক্স এর কোয়ালিটি অফ থট প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে। আর বিজ্ঞানের কনস্পেচুয়াল দিক যতই মানুষকে মেটাফিজিক্সে নিয়ে যাক না কেন, তার একটি মোটা দাগের প্রমাণ আমরা চাই-ই।

১৯৮১ সনে ভাটিকানে কসমোলজির এক কনফারেন্সে পোপ হকিংকে বলেছিলেন 'বিগ ব্যাঙের পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি প্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে গবেষণা ঠিক আছে। কিন্তু বিগ ব্যাঙের ওপারে যেন বৈজ্ঞানিকেরা উঁকি না মারেন। কারণ, ওটাই সৃষ্টির মুহূর্ত ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের চরমতম প্রমাণ। হকিং বলেছিলেন Real time এ মহাবিশ্বের আরম্ভ ও শেষে আসে গাণিতিক Singularity যার পরে আর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য বিচার চলে না। মহাবিশ্বকে কোয়ান্টাম অবস্থায় কল্পনা করলে তার 'কাল্পনিক সময়ে' মহাবিশ্ব সসীম হলেও সময় চলতে থাকবে এবং বিচার চলবে। কিন্তু কে বলে দেবে কোনটা ঠিক। রিয়্যাল টাইমে এক জায়গায় গিয়ে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি ভেঙ্গে পড়বে—জায়গাটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটি। ইম্যাজিনারি টাইমে সিঙ্গুলারিটি নেই। কোনটা যে ঠিক তা কেউ জানে না।

১৩.২ : মহাবিশ্বকে আমরা কতটুকু জানি

অনেক সময়ে বিজ্ঞানীদের অলীক ধরনের তথ্য দেখে ব্ল্যাকহোলের ধারণাটিকেও অবাস্তব মনে হয়। বিজ্ঞানীরা সমান্তরাল মহাবিশ্বের (প্যারালাল ইউনিভার্স) মত অনুমান নির্ভর ধারণার কথাও ব্যক্ত করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী কোথাও আমাদের জানা মহাবিশ্বের অনুরূপ কিন্তু তার প্রতিবিম্বের মত একটি মহাবিশ্ব রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন এই স্পেস-টাইম নির্ভর মহাবিশ্বে ওয়ার্মহোলের মত কিছু পথ থাকতে পারে যা দিয়ে খুব সহজেই দূর-দূরান্তের জ্যোতিষ্কে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানী মহলে দশমাত্রিক সুপারস্ট্রিং থাকা সম্ভব এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে বাস করি যার মাত্রাগুলো হল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা; চতুর্মাত্রিক জগতের চতুর্থ মাত্রাটি হল সময়। তবে যাই হোক এই মহাবিশ্বকে আরো সহজবোধ্য করার আন্দোলনে বিজ্ঞানীরা কতটুকু এগিয়েছেন বা কতটুকু কল্পনাশ্রিত তত্ত্ব বের করেছেন—এ নিয়ে তেমন মূল্যায়ন হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সংঘাত বেধেছে অবশ্য দুটো যুগান্তকারী তত্ত্বকে ঘিরে। তত্ত্ব দুটো হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং জেনারেল রিলেটিভিটি। প্রমাণ করার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পুরোপুরি তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করলে আইনস্টাইন-এর রিলিটিভিটি তত্ত্বের একটি অংশ ভুল প্রমাণিত হয়—এই অংশে বলা হয়েছে কোন সংকেতই আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করতে পারে না। তত্ত্ব দুটোর ভিত খুবই মজবুত, তবে এদের মধ্যে এমন একটি খুঁত রয়েছে যা এখনো মানুষের বোধগম্যতার বাইরে রয়েছে।

www.pathagar.com

কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং রিলেটিভিটি তত্ত্ব দুটোর উদ্দেশ্য প্রায় একই। তবে দুটোই আপাত অবোধগম্য কিছু পদ্ধতিতে মহাবিশ্বকে আরো সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছে। তত্ত্বগতভাবে দুটো ধারণাই অভূতপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং আপেক্ষিকতত্ত্বের ছাত্র মাত্রই জানেন কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত উদাহরণ বা পর্যবেক্ষণের কথা টানা হয়েছে তত্ত্ব দুটোতে। এরপরও বিংশ শতাব্দির এই তত্ত্ব দুটোর অবদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে অসাধারণ; তত্ত্বগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার পর মহাবিশ্বের অনেক রহস্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে, অন্য কথায় মহাবিশ্বকে আমরা এখন আরো বেশি বুঝতে পারছি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং রিলেটিভিটি তত্ত্বের আগে পদার্থবিদ্যা রাজত্বের সম্রাট ছিল নিউটনীয় বলবিদ্যা। নিউটনীয় বলবিদ্যা কামানের গোলা বা গ্রহ-উপগ্রহের গতির অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিসেব দিতে পারে কিন্তু প্রায় আলোর গতিসম্পন্ন পারমানবিক কণিকার (যেমন-ইলেকট্রন) গতির কোন হিসেব করতে পারে না। রিলেটিভিটি তত্ত্ব বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে সূচনা বছরেই পড়ান হয়। আপনি যদি রিলেটিভিটি তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা নেন (দ্রষ্টব্য : লেখকের প্রকাশিতব্য—**মজার রিবলেটিভিটি; এবং কোয়ান্টাম বিজ্ঞান রহস্য**) তাহলে বুঝতে পারবেন নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মত কষ্টবোধ্য আর কিছু নেই। মহাকর্ষ তত্ত্ব একটি দূরত্বে ক্রিয়ার মত রহস্যময় ধারণাকে স্থান দেয়া হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী মহাকর্ষ যুগপৎভাবে সারা মহাবিশ্বব্যাপী ক্রিয়া করে। কার্য ও কারণের নিয়ম অনুযায়ী এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন।

'নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্রিয়া'র ধাঁধাঁটির সমাধান করেছে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের স্পেস-টাইম দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও সময় ভিত্তিক চতুর্মাত্রিক জগৎ-এর বক্রতা লেখচিত্র (কার্ভেচার অফ স্পেস-টাইম)। আর সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় কার্ভেচার অফ স্পেস-টাইম খুব জটিল বিষয় নয়। গভীর বনের কোন স্থির জলাশয়ে ভাসমান শুকনো পাতা যে কারণে পরস্পরের কাছাকাছি আসে, স্পেস-টাইম কার্ভেচার ব্যাপারটি অনেকটা তার মত। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়-মোটা ফোমের গদি বিছানো বিছানায় দু'জন শুলে বিছানার মাঝখানটা গর্ত হয়ে যায় তাতে শয়নকারী দু'জনই গড়িয়ে আরো কাছে চলে আসতে বাধ্য হয়। বলাই বাহুল্য এ ধরনের শক্তির প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়। স্থির পানিতে মনে করুন নতুন একটি পাতা পড়ল, পত্র পতনের এই ধাক্কাটি ছোট ঢেউয়ের আকারে পুরো জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আইনস্টাইন-এর তত্ত্বে আছে বিশালাকার বস্তু স্পেস-টাইম ভিত্তিক আমাকের পরিচিত জগৎকে বিকৃত করে, ঠিক যেমনটি হয়েছে সেই স্থির জলাশয়ে নতুন পাতা পড়ার সময়। নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্রিয়ার চেয়ে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্য। স্পেস-টাইম ভিত্তিক জগতে সেই ছোট ছোট ঢেউগুলো আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ে এই যা পার্থক্য।

আমরা যার উপর জীবন যাপন করি তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতাকে আমরা যাচাই করি। যেখানে আমরা এখনো আমাদের হাত বা পদক্ষেপ দিয়ে দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব অনুমান করি, আমাদের অত্যন্ত স্বল্প জীবনকাল দিয়ে সময়কে যাচাই করি, এই পদ্ধতিতে মহাবিশ্বকে মাপা শুরু করলে তা হবে নিরবচ্ছিন্ন এবং কোয়ান্টাম

www.pathagar.com

বলবিদ্যা হবে ব্যাখ্যার অযোগ্য। মহাবিশ্বকে মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেক আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করেন। মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে খুব সূক্ষ্ম স্কেলে মাপা হলে দেখা যাবে মহাবিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন নয় বরং ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত।

এটি অভাবনীয় এক আবিষ্কার। বস্তু হোক বা শক্তি হোক কোয়ান্টাম বল বিদ্যায় সব কিছুকে কণিকা বা তরঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করে এই ছোট ছোট সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র অস্তিত্বের (ডিসক্রিটনেস) কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু বা শক্তিই কণিকা আবার তাদের সরণের প্রকৃতি হল তরঙের অনুরূপ। বস্তু এব শক্তির দুটোই কণিকা এবং তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের অধিকার প্রস্তাবনাটি প্রাথমিকভাবেই অবাস্তব, দুর্বোধ্য এবং হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তরঙ্গই বলুন আর কণিকাই বলুন সবই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। এই অভিজ্ঞতাগুলো দিয়েই আমরা ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন-এর জগৎকে ব্যাখ্যা করি। কারণ আমরা যা অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন বা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না তা কল্পনা করাও অসম্ভব। এই শতাব্দির প্রথম দিকে এ সম্পর্কে কালজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী নিলস বোর প্রস্তাব করেছেন যে, বিজ্ঞানকে এখন শুধুমাত্র অভিজ্ঞাতালব্দ বাস্তবতার শাব্দিক প্রতিরূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা ঠিক নয়। বরং বিজ্ঞান হওয়া উচিৎ প্রকৃতি কিভাবে ক্রিয়া করে তারই গাণিতিক বর্ণনা। তার এ ধরনের অভিব্যক্তি পদার্থ বিদ্যার স্বাভাবিক চলার পথের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বে (হাইজেনবার্গস্ আনসার্টেইনটি প্রিন্সিপল) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অবোধ্যতার অনেকটা নিহিত রয়েছে। অনিশ্চিয়তা তত্ত্বে বলা হয়েছে, ঠিক একই সময়ে কোন বস্তুর ভরবেগ এবং তার অবস্থান নির্ভুতভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মূল কথাই হল মহাবিশ্ব সম্পর্কে আগাম কিছু বলা অসম্ভব বা অন্য কথায় মহাবিশ্ব দুর্বোধ্য। এর বিপরীত কথাটিও সত্য যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অবিশ্বাস্য রকম নিখুঁত পরিমাপের একটি পদ্ধতিও বটে। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখতে হবে নিখুঁতভাবে কোন বস্তুর অবস্থান বের করতে হলে সেই সময়ে তার ভরবেগের কথা ভুলে যেতে হবে, আবার নিখুঁতভাবে ভরবেগ বের করতে হলে সেই অনুপাত নিখুঁতভাবে তার অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সিদ্ধান্তগুলো খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে তাই এই তত্ত্ব মহাবিশ্বকে আরো সহজবোধ্য করেছে। সবাই অবশ্য মহাবিশ্বের এই সহজবোধ্যতায় খুশী হতে পারেননি।

কোয়ান্টাম সাধকরা দাবী করেন যে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এ মানুষের চেতনা এবং অমরত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্য অতিন্দ্রীয় সাধকদের মত এদের হাতেও লৌকিক প্রমাণ নেই।

১৯১৬ সালে আইনস্টাইন যখন তার জেনারেল থিউরি অব রিলেটিভিটির গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, এতে পূর্বকথিত কিছু ইফেক্টকে এতটাই নগণ্য মনে হয়েছিল যে, বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে গবেষণাগারে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। এটা সত্যিই অবাক করার মত একটি ব্যাপার। কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে অবশ্য জেনারেল থিয়োরি অব

www.pathagar.com

রিলেটিভিটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আবার দুটো তত্ত্বই কখনো একই সাথে কাজে লাগে; যেমন লেগেছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)-এর ক্ষেত্রে জিপিএস প্রযুক্তি এখন খুব প্রয়োজনীয়ভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে; আর এই প্রযুক্তিতে কোয়ান্টাম মেকানিকস এবং থিয়োরি অব রিলেটিভিটিকে খুব কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো এমন একটি সময় আসবে, যখন কোন মানুষই ছোট একটি জিপিএস-এর মাধ্যমে আপনি পৃথিবীর কোথায় আছেন, তা বলে দেয়া সম্ভব হবে, খুঁতের মধ্যে কয়েক ফুট এদিক-ওদিক হতে পারে। সময়ের ওপর আপেক্ষিকতার প্রভাবভিত্তিক হিসাব থেকেই এমন পরম নির্ভুলভাবে আপনার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সেই ক্ষেত্রে টাইমিং সংকেতকেও পরম নিখুঁত হতে হবে, এই ভুলের হার এক লক্ষ বছরে এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে। পারমাণবিক ঘড়ি ছাড়া এমন নিখুঁত সময় পাওয়া সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম মেকানিকস থেকে পারমাণবিক ঘড়ির ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণু কোয়ান্টাম ট্রানজিশন থেকে উদ্ভূত মাইক্রোওয়েভ কম্পনাংক থেকেই পরমাণবিক ঘড়ি ছাড়া এমন সময় পাওয়া সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম মেকানিকস যে কত অমীমাংষিত বৈজ্ঞানিক রহস্য বা বিষয়কে সমাধান করেছে এবং কত প্রযুক্তি যে এর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা হিসেব করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, **এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সফল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব**। উপসংহারে আমরা এটাই বলতে পারি যে, খুব মৌলিক পর্যায়ে মহাবিশ্ব অবশ্যই খুব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন টুকরোয় বিভক্ত। জেনারেল রিলেটিভিটি অবশ্য তা বলে না, এটি একটি ক্লাসিক্যাল কন্টিনিউয়ামতত্ত্ব, এর মধ্যে মহাবিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন এবং সমগ্রতা; আর এখানেই কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাথে এর বিরোধ। কোয়ান্টামতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য তেমন কোন প্রস্তাবনা নেই। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম মেকানিকস-এর মাধ্যমে খুব শীঘ্রই ব্যাখ্যা করা যাবে। নিউটন বুঝতে পেরেছিলেন, যে জন্য আপেল মাটিতে পড়ে সে জন্যই উপগ্রহগুলো নিজেদের কক্ষে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ গ্রহ ও আপেলের জন্য কোন আলাদা তত্ত্বের প্রয়োজন নেই, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে পদার্থ বিজ্ঞানীরা গন্তব্যস্থলে কিভাবে একটি সমন্বিত তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায়, যা একটি নক্ষত্রের জন্ম থেকে শুরু করে মানুষের প্রেমে পড়ার মত ব্যাপারকেও ব্যাখ্যা করবে। অনেকে 'সর্বতত্ত্ব' আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেন, এ অবস্থায় একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক সমীকরণ সমগ্র বিশ্বের সব কিছুর সমাধান দিতে পারবে।

যেহেতু কোয়ান্টাম মেকানিকসকে জেনারেল রিলেটিভিটির সাথে সমন্বিত করা সম্ভব হয়নি, এখনও বিশাল রকম বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রয়োজন আছে। আমরা একজন তরুণ আইনস্টাইনের পথ চেয়ে আছি, যে আমাদের দেখাবে আমরা কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো ভুল করে পাশ কাটিয়ে গেছি; সে সেসব প্রশ্নের উত্তরও দেবে, আমরা যেসব প্রশ্নই জানি না। তা যখন ঘটবে, মহাবিশ্ব অনেকটা সহজবোধ হবে।

www.pathagar.com

১৩.৩ : মহাকালকে আমরা কতটুকু বুঝি

মহাবিশ্বের 'স্থান' 'কাল' সবই ঈশ্বর সৃষ্ট। সৃষ্ট কোন বস্তুর বয়স স্রষ্টার বয়সের অধিক হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। স্থান পদার্থপূর্ণ এবং শূন্য দুই-ই হতে পারে। তবে 'স্থান' অবশ্যই থাকতে হবে। 'স্থান' ব্যতীত কোন ঘটনা হতে পারে না। সুতরাং স্থান অতীত। একই কথা বৈজ্ঞানিক হকিংও বলেছেন যে, কোন ঘটনা ঘটার জন্য 'স্থান' অবশ্যই থাকবে। 'স্থান' ছাড়া ঘটনা ঘটবে কোথায়? কোন ঘটনা যদি পদার্থশূন্যও থাকত তাহলেও সেখানে স্থান নেই তা বিশ্বাস করা বা চিন্তা করা যাবে না। মহাবিশ্বে স্থানের কোন সীমা নেই কিন্তু সীমানা আছে। মহাবিশ্ব অসীম। কালের বিবর্তনে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং কালের বিবর্তনে মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে এবং এই মহাবিশ্ব প্রসারমাণ। প্রসারমাণ মহাবিশ্বের কোন সীমা হতে পারে না। বিশ্বের 'শেষ প্রান্ত' বলে এমন কোন সীমারেখা কল্পনা করা যায় না। আমরা পদার্থকে অনুভব করতে পারি, 'স্থান'কে নয়। স্থানের কোন আকার বা রং নেই। 'স্থান' অদৃশ্য।

মহাবিশ্বে 'স্থান' শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই 'কাল' ছিল। 'কাল' যদি মহাবিশ্বে আগে সৃষ্টি না হয় তবে মহাবিশ্বের গবেষণা সম্ভব নয়"। এই বক্তব্যে একমত হবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। অথবা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই কালের শুরু হয়েছিল। মহাবিশ্বে 'স্থানে'র যেমন কোন কিনারা (Edge) নেই 'কালের' ও তেমন কোন শুরু কিংবা শেষ নেই। হকিং বিজ্ঞানসূত্রে বলেছেন, "ঈশ্বর কোন এক সীমিতকালে এমনভাবে মহাবিশ্ব চালু করেছেন, তাতে সব রকম পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণে এই-ই প্রমাণিত হবে," মহাবিশ্বে 'কালে'র অস্তিত্ব চিরদিনই ছিল। সুতরাং কাল চিরন্তনভাবে অতীত। অপরদিকে একই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর মহাবিশ্ব দর্শনে দিয়ে গেছেন, তাও হকিং-এর জন্মের আগে।

'কাল' বা 'সময়'কে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু কালের ঘটনাকে আমরা দেখতে পাই। কেউ কেউ বলেছিলেন, 'কাল' বা 'সময়' নামে কিছুই নেই, 'কাল' হলো ঘটনা পর্যায়ের ফাঁক মাত্র। কালকে তিন খণ্ডে ভাগ করলে—ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানসহ তিন কাল পাই অবশ্য বর্তমান কালকে কোন কাল বলা যায় না, কারণ কাল গতিশীল। যা কিছু গতিশিল তা স্থির বা বর্তমান হতে পারে কি করে? ভবিষ্যত থেকে কাল তীব্র গতিতে আসে এবং নিমিষেই তা বর্তমান ছুঁয়ে অতীত হয়ে যায়। এক সেকেন্ডকে হাজার ভাগ করলে অন্তবর্তী যে সময়টুকু পাওয়া যায়, সেই সময়টুকু 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না 'বর্তমান' নামের আখ্যা লাভের প্রত্যাশায়। বর্তমান হলো অতীত এবং ভবিষ্যতের যোগসূত্র মাত্র। ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন কোন এক সময়ে। কিন্তু 'সময়'কে সৃষ্টি করেছেন কোন্ সময় তার কোন হাদিস পাওয়া যায় না।" এরকম কল্পনা করা যেতে পারে যে, এমন একটি সময় ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির আগে যে কাল ছিল না, তা কল্পনাই করা যেতে পারে না। 'কাল' অনাদি তা প্রমাণ করার কোন অন্তরায় আর থাকে না। পক্ষান্তরে মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবার পর কাল আর থাকবে না—এমন কল্পনাও মানব মনে উদয় হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং কাল অনন্ত।

www.pathagar.com

আইনস্টাইন বিশ্ব প্রকৃতিকে একটি অনন্য রহস্য কাহিনীর গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, যার পাঠক হচ্ছেন বিজ্ঞানী-এবং চিন্তাবিদ, যারা বিভিন্ন প্রজন্মের ধারায় এক এক করে বিভিন্ন রহস্যের সমাধান খুঁজে বের করেন। বিশ্ব-রহস্যের কাহিনীতে কোনও কিছু চূড়ান্তভাবে সমাধান করা যায় না। সবকিছু হচ্ছে সম্ভাবনা আর মায়ার জালে ঢাকা। এখানে দেশ-কাল-ঘটনা-কার্যকারণ সবকিছুই আপেক্ষিক। চরম সত্য হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছা বা খায়েশ এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব। তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষের ভাষায়, বৌদ্ধ দর্শন মায়াকে বলে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা এবং একে বিকৃত মনের অবস্থা বলে মনে করে। যখন বস্তুর সামগ্রিকতাকে এক এবং অখণ্ড বস্তু বলে স্বীকার করা যায় না, তখনই অজ্ঞানতা বা বিশেষরূপে বস্তুচিন্তার উন্মেষ হয়, এবং বিকৃত মনের সমস্ত চিন্তাই এরূপ বৃদ্ধি পায়। জগতের সমস্ত ঘটনাই মনের বিভ্রম, এছাড়া অন্য কিছু বাস্তব সত্য নয়। আমরা যেসব আকার দেখি বা অনুভব করি তা কেবল মন বা মনের বিক্ষেপণ বা ছায়া। আমাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতার অবস্থা অনুযায়ী মন থেকে অসংখ্য বস্তুর উদ্ভব হয়। মানুষ এইসব বস্তুকে বহির্জগত বলে মনে করে। যা বর্হিজগত বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এটি মনের কাজ যা বহু বলে মনে হয়। শরীর, বিষয় সম্পত্তি এবং এসবের উপরে, আমি বলি, মন ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে বুটস্ট্র্যাপ দর্শন কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের সমর্থনে বলছে এই যে, পার্থিব জগতের নতুন ধারণায় জগতকে এক পরস্পর সম্পর্কিত গতিময় মাকড়সার জালের উর্ণনাভের) ঘটনার মত মনে হয়, যার কোনও অংশের উপাদান মৌলিক কোনও পৃথক বস্তু নয়, তারা এক অখণ্ড পূর্ণ বস্তুর একই রূপ উপাদান এবং তাদের সব অংশের সামগ্রিক পারস্পরিক সম্পর্ক সমগ্র জালটির পরিকাঠামো নির্ণয় করে।

প্রাচীন ধারণা—'এক শাশ্বত নিয়ম আছে, যা ভগবানের মনের বুদ্ধি ও যুক্তির অস্তিত্বের প্রকাশ এবং এই বিশ্বজগতের নিয়ামক। এর বিপরীতে এখন পদার্থবিদেরা মনে করেন, দৃশ্যমান প্রাকৃতিক ঘটনার সব থিওরি যা তারা উদ্ভব করেছেন, হলো নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে মানুষের মনের থেকে উদ্ভূত আমাদের মানস কল্পনার চিত্র, বাস্তব প্রকৃতি নয়। অবশ্যম্ভাবীরূপে এই মানস-চিত্রের কল্পনা সীমাবদ্ধ এবং প্রায় কাছাকাছি হলেও এর সমস্ত বৈজ্ঞানিক থিওরিও প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মত সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা চরমভাবে পরস্পর সম্পর্কিত এবং তার ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের সমস্ত ঘটনাগুলি বা সমগ্র সত্তাকে বুঝতে হবে, যা এক রকম অসম্ভব। বিজ্ঞান যে সফল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের সমস্ত ঘটনাগুলি বা সমগ্র সত্তাকে বুঝতে হবে, যা এক রকম অসম্ভব। বিজ্ঞান যে সফল তার কারণ বস্তু ও ঘটনার নৈকট্য সম্ভব এই তথ্যের আবিষ্কার। মানুষ কয়েকটি ঘটনার নিরীখে অভিজ্ঞতার আলোকে এক অনুক্রমে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের কিছু বিষয় বুঝতে পারে, প্রায় অনুরূপভাবে সবকিছু না বুঝেও। এটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া:

আসলে জগৎকে আমরা কতটুকু বুঝি? দেখুন, আমাদের এই পৃথিবীতে কত কিছুই না ঘটছে। যা ঘটছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতাকে আমরা যাচাই করি। আমাদের হাত বা পদক্ষেপ দিয়ে দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব মাপি, আমাদের অত্যন্ত স্বল্প

www.pathagar.com

জীবনকাল দিয়ে সময়কে যাচাই করি। এই পদ্ধতিতে মহাবিশ্বকে মাপা শুরু করলে তা হবে নিরবচ্ছিন্ন। অথচ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে খুব সূক্ষ্ম স্কেলে মাপা হলে দেখা যাবে মহাবিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন নয়, বরং ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত। এটি অভাবনীয় এক আবিষ্কার। বস্তু হোক বা শক্তি হোক, কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সবকিছুকে কণিকা বা তরঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করে। এই ছোট ছোট সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র অস্তিত্বের (ডিসক্রিটনেস) কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ফ্র্যাকটাল থিওরিতে। প্রকৃতির দ্বৈতাবস্থাসহ সবই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। এই অভিজ্ঞতাগুলো দিয়েই আমরা জগৎকে ব্যাখ্যা করি। অন্যথায় আমরা যা অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন বা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব, শ্রুডিঙ্গারের বেড়ালতত্ত্ব, মৌলিক পর্যায়ে মহাবিশ্বের ডিসক্রিটনেস, বোরের কোপেনহেগেন স্কুলের কোয়ান্টামে শুধুই সম্ভাবনাতত্ত্ব, এসবের সঙ্গে আইনস্টাইন এর আপেক্ষিক তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন ও সমগ্র মহাবিশ্বের বিরোধ গত একশত বছরেও সমাধান হয়নি। সৃষ্টিকর্তা কি তার সৃষ্টি নিয়ে পাশা খেলেন? আইনস্টাইনের এ প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন হকিং বলেন, 'স্রষ্টা শুধু পাশাই খেলেন না, মাঝে মাঝে তিনি তা এমন স্থানে নিক্ষেপ করেন যেখান থেকে এদের দেখা যায় না'। এ বছরের আগস্ট মাসে বিজ্ঞানী মার্ক বুখানান এ বিষয়ে আরও যোগ করে বলেন, কোয়ান্টাম জগতের কেওয়াস ও ফ্র্যাকটাল ধারণার পেছনে ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে—তা হল ব্রহ্মাণ্ডের দূরবর্তী অংশের সবার সঙ্গে সংহতি রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা। বলছেন ব্রহ্মাণ্ড-বিভাজনের কথা। অসংখ্য বিলিয়ন বিশ্বের কথা। সমান্তরাল বিশ্বের কথা—স্ফীত মহাবিশ্বের কথা। দৃশ্য কখনই দ্রষ্টা নির্ভর হতে পারে না, অর্থাৎ, সত্য রচিত হয় না।

অনেকগুলো অস্পষ্ট সম্ভাবনা থেকে একটি প্রতীয়মান হওয়ার পিছনে থাকে স্থান-কাল জ্যামিতির এবং মহাকর্ষ বলের। তা-ই ফারাক বাড়িয়ে তোলে সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে। শেষে টিকে যায় একটা। সেটাই দেখি আমরা। এর উল্টো কোয়ান্টামবাদীরা বলেছেন যে, শনাক্তকরণ আসলে একটি পারস্পরিক ক্রিয়া। যে কোন কণার সঙ্গে ক্রিয়ার ফলেই শ্রুডিঙ্গারের বিড়াল দুটো থেকে একটা হয়ে যেতে পারে। আসলে ঈশ্বর পাশা খেলবেন কিনা তা ঠিক করার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের কাজ শুধু এই বিশ্ব সম্পর্কে আমরা কতটা বলতে পারি তা ভেবে দেখা। বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সির একটিতে অবস্থিত নগণ্য একটি নক্ষত্রের চারদিকে একটি গ্রহে আটকে-পড়া এই পৃথিবীর মানুষ—পাঠান্তরে **বাংলাদেশের দুঃখী মানুষ—পরম সত্যের কিছুটা হলেও কাছাকাছি যেতে পারবে।** আর তা হবে খুবই বিস্ময়কর। তখন মহাবিশ্ব এতটা অবোধ্য থাকবে না, বরং দেখা যাবে স্রষ্টার সৃষ্ট সেই মহাবিশ্ব কতই না আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য।

১৩.৪ : মহাবিশ্বই কেবলই কি একটি শক্তি ক্ষেত্র (force field)

বিজ্ঞান পরমাণু ভেঙ্গে তার কেন্দ্রে প্রাথমিক কণাগুলিকে (প্রায় ২০০) পদার্থের সর্বশেষ মৌলিক ইট বা একক বলতে চাচ্ছে। এই কনিকাগুলিই কি মহাবিশ্ব নামক দালানের এক একটি ইট? উত্তরটা জানা নেই। খোঁজা হচ্ছে এর জবাব। হাইজেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ,

www.pathagar.com

তরঙ্গ-গতি আবিষ্কার আর মৌলিক বস্তুকণার পরিবর্তনীয় নকশারূপ ইঙ্গিত দান করে যে, অতিক্ষুদ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভৌত বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (সাইক্লোট্রন) তার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। সব পদার্থের সঙ্গেই তরঙ্গ ক্রিয়া জড়িত আছে, আর পদার্থ পরিহিত হয়ে আছে ক্ষেত্রের দ্বারা। এতদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, কিন্তু এখন সময় এসেছে (আশির দশক থেকে) আরও সার্বিক, অবরোহী পদ্ধতি গ্রহণের।

বিজ্ঞানের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সাধারণভাবে মানব-প্রকৃতির সীমাবদ্ধতারই একটি নির্দিষ্ট দিক। মন এবং শরীরের কাজকর্মের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ এখন পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। মনুষ্যসদৃশ হোমিনিইড গোত্রের সমস্ত প্রজাতিকে সে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে এবং মনুষ্যভিন্ন যে প্রকৃতি, জড় এবং চেতন উভয়ই তার বেশিরভাগটাতেই সে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষ তার বাড়তি ক্ষমতা ব্যবহার করছে ভালকাজের জন্য যেমনি (শিল্পকলা সৃষ্টি আর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কিত কৌতূহল পরিতৃপ্তি), তেমনি মন্দকাজেও (যুদ্ধ, সন্ত্রাস, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসবহুল জীবনযাপনে, এবং এসিড নিক্ষেপে ...)।

মানুষের এই বাড়তি ক্ষমতাটাও সীমাবদ্ধ। এটা এতটা বেশি নয়, যে, তা দিয়ে মানুষ বিশ্বনিখিলকে জানতে, বুঝতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিশ্বরূপের কেবলমাত্র এক অল্প অংশই মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিতে আসতে পারে। ইন্দ্রিয়গতভাবে প্রত্যক্ষ করা উপাদানগুলি হচ্ছে পদার্থের অন্যতম একটি দিক, কিন্তু সেটা সমগ্রচিত্ত নয়; এই উপাদানগুলির অভ্যন্তরে বহমান এক ধারা আছে যা মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে না।

দুটি ভৌত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে মহাশূন্যের ধর্মের অন্তর্গত। আইনস্টাইন ক্ষেত্রতত্ত্বগুলিকে সংহত রূপদান করতে চেষ্টা করেন তবে তিনিও মহাকর্ষ এবং তড়িৎচৌম্বক শক্তি এই উভয়ের জন্য সমন্বয়পূর্ণ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় সফল হননি। মহাকাশ, যা বস্তুশূন্য, তাও বিচ্ছিন্ন ভৌত বস্তুর মিলনসাধন ঘটায়, তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রেরণ করে, এবং নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে।

আইনস্টাইন বলেছেন, 'যেখানে শক্তির কেন্দ্রীভবন সবচেয়ে বেশি সেখানটাই বস্তু।" কোয়ান্টাম তড়িৎবিদ্যা অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শূন্যতায় ক্রমাগত কণা এবং তরঙের যুগপৎ সৃষ্টি ও লয় ঘটছে। এই সব কাল্পনিক কণা ও তরঙের আয়ুষ্কাল গড়ে মাত্র $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড। বিজ্ঞানীরা মনে করেন শূন্যতা আসলে এক ধরনের কোয়ান্টাম ফোম বা ফেনা। এই ফেনিল বুদ্বুদের রাজ্য পরমাণুর অভ্যন্তরে মানবদেহে মহাশূন্যে সর্বত্র বিস্তৃত। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা (এবং এমনকি চিন্তায়) কোনো কিছুর অস্তিত্বহীনতা বলে কিছু নেই, আছে শুধু রূপান্তর। ফলে একটি Sub-field এ $a = 0$ হলে অন্য কোনো Sub-field এ অন্য কোনো রূপে তাকে পাওয়া যাবে (—a) হিসাবে, এবং ফলে $a + (—a) = 0$।

বাস্তবতার কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হচ্ছে রূপান্তর। মহাবিশ্বে যত বস্তু ও শক্তি আছে তার বাইরে আর কিছুই নেই। তাই এক জায়গার বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হলে সে মহাবিশ্বের বাইরে চলে যেতে পারে না, এর ভিতরেই থাকে তবে অন্যরূপে। তেমনি শক্তিও শেষ হলে পর বস্তুতে এবং বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

১৭৫০-৬০ এর দিকে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ল্যাভাশিয়ে এবং রুশ বিজ্ঞানী লামোনোসভ "Law of conservation of Mass" and "Energy" আবিষ্কার করেন। এই ধারণা বিকশিত হবার পরই কেবল আইনস্টাইনের $E = mc^2$ অর্থাৎ শক্তির বস্তুতে রূপান্তর ধারণাটি পূর্ণতা পায়। তেমনি মৌলিক কোন বিজ্ঞানী না হয়েও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান রাখেন টমাস এডিসন। সত্যিকথা বলতে কি মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে (উনি বেঁচে ছিলেন ৮০-এর মত) এডিসন ১০০০টি আবিষ্কারের প্যাটেন্ট নেন যার বদৌলতে আমেরিকায় প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাধিত হয়ে যায়। টমাস আলভা এডিসনের মাথায় শুধু Transformation phenomenonটাই ঘুরপাক খেত। শুধু বস্তু জগতেই নয়, জীবজগতেও জন্ম-মৃত্যুর চক্র হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর মাত্র।

বৈদ্যুতিক মোটরে বিদ্যুৎ (A) রূপান্তরিত হচ্ছে চুম্বকে (B) এবং উক্ত চৌম্বকশক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে গতি শক্তিতে (C)। এই গতি শক্তি আবার বৈদ্যুতিক শক্তির পূর্ববর্তী মানে রূপান্তরিত হতে পারছে না। তা যদি হতো, তাহলে প্রথমে কিছু বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে পরবর্তীতে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ না চালিয়ে মোটরটিকে অনন্তকাল ঘুরানো যেত।"

হক কথা। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ এ কাজটা করতে পারে না। এ ব্যাপারে এখানে Thermodynamics এর 2nd law টা এবং "Cycle of Carnot" বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখনীয়। দেখা গেছে বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকেই Order-এর সঙ্গে disorder (entropy) বেড়েই চলছে। disorder যখন maximum তখনই জীবনের অবসান হয়, তারা বা গ্যালাক্সির মৃত্যু হয়। এটা সৃষ্টিকর্তার অনেক লীলাখেলার মধ্যে একটি অপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ লীলা।

গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি Complete Field বা ক্ষেত্রেই বটে, তবে প্রতিটি গ্যালাক্সি ও (তদ্রূপ প্রতিটি তারাজগৎ, মানুষ এরকম একটি ফিল্ড কেননা তা একটি Unit হিসাবে exist করছে এবং তা অন্য Unit থেকে বিরাট দূরত্ব প্রাচীর দ্বারা আলাদা রয়েছে। ফলে একটি গ্যালাক্সিতে ঐ দ্বিতীয় সূত্রানুসারে entropy বাড়তে থাকলে তা গ্যালাক্সিটির heat death এ গড়াতে পারে (ব্ল্যাকহোল পরিণতি)। কিন্তু অন্য গ্যালাক্সিগুলিতে (Closed system) এই entropy নাও বাড়তে পারে।

এই দুটি মতবাদের ঝগড়া গত দেড়শ বছর ধরে চলছে। আজও মীমাংসা হয়নি এবং বিগব্যাঙ দিয়ে নাকি স্পন্দনশীল ফাঁপানো বিশ্ব দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডটির যাত্রা শুরু হয়েছিল তার পূর্ণ জবাব এখনও আমাদের হাতে নেই।

১৩.৫ : অ্যাডেলম্যানের ডিএনএ কম্পিউটার

মার্কিন বিজ্ঞানী লেনার্ড অ্যাডেলম্যান একুশ শতকের কম্পিউটার জগতে চূড়ান্ত চমক আনতে চলেছেন। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই এই অসাধারণ প্রতিভাবান ইহুদী ড. অ্যাডেলম্যান এক বিস্ময়। জীববিজ্ঞান থেকে গণিত শাস্ত্র, কম্পিউটার থেকে রসায়ন, সর্বত্রই তাঁর গবেষণার নামডাক। অ্যাডেলম্যান বরাবর ভাবতে ভালবাসেন। দৃশ্যজগতের

www.pathagar.com

বাইরে অন্তর্মুখী অনুভূতিগুলি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত। সাহিত্য ছেড়ে রসায়ন, তারপর ডাক্তারী, শেষে গণিতশাস্ত্রে ১৯৬৮ সনে লেনার্ড ব্যাচেলার ডিগ্রি পান। তখন তার বয়স বাইশ বছর। গবেষণাগারে এক্সপেরিমেন্ট করে, (পদার্থবিদ্যা) তাঁর মন বসলনা। তিনি ভাবতে ভালবাসেন। তাই শেষে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয় নিয়ে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. পড়া শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে কুর্ট গোডেলের বিখ্যাত এক সূত্র 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় সাড়া ফেলেছে। গোডেল প্রমাণ করেছেন **"মহাবিশ্বে কিছু কিছু সত্য আছে যা কোনদিই সত্য বলে প্রমাণ করা যাবে না। আবার এমন কিছু অসত্য আছে যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করাও অসম্ভব।"** গোডেলের তাত্ত্বিক প্রমাণ বিংশ শতাব্দীর সেবা গাণিতিক আবিষ্কার বলে গণ্য করা হয়। এই আবিষ্কারের বিবরণ পড়ে লেনার্ড খুব উৎসাহিত হলেন। তিনি ক্রিপ্টোলজি বা সাংকেতিক ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ১৯৭৫-এ পি.এইচ. ডি. শেষ করে এম আইটিতে সহকারী অধ্যাপক হলেন। তারপর ক্যালিফোর্নিয়াতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৩ সনে তারই তত্ত্বাবধানে তার ছাত্র ফ্রেড কোহেন (আরেক ইহুদী জিনিয়াস) খুঁজে পেলেন কম্পিউটার ভাইরাস (এক ধরনের সাংকেতিক প্রোগ্রাম যা হার্ডডিস্কের বারোটা বাজায়। অ্যাডেলম্যানের দ্বিতীয় বিস্ময়কর সৃষ্টি হল ঠিক এগারো বৎসর বাদে সেই ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ সনে তাঁর এককভাবে লেখা ডি এন এ কম্পিউটার বিষয়ে প্রবন্ধটি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হল। এ যাবৎ প্রচলিত যাবতীয় কম্পিউটার সম্পর্কিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাডেলম্যান দেখালেন আমাদের দেহের কোষের জিনে সঞ্চিত ডিএনএ দিয়েও কম্পিউটার তৈরি সম্ভব। (একেবারে ভগবানের মাইন্ড পড়তে সক্ষম হয়ে তার সৃষ্টিস্থ কার্যের হাতেও পৌঁছে গেলেন।) এবং তাতে যে পরিমাণ গণনা করা যাবে, প্রচলিত সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রগণকেও তা কোনভাবেই করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও অ্যাডেলম্যান আরও কিছু চমক সৃষ্টি করেছেন। কোনও সংখ্যা মৌলিক কিনা তা নিশ্চিত বা ডিটারমিনিসটিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। গত ২ হাজার বছর ধরে প্রচলিত এই তথ্যটা তিনি বাতিল করে সংখ্যাতত্ত্বের প্রোবোবিলিটি থিওরি ব্যবহার করে প্রমাণ করলেন কোনও সংখ্যা মৌলিক কিনা তার প্রমাণ সম্ভাব্যতা থেকেও করা যায়। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাই মৌলিক সংখ্যার প্রমাণ। অ্যাডেলমান একাই কাজ করেন। নিজের ঘরে একটি মাত্র কম্পিউটার এবং ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে তার অফিস। সেখানে বসে তিনি মহাশূন্যে ব্ল্যাকহোল এবং আপেক্ষিকতাবাদ থেকে জিন এবং ডি-এনএ সম্পর্কে ভাবতে ভালবাসেন। ডি এন এ দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করার আগে তিনি টানা ছ'মাস কেবল ভেবেছেন। তাঁর ভাষায় দিনে বারো ঘন্টা কেবল বসে ভাবা কঠিন কিছু নয়। এ ব্যাপারে তাকে রুশ বিজ্ঞানী চেলিপোভ এবং মুসলিম বিজ্ঞানী ড. এস. সালাউদ্দিন যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

১৩.৬ : আলোর চাইতে দ্রুতগামী সংকেতের প্রমাণ

মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে বলেছিলেন, আলোর চেয়ে বেশি জোরে আর কিছুই ছুটতে পারে না। বিজ্ঞানের সব পর্বেই তাই আলোর

www.pathagar.com

গতিকে চূড়ান্ত সীমা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে এই সীমা ভুল। আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিষয়টিতে বিশ্বাস করতেন না। ভুল সেখানেই। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. নিকোলাস গিসিন একথা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা আলোর গতির কমপক্ষে ১০ হাজার গুণ গতিতে সাত মাইল দূরত্বে রাখা দুটি ফোটন কণার মধ্যে সংকেত পরিবহনের খবর জানিয়েছেন। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় এ বিষয়ে এক বিস্তারিত নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বিশারদেরা সাতের দশক থেকেই এ বিষয়ে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

কোনও উচ্চ-শক্তির ফোটন কণা ভেঙে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দুটি ফোটন কণাকে 'মানিক জোড়' কণা বা এনট্যাঙ্গলও কণা বলে। এদের উৎস এক। তাই যত দূরত্বেই যাক, কণা দুটির মধ্যে যোগাযোগ অটুট থাকে। এ যেন একই ঘরের দুই ভাই। একজন দেশে, অন্যজন বিদেশে। এবং মনের টান অটুট থাকে। আইনস্টাইন বরিস পোদলস্কি এবং নাথান রোসেন-এর এই ধরনের জড়ানো কণার সম্পর্কে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভবিষ্যৎবাণী নস্যাৎ করে ১৯৩৫ সালে এক বিখ্যাত গবেষনা পত্র লেখেন। আইনস্টাইন কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি যে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কোনও সংকেত থাকতে পারে।

গিসিনের পরীক্ষা অবশ্য কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। এই তত্ত্বানুযায়ী জড়ানো কণা দুটির মধ্যে দূরত্ব যদি ব্রহ্মাণ্ডের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হয়। (মাঝে ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষের দূরত্ব), তবেও তারা পরস্পরের খবর পাবে তৎক্ষণাৎ। এই সংকেত আদান প্রদানের জন্য কোনও সময়ই লাগবে না। ঘটনা ঘটবে তাৎক্ষনিক। আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী বস্তুটির ভর যদি অসীম হয়ে যায় আলোর গতির সমান গতি প্রাপ্ত হলে পর তাহলে এই বস্তুটি হবে স্বয়ং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিজে। তখন সব গতি স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ একই সময়ে সর্বত্র-সব বিন্দুতে তথ্য তথা সৃষ্টিকর্তা অবস্থান করবেন। পরম ব্রহ্মগতি আরকি! হিন্দু দর্শন মতে পরব্রহ্মার রয়েছে এই গতি-আলোর গতির চাইতে নয় কোটি গুণ বেশি গতি!!

প্রথমে পোদলস্কি, রোসেন, পরে, 'বেল'। আজ 'গিসিন' আগামীকাল 'এক্স' পূর্ণভাবে তা প্রমাণ করে দেবেন। বিংশ শতাব্দী শেষ হয়েছে সবে মাত্র।

আইনস্টাইন দেখিয়েছেন আমরা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা এই তিন মাত্রার সঙ্গে সময় (স্থান+কাল) নামক ৪টি মাত্রায় বাস করি। ভালো, এখন বিজ্ঞানীরা দশটি মাত্রার কথা গণিতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। অনেক উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিচে তাকালে এই দশ মাত্রা অনুভূত হয়। সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান নাকি শত মাত্রায়। এমনিভাবে দেখা যাবে মহাবিশ্বে অসংখ্য (অসীম) মাত্রা রয়েছে। এতে বুঝা যায় আমাদের মুক্ত-ইচ্ছা বা স্বাধীনতা কেবল শুরুর ক্ষেত্রেই খাটে, সমাপ্তির ক্ষেত্রে নয়। সকল সমাপ্তি বাস্তবতার (all mighty) নিজের হাতে। সময়কে আমরা কার্যকারণের (cause-effect) প্রবাহ বা প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেই। সেই সীমার বাইরে আমরা সময়কে বলি মায়া—তাকে আর তখন অনুভব করতে পারি না।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের এতসব উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অশেষ বৈচিত্র্য সমাকূল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও এবং এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বদা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা চললেও, এর সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে একটা একত্ব আছে, একটা সংঘবদ্ধ ভাব আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই এর একটা প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই অনন্ত শক্তির আঁধার, স্ব-সত্তায় সত্তাবান, স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ংক্রিয় ও স্বতন্ত্র। সেই প্রমাণকেন্দ্র থেকেই চিরকাল অসংখ্য প্রকার শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, অসংখ্য প্রকার রূপ-রূপান্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই প্রাণকেন্দ্রই স্বীয় অসীম শক্তিতে বিশ্বের সফল অংশকে, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিধৃত করে সংঘবদ্ধ করে ধরে রেখেছে। সেই প্রাণকেন্দ্রই বিশ্বের সকল ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক সত্ত্বার অফুরন্ত উৎস, আশ্রয় ও নিয়ামক।

শুধু বর্হিবিশ্ব নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও এই বিশ্ব প্রপঞ্চেরই অন্তর্গত এবং সেই একই মহান শক্তিকেন্দ্র হতেই অভিব্যক্ত ও তদ্বারাই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তিময় বিশ্বের সকল শক্তির মূলধারা মহাশক্তি হচ্ছে স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, স্বয়ংক্রিয়। এটাইতো চৈতন্যের লক্ষণ। এই মহাশক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে আমরা তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলে অভিহিত করতে পারি। তাকেই তো ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সৃষ্টিকর্তা—আল্লাহ বলে বর্ণনা করেন ও উপাসনা করেন। তাই সৃষ্টির স্রষ্টা ও ঐশী শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নেই।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

কালে কালে মহাকালের বিস্ময়কর তত্ত্বগুলি

১৪.১ : স্থান ও কাল নহে, শুধুই স্থান-কাল

শতবর্ষ পূর্বে স্থান ও কালের ধারণা আলাদাই ছিল। ইউক্লিডের জ্যামিতির জগতে মানুষ বাস করত। তাই বিশ্বজগতের অনেক ঘটনাই আমরা বুঝতে পারতাম না। আইনস্টাইন বলতেন "এজন্য আমাদেরকে নিউটনের মধ্যাকর্ষীয় সূত্র না জানলেও চলত। তবে আমাদের জানতে হবে যে আমরা ইউক্লিডের সমতল বিশিষ্ট সরল পৃথিবীতে বাস করি না। আকর্ষণ ব্যাপারটা চতুর্মাত্রিক বিশিষ্ট চক্রকার জগতের স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।"

ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটি কালের ধারণা জগতে বাস করি। আমাদের চিন্তা, মননে, দৈনন্দিন জীবনের কাজে আমরা এতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, কাল সম্পর্কে অন্য কোন ধারণা আমাদের মনে আসেই না বা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করি না। এই শতকের শুরুতে আইনস্টাইন আমাদের চোখ খুলে দিলেন ; বললেন, স্থান-কাল ও গতি সব কিছুই আপেক্ষিক; বিশেষ কোন স্ট্যান্ডার্ড টাইম নেই, সবই লোকাল টাইম।'

প্রকৃতিতে সঠিক 'সময়' যে কি তা এখনও আমরা জানি না ;

সময়ের সরলরেখায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবি একাকার। যে ঘটনা আজ আমার নিকট অতীত, তা অপরের নিকট বর্তমান, আবার তৃতীয় একজনের নিকট 'ভবিষ্যত'। কাজেই সময় একটা 'আপেক্ষিক' ধারণা মাত্র। পনেরশত কোটি বছর দূরের যে ছায়াপথের আলো আমাদের পৃথিবীতে এখন রেকর্ড হল, এতদিনে ঐ গ্যালাক্সি হয়ত বিলীন হয়ে গেছে। ঐ ছায়াপথের আলোর ছবিত দেড় হাজার কোটি বছরের পুরানো। তাই আমার কাছে যা বর্তমান, তা ওদের কাছে অতীত আর যাদের কাছে ঐ আলো পৌঁছেনি তাদের কাছে তা ভবিষ্যত ; দুটি ঘটনা একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলে মনে হবে না ; দুটি ঘটনার মধ্যে সনাতন কোন কাল বা দূরত্ব নেই ; সৃষ্টি জগতে স্থান ও কাল নামে আলাদা কোন জিনিস নেই ; যা আছে তাহা স্থান-কাল এক অবিভাজ্য সত্ত্বা। অর্থাৎ স্থানের মধ্যে সময়ও মিশে আছে ; 'সময়' হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর (দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা) চতুর্থ মাত্রা বা বিস্তৃতি ; আমাদের 'স্থান-কাল' যেন ঐ বিছানো চাদরের মত, যার উপর অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাপঞ্জি একে একে ছায়াচিত্রের ন্যায় আঁকা রয়েছে। আমরা একটির পর আর একটি দেখে যাচ্ছি মাত্র। তাই দেখার ব্যবধানের কারণে

www.pathagar.com

আমাদের কাছে 'সময় ও দূরত্বের' ধারণা জন্মেছে। কিন্তু বিশ্ব জগতের নিয়ন্তার কাছে এর কোন মূল্য নেই। তাঁর কাছে 'সময়' বা 'দূরত্ব' বলতে কিছুই নেই। তিনি একই সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত অবলোকন করছেন। তিনি কাল ও স্থানের উর্ধ্বে। সবই তাঁর কাছে চির-বর্তমান।

পবিত্র কোরআনের সূরা 'বাকারা', 'আসহাবে কাহাফ'ও, 'ইসরায়' সময়ের আপেক্ষিকতার চমৎকার বর্ণনা দেয়া আছে।

১৪.২ : অমরত্বের পদার্থবিজ্ঞান : টিপলারের ওমেগা পয়েন্ট থিয়োরী

('The Physics of Immortality : Modern Cosmolosy, God and the Resurrection of the Dead' by Frank Tipler, Macmillan, pp 528.')

আজ থেকে দশ লক্ষ কোটি কোটি বছর (১০[১৯]) পরে 'সময়' শেষ হয়ে যাবে। মহাকালের করাল গ্রাসের কবলে পড়ে 'কাল' হারাবে তার অস্তিত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যুর সাথে সাথে সময়ের ইতি ঘটবে ঐদিন। এর অনেক, অনেক আগেই মুছে যাব আমরা। আমাদের হারিয়ে যাওয়ার পরে এই ব্রহ্মাণ্ডে শুরু হবে মৃত্যুর মিছিল। নক্ষত্রেরা স্ফীত হয়ে গ্রাস করবে তাদের গ্রহ-উপগ্রহদের। গ্যালাক্সিরা উবে যাবে নীহারীকাপুঞ্জ থেকে। জন্ম নেবেনা আর কোন নতুন তারা। বিরাট ভারী নক্ষত্রেরা বদলে যাবে নিউট্রন কণাপিণ্ডে কিংবা ব্ল্যাক হোল-এ। জ্বালানি নিঃশেষ করে দীর্ঘায়ু তারারা বনে যাবে ক্ষুদ্রাকৃতি শ্বেতবামন। তারায় তারায় সংঘর্ষে ছিটকে পড়বে তাদের গ্রহেরা। নিউট্রন পিণ্ড বা শ্বেতবামনেরা হবে শীতল। মহাবিশ্বের প্রসারণ শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে মহাকর্ষের টানে সংকোচনের সূত্রপাত 'বিগ ক্রাঞ্চ'—মহাসঙ্কোচন। সে এক মহাপ্রলয়। টিপলার বলছেন 'সিঙ্গুলারিটি' বিন্দুতে সেখানে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে শেষ হবে। এই বিন্দুটিই হচ্ছে ভগবান, ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা। মহাপ্রলয়ের পর তিনিই আবার আমাদেরকে জীবিত করে তুলবেন যেমনটি ধর্মগ্রন্থে অঙ্গীকার করেছেন। টিপলার অঙ্ক কষে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ধর্ম আর বিজ্ঞানের যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, শত্রুতামী শুরু হয়েছিল গ্যালিলিওর সময়ে তা বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত বিশ বছর ধরে এমন আলামতই দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৮-তে নিউজউইক এ বিষয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছাপিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান-সাময়িকী ও সম্মেলনগুলিতে এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত-বিনিময় ও আলোচনা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঈশ্বর আছেন। আছে স্বর্গ, আছে পুণর্জন্ম। ফিজিক্সের মতে, 'থিওলজি ইজ নাথিং বাট ফিজিকাল কসমলজি।'

ফ্রিজফ কাপরা-র 'দি টাও অব ফিজিক্স' কিংবা গ্যারি জুকড-এর 'দি ডান্স অব উলি মাস্টারস' গ্রন্থদ্বয়ে প্রাচ্যের ধর্মচিন্তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা শুরু হবার পর ইতোমধ্যে সময় অনেকদূর পথ পাড়ি দিয়েছে। এখন টিপলার বলেছেন : সংজ্ঞা বলছে মহাবিশ্ব সব কিছুর আধার। সমস্ত সত্যেরও। তা হলে, যদি ঈশ্বর সত্য হন হবে তিনিই এই মহাবিশ্ব। অথবা তার অংশ বিশেষ। পদার্থবিদ্যার লক্ষ্য সত্যের চূড়ান্তরূপ অনুধাবন। যদি ঈশ্বর সত্য হন তবে বিজ্ঞানীরা শেষমেষ খুঁজে পাবেনই তাকে। আমার

www.pathagar.com

বক্তব্য, পদার্থবিদরা সম্ভবত খোঁজ পেয়েছেন তাঁর। তিনি সর্বত্র। আমরা দেখছিনা, কারণ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাণ্ড বড় মাপে বিচার করছি না।'

মহাবিশ্বের জন্ম দু'হাজার কোটি বছর আগে হয়েছে, মৃত্যু হবে দশ হাজার কোটি বছর পরে, মানে হাতে আরও ৫ গুণ বেশি সময় আছে। অর্থাৎ 'স্পেস আর টাইমের প্রায় পুরোটাই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। সময়ের শেষ সীমায় চূড়ান্ত মুহূর্তটি হচ্ছে বিন্দুবৎ বিশ্ব-ফাইনাল সিংগুলারিটি বা 'ওমেগা পয়েন্ট'—গ্রীক বর্ণমালার শেষ অক্ষর। টিপলারের গণনা অনুযায়ী -ওমেগা-পয়েন্টে পৌঁছলে তখনকার (হাইপার স্পেসের) সুপার কম্পিউটারের অমিত শক্তিবলে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ তাবৎ প্রাণীকে আবার তৈরি করা যাবে। পুণর্জন্ম ঘটবে কম্পিউটারে অর্থাৎ ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে ঠিক যেমন করে আজকের কম্প্যুটার তৈরি করে। আপাত সত্যের (virtual reality) এর জগৎ + কৃত্রিম পৃথিবী। তবে ওমেগা-বিন্দুতে পুনর্জন্ম কৃত্রিম মনে হবে না তখন। পরকালে, পরজন্মে বিশ্বাস অনেক প্রাচীন ধর্মেই আছে। এই ধারণাই ধর্মভীরু মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে শেখায় প্রশান্তির মধ্যে। অথচ ও রকম আশ্বাস নেই বিজ্ঞানে। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু ষোড়শ শতাব্দীতে। কোপারনিকাস বলেছিলেন পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র নহে, মানুষ ও তাই। ডারউইন বললেন মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয়, মানুষ আসলে পশুর উত্তরসুরি। আর ফ্রয়েডের মতে, মানুষ তার মনের প্রভু নয় বরং সে তার দাস। ভাইনবার্গ (ড্রিমস অব এ ফাইনাল থিওরি 'ও' ফার্স্ট থ্রি মিনিটস এর লেখক), বার্ট্রান্ড রাসেল প্রচার করছেন অবজেকটিভ রিয়েলিটি নীতি। এতে বলা হয় কে মানুষ? কি তার প্রয়োজন এই বিশ্বের কাছে? সে থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? মোটামুটিভাবে এক বিদ্বেষপরায়ন বিশ্বপিতার রূপরেখা কিংবা এর চেয়েও উদ্দেশ্যবিহীন আরও অর্থহীন এক বিশ্ব আমাদের উপহার দেয় বিজ্ঞান। আমাদের বিশ্বাসবোধের ঠাঁই হতে পারে কেবল ওই জগতেই। মানুষ যেন কতগুলো কারণের জন্য আবির্ভূত। এমন সব কারণ, যাদের কোনও খেয়াল ছিল না অন্তিম লক্ষ্যের ব্যাপারে। যেন মানুষের উৎস, বিবর্তন, আশা বেদনা, ভালবাসা ও বিশ্বাস কতগুলো পরমাণুর আকস্মিক সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেন এমন কোনও তেজ, বীরত্ব কিংবা চিন্তা ও চেতনার গুরুত্ব নেই।—যা পারে ব্যক্তি বিশেষের জীবনকে কবরের ওপারে নিয়ে যেতে। যেন যুগ-যুগের তাবৎ পরিশ্রম, সমস্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠা, মানব-মনীষার মধ্যাহ্ন দীপ্তি—সব কিছু বিশাল এই সৌরজগতের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাওয়ার জন্য তৈরি। যেন মানব জাতির সাফল্যের বিশাল ইমারত খানা একদিকে চাপা পড়ে যাবেই বিলীয়মান বিশ্বে'। এরই প্রতিধ্বনি করেন ওয়েনবার্গ, মানুষ এ বিশ্বাস কিছুতেই এড়াতে পারে না যে, এই বিশ্বের সঙ্গে তার একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। মানতে চায় না যে, তার অস্তিত্ব মোটামুটি কতগুলো আকস্মিক ঘটনার ফলশ্রুতি। বিশ্বের জন্ম ও মৃত্যু ...এসব যতই বোধগম্য হয়, ততই উদ্দেশ্যবিহীন মনে হয় তাকে।

এই অর্থহীনতা থেকেই যেন বিশ্বকে মুক্তি দিয়েছিলেন জন ব্যারো আর টিপলার তাদের বইয়ে 'দি অ্যানথ্রোপিক কসমলজিক্যাল প্রিন্সিপ্যাল।' তারা বলতে চেয়েছেন, 'এই বিশাল বিশ্বে মানুষ অকিঞ্চিতকর নয়, নয় নগন্য এক দর্শক। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে, তার আবির্ভাব হয়েছে এক বিরাট ভূমিকা পালন করার জন্য।

www.pathagar.com

নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রানুযায়ী দুটো বস্তুর ভর M (বড়টির) এবং m (ছোটটির) হলে, এবং ওদের মধ্যকার দূরত্ব D হলে, যে আকর্ষণ বলে (F) একটা অন্যটাকে কাছে টানবে তা হলে $F = G \times \frac{M \times m}{D^2}$, এখানে G হল 'মহাকর্ষীয় ধ্রুবক'-এর মান কম হলে F-এর মান কমবে, এর মান বাড়লে F ও বেড়ে যাবে। F-এর মান বাড়লে কমলে গ্রহগুলির গতিপথ বদলে যেত—মানুষ আবির্ভূত হত না পৃথিবীতে। মহাকর্ষের শক্তি যদি বর্তমানের চেয়ে কম হত তাহলে সূর্য হত বিরাট মাপের, আর এর আয়ু হত কয়েকবছর। তাহলে পৃথিবী গ্রহে প্রাণের আবির্ভাবের জন্য সময় (৩৬০ কোটি বছর) মিলত কোথায়? এই G-এর মান ঠিক এমন হওয়া, যাতে সব কিছু চলতে পারে ঠিকঠাক, আর এক সময়ে প্রাণের আবির্ভাব ও বিকাশে সহায়ক হতে পারে—এই চিন্তাধারার নামই অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল'।

এরকম ধ্রুবক আরও আছে পদার্থ বিজ্ঞানে। এদের মানগুলি মেলে কেবল কতগুলো পরীক্ষায়। দেখে শুনে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন সৃষ্টির সময় ওগুলোর ওই পূর্ব নির্দিষ্ট মান নিয়েই জন্মেছে। যাতে আর কখনও এক চুল এদিক-ওদিক না হয় ওদের মান। পাছে তাতে বদলে যায় বিশ্বের চেহারা। আর তাতে বিঘ্ন ঘটে পৃথিবীতে মানুষের আসার। কোরআনে ঠিক এমনটিই বারে বারে ঘোষিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : জাকির হুসাইন : 'কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস; (রাহেল পাব, ১৯৯৯)।

এই জন্যই বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'এই বিশ্বে মোটেই আগন্তুক মনে হয় না আমার নিজেকে। যতই বিশ্লেষণ করি একে, যতই অনুধাবন করি এর গঠন, ততই প্রমাণ দেখতে পাই যে, কোন না কোনভাবে ব্রহ্মাণ্ড যেন জানত আমরা আসছি।' মানুষের আবির্ভাবের জন্য বিশ্বের নিজেকে এরকম প্রস্তুত করাকেই বিজ্ঞানীরা বলেন, 'ফাইন টিউনিং'। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের ইতিহাসে একম 'ফাইন টিউনিং'-এর উদাহরণ ভুরি ভুরি। দেখা গেছে 'বিগ ব্যাঙ' এর এক সেকেণ্ড পর প্রসারণের হারটা যা ছিল তা না হয়ে যদি দশ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগের ১ ভাগ কম হত তা হলে অনেক আগেই প্রসারণ থেমে শুরু হয়ে যেত সঙ্কোচন। অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপ্‌ল-এর যুক্তি যেন সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের নামান্তর।

১৪.৩ : বিগ-ব্যাঙ কি সত্যিই ঘটেছিল ?

বিগ ব্যাঙের বিপরীতে বাউন্স (bounce) বা সহসা লাফিয়ে উঠা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থিয়োরীও প্রচলিত আছে বিজ্ঞানী মহলে। সঙ্কোচনের পর মহাবিশ্বে বিস্ফোরণ না ঘটে বাউন্স হয়ে পূর্বতন মহাবিশ্বের পুনর্জন্ম ঘটে-বিস্তার লাভ করে তার সীমানা। তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুসারে এটা যদি অসম্ভব ছিল তবে নব্বই সালে দু' কানাডীয় বৈজ্ঞানিক সিক্কেমা (Sikkema) এবং ভার্নার ইসরায়েল গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করেন যে এমনটি ঘটা সম্ভব। তারা দেখান যে মহাসঙ্কোচনের সময় কৃষ্ণবিবরগুলি সংযোজিত হয়ে যাবে, ফলে মহাবিশ্ব আবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠে (ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে) প্রসারিত হওয়া শুরু করবে। সত্তরের দশকে হকিং প্রমাণ করেন যে কৃষ্ণবিবর এবং তাপগতি বিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে—বিবরের বহিঃস্থ আয়তন কমতে পারে না, তা পূর্ববত থাকবে বা আরও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

দুটি কৃষ্ণবিবর সংযোজিত হলে পর তাদের যোগফল বেশি হবে তাদের আলাদা আলাদা ভর-আয়তনের সংখ্যার চাইতে।

কৃষ্ণবিবরের গঠনের সময় এর ঘটনা দিগন্ত (event horizon) (কৃষ্ণবিবরের পৃষ্ঠদেশ বন্ধ করে এর ভিতরের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ) সাবানের বুদ্বুদের ন্যায় কম্পিত হয় (quivers)। এই কম্পনগুলি মধ্যাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি করে যার কিছু বর্হিবিশ্বে ছুটে যায়, কিছু কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরস্থিত সিঙ্গুলারিটি বিন্দুতে ছুটে যায়। অন্তর্গামী তরঙ্গগুলি উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সীতে পরিবর্তিত হবে। ফলে এনার্জী বাড়বে। যেহেতু ভর হচ্ছে শক্তির একটি রূপ, তাই এই বিকিরণ কৃষ্ণবিবরের ভেতরের ভর অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। সিক্কেমা এবং ইজরায়েল হিসাব করেছেন, ৫টি সূর্যের সমান ভরের কোনো তারকা যদি কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত হয় তাহলে এটির শেষ ভর হবে দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভরের চাইতে $১০^{৫৭}$ গুণ বেশি!! (nature, vol, 249, p45). কিন্তু ব্ল্যাকহোলের বাইরে অবস্থিত বিশ্ব এই ভর অনুভব করবে না। মহাসঙ্কোচনের ১ বছর আগে গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্রসমূহ (প্রকাণ্ড কৃষ্ণবিবর) সংযোজিত হতে থাকবে এবং $১০^{-৩৩}$ সেকেণ্ডে (প্ল্যাঙ্ক টাইম) সঙ্কোচনটি ঘটবে। এ সময় যুগপৎভাবে সব কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্রগুলি একের উপর অন্যটি পতিত হবে। এতে কোন সংঘর্ষ ঘটবে না, সুশৃঙ্খলভাবে তা হবে। পরবর্তী প্রসারণ এবং আকস্মিক ধ্বংস কিন্তু পূর্বোক্তটির মত একই রকমের হবে না। এন্ট্রপি বাড়বে এক চক্র থেকে পরবর্তী চক্রে। অর্থাৎ প্রসারণ দশাটি পূর্বেরটির চাইতে বড় হবে। এভাবে যদি আমরা পেছনের দিকে এগোই তা হলে দেখা যাবে আমাদের বিশ্বের শুরু হয়েছিল একটি 'বেবী ইউনিভার্সে', একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে যা শূন্য থেকে কোয়ান্টাম তরঙ্গায়িতের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছিল। অর্থাৎ কোনো বিগব্যাঙ হয়নি। ১৯৬০ এর দিকে বিগব্যাঙ থিয়োরী এবং স্টেডি স্টেট থিয়োরীর সঙ্গে বিগ ব্যাঙ জয়ী হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় বিগব্যাঙের বিকল্প থিয়োরীর কথা উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতের পুনা ইন্টার-ইউনিভারসিটি সেন্টার ফর এস্ট্রনমির প্রফেসার জয়ন্ত নারলিকার এবং ফ্রেড হয়েল (ক্যাম্ব্রিজ) (বিক্রমসিংহ এবং ভিসি রেড্ডীস সহ) এই বিকল্প-থিয়োরীর প্রবক্তা। তাদের মতামত হচ্ছে এরূপ : মহাবিশ্বে বহু তারকা আছে যাদের বয়স মহাবিশ্বের চাইতে বেশি এবং এদের কোয়াসারের সংখ্যা অত্যাধিক।কোয়াসারের রেড শিফ্‌ট খুবই দ্রুত সময়ে ঘটে যা হাবলের সূত্র মানে না। হাবলের ধ্রুবক হিসাব করলে বিশ্বের বয়স ১৩০০ কোটি বছর হয়। কিন্তু কোয়াসারের রেড শিফটে হাবলের ধ্রুবক বসালে ঐগুলির বয়স ১৭০০ কোটি বছরের বেশি হয়। তা হলে সত্যটা কোথায়? বাপের চাইতে ছেলের বয়স বেশি!

বিগব্যাঙ থিয়োরীর অনুসারীরা গ্যালাক্সি গঠনের উপাদান ও নীতির সামঞ্জস্যের জন্যে বাধ্য হয়ে ধরে নিলেন যে আলোকিত বস্তুপিণ্ডগুলির (তারা, গ্যালাক্সি, নীহারিকা) বাইরে শতকরা ৯৯ ভাগ মহাবিশ্ব ভরা আছে অদৃশ্য বস্তু দ্বারা (dark matter)। এ অদৃশ্য বস্তুগুলি কি কি? অনুমান করা হচ্ছে এরা ফোটিনোস (Photinos), গ্র্যাভিটিনো (gravitinos), এক্সিয়োনস (axions) ইত্যাদি। পৃথিবীর কোন ত্বরকযন্ত্রে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

এরকম কোন কণা ধরা পড়েনি। যেহেতু মহাবিশ্বের বয়স বেশ হয়েছে তাই এত পুরানো গ্যালাক্সি আর আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়ার কথা নয়। অথচ বেশ নবীন গ্যালাক্সি কিছু পাওয়া গেছে।

বিগব্যাঙ থিয়োরী অনুযায়ী কোন নতুন গ্যালাক্সির জন্ম হবার কথা নেই কেননা ঐ বিস্ফোরণের সময়ই সবার জন্ম এক সাথে একেবারেই হয়ে গেছে। যেহেতু এখনও নতুন নতুন তারকার জন্ম হচ্ছে, নবীন গ্যালাক্সির আবির্ভাব হচ্ছে, আর এই প্রপঞ্চ মিল খায় স্টেডি স্টেট থিয়োরীর সঙ্গে। এ থিয়োরীতে "বস্তু সব সময় তৈরি হচ্ছে এবং নতুন গ্যালাক্সিও সব সময় জন্ম নিচ্ছে।"

প্রসারণশীল বিশ্বের ধারণা ১৯২৯ সালে হাবলই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে বের করেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল গ্যালাক্সিগুলোর পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ পরিমাপ করে। এই পরিমাপণের উপায়টির নাম হল "ডপলার ক্রিয়া" (Doppler effect)। কোন ট্রেন যখন স্টেশনে আসতে থাকে তখন তার হুইসেলের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ে। পিচ বৃদ্ধির হার থেকে অগ্রসরমান ট্রেনের বেগ হিসাব করা যায়। আবার হুইসেল বাজিয়ে দূরে চলে যাওয়া ট্রেনের হুইসেলের তীক্ষ্ণতা হ্রাসের হার থেকেও আমরা ট্রেনটির বেগ নির্ধারণ করতে পারব। একই নীতি অনুসরণ করে গ্যালাক্সিগুলোর বেগ মাপা হয়। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হল, শব্দের কম্পাংকের পরিবর্তনের বদলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাংকের পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়।

সাতটি বর্ণে (বেনীআসহকলা) বিভক্ত আলোর মধ্যে সবচেয়ে কম কম্পাংকের আরো হল লাল রঙের এবং বেশি কম্পাংকের আলো হল বেগুনি রঙের। যে সব নক্ষত্র দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। তাদের আলোর কম্পাঙ্ক কম হবে এবং আলোর বর্ণালীর লাল প্রান্ত অভিমুখী (red shift) হবে। আবার উৎস এগিয়ে আসলে আলোর কম্পাংক বর্ণালীর বেগুণি প্রান্ত অভিমুখী হবে। কম্পাংক এবং বেগের মধ্যে সম্পর্কেই 'ডপলার ক্রিয়া' বলে।

এই 'রেড শিফট'-কে আমরা মহাজাগতিক সময়ের (Cosmological time) চিহ্ন বলতে পারি। তাই রেড শিফট দ্বারা গ্যালাক্সির অপসারণের বেগ এবং দূরত্ব ছাড়াও এর বয়স নির্ণয় করা যায়। রেডিও গ্যালাক্সির উজ্জ্বল লাল আলোর অপসারণ বেগ থেকে রেড শিফট সূত্রানুযায়ী কোয়াসারের বয়স নির্ধারণ করলে পর তা মহাবিশ্বের বয়স থেকে বেশি হয়ে পড়ে। ফল দাঁড়ায় এই যে প্রমাণিত হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন হচ্ছে না। এমনি ধারণা থেকে ফ্রেড হয়েল এবং নারলিকার বলেছেন যে, কোয়াসারের 'রেড শিফটের' ব্যতিক্রম হবার কারণ মনে হয় এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় (মাকের নীতি অনুযায়ী): জন্মের মুহূর্তে সব কণিকার জিরো স্থিতি ভর (Inertial mass) থাকে যাহা মহাবিশ্বের অন্যান্য কণিকাগুলির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে সময়ের বৃদ্ধির সঙ্গে। কোনো পুরান গ্যালাক্সি থেকে কোয়াসার যদি নিক্ষিপ্ত হয় তা হলে এটি বেশি লাল আলোক দেখাবে মাতৃ গ্যালাক্সির তুলনায়। মনে হয় এমনিভাবেই "স্থানীয় সৃষ্টিতত্ত্ব" ঘটনা ঘটে গ্যালাক্সিগুলোতে। ফলে তারকাগুচ্ছ বা নীহারীকাগুচ্ছ (clusters) বা Super clusters of galaxies) সংঘবদ্ধ হয় একত্রে যা 'শ্বেত গহ্বর' বা 'মিনি ব্যাঙের' সঙ্গে তুলনীয়।

www.pathagar.com

হিসাব করা গেছে এমনভাবে ১০০০ বার বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টির ঘটনা ঘটেছিল। তাই আমাদের বিশ্বে দেখতে পাওয়া পুরাতন গ্যালাক্সিগুলো খুব সম্ভবত 'মিনি ব্যাঙের' সময় গঠিত হয়েছিল। এ জন্যই কোনো কোয়াসারের বয়স মহাবিশ্বের চাইতে বেশি মনে হয়। এ থিয়োরী অনুযায়ী বিগ ব্যাঙ এর সঙ্গে স্টেডিস্টেট থিয়োরীর মিলন ঘটে। এখানেই হয়েল এবং নারলিকারের তত্ত্বের সফলতা।

এরিক লার্নার তার "দ্যা বিগ ব্যাঙ নেভার হেপেন্ড" (ভিন্টেজ বুকস, ১৯৯২) বইয়ে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কিছু সুপার ক্লাষ্টার গ্যালাক্সির বয়স ৬০ বিলিয়ন বর্ষের বেশি পাওয়া গেছে। এই বিশাল পার্থক্য, অদৃশ্য বস্তু এবং কোবে পরীক্ষার ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশান পার্থক্য দ্বারা বিগব্যাঙের প্রমাণ (হ্যান্ড রাইটিং অফ দ্যা গড) ইত্যাকার বিষয় নিয়ে বেশ জোরালো ভাবে আলোচনা করেছেন লার্নার তার ৪৮০ পৃষ্ঠার বইয়ে।

১৪.৪ : মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কে লী স্মোলিনের বিস্ময়কর নতুন তত্ত্ব

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আরো শিশু বিশ্ব থাকতে পারে, এমন চিন্তা কাল্পনিক মনে হলেও মহাশূন্যের কালো ও উষ্ণ গহ্বর সম্পর্কিত, গাণিতিক হিসাব থেকে বিশ্বের সেরা কয়েকজন পদার্থবিদ ভাবছেন যে, এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকার একজন পদার্থ বিজ্ঞানী আমাদের এই বিশ্বজগত কেন এত সুশৃঙ্খল, তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে মহাজাগতিক বংশধরদের ক্ষেত্রে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন। প্রচণ্ড একটি শব্দ বিস্ফোরণ (বিগ ব্যাঙ) থেকে এ বিশ্ব জন্ম নিয়ে বর্তমানে এই আকার পেয়েছে বলে সৃষ্টিতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। আইনস্টাইনের মতে, শূন্যস্থান সীমাহীনভাবে ব্যাপ্তিশীল বলে বিশ্বজগতের এই আকার প্রাপ্তি সম্ভব। সম্প্রসারণশীল রবার শিটের সাথে যদি শূন্যস্থানকে তুলনা করা যায়, তাহলে সে শিটে বুদ (বাষ্প) সৃষ্ট হওয়া সম্ভব, যা আকর্ষণকারী বস্তু, যেমন নক্ষত্র বা কালো গহ্বরের ন্যায় হতে পারে।

এবার একটি শিশু বিশ্বের জন্ম রহস্য কল্পনা করা যাক। মনে করুন, ঐ বুদ ধীরে ধীরে একটি বেলুনে রূপ নিয়ে মূল শিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব পেলো। তারপর নিজের প্রচন্ড শব্দ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো একটি নতুন বিশ্বের-স্বতন্ত্র দেশ ও কালসহ।

প্রশ্ন হলো, তা হলে কি এভাবেই আমাদের বিশ্বের জন্ম হতে পারে? দীর্ঘকাল যাবৎ অনুমান করা হচ্ছে, মহাবিশ্বের কালো গহ্বরগুলি হয়তো এ ধরনের কোনো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকতে পারে। সাধারণভাবে যেটা ধরে নেওয়া হয়, তা হলো যখন কালো গহ্বরে একটি নক্ষত্রের আত্মবিলয় ঘটে। তখন সে নক্ষত্রের নির্দিষ্ট গন্তব্যহীন একমূখী যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু কোনো কোনো সৃষ্টিতত্ত্ববিদ মনে করেন, কালো গহ্বরের অভ্যন্তরভাগ হয়তো যুক্ত রয়েছে আরেক দেশ কাল, আরেক বিশ্ব জগতের সাথে। এ সম্বন্ধে গণনা করে যে টুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে, বাইরে থেকে যেটাকে কালো গহ্বরের মতো মনে হচ্ছে, ভেতরের দিকে হয়তো সেটা সম্প্রসারণশীল আরেকটি বিশ্ব। এ রকম কালো গহ্বর নিষ্ক্রিয় না থেকে বরং ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণের আকারে উবে যাবে। আমাদের বিশ্ব থেকে কালো গহ্বরের চূড়ান্ত বিলয় পর্ব একবার যদি সম্পন্ন হয়, তবে এর ভেতরকার বাড়ন্ত শিশু বিশ্বটি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব প্রক্রিয়াধীন হবে।

www.pathagar.com

নিউইয়র্কের সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ লী স্মোলিনের মতে চিরাচরিত একক বিশ্বের স্থলে দেশকাল ধৃত বিশ্বের পর বিশ্ব জন্ম দিয়ে চলেছে একটি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-মেটা ইউনিভার্স। বেশিরভাগ শিশুবিশ্ব মৃত অবস্থায় জাত। যারা জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তারা বাড়তে থাকে বিপুলভাবে, জন্ম দেয় বহু নক্ষত্রের, অবশেষে সৃষ্ট হয় কালো গহ্বরগুলির, যা থেকে জন্ম নেয় অনেক বিশ্বশিশু।

ডারউইন তত্ত্বের অনুসরণে অধ্যাপক স্মোলিন বলেন,এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া এতই তীব্র যে, এটা যখন তখন মৌলিক ভৌত প্রক্রিয়াসমূহের রূপান্তর সাধন করে। যেমন, একটি শিশু বিশ্ব ইলেকট্রোনিকের মতো মৌলিক কণা ধারণ করতে পারে। এই কণাগুলি মাতৃ বিশ্বে তাদের প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন পদার্থের হতে পারে। পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রূপান্তরের এই ধারা জৈব পদ্ধতির সাদৃশ্যবহ 'প্রাকৃতিক' নির্বাচনের অবস্থা সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক স্মোলিনের তত্ব যদি সঠিক হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, চূড়ান্ত পর্বে যে কালো গহ্বরগুলি সৃষ্টি হয়, আমাদের এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেগুলির সংখ্যা যত বেশি সম্ভব বৃদ্ধি করবে। এ তত্ত্বের কৌতুহলোদ্দীপক দিক এই যে, এতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৯৭ সনে Lee Smolin এর প্রকাশিত The Life of the Cosmos, pp 360, দাম ১৭ ডলার পুস্তকে তার নবতম আইডিয়ার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। অন্য সব বিশ্ব রহস্য তত্ত্ব থেকে তারটি আলাদা। Smolin posits that a process of set organization like that of biological evolution shapes the universe, as it develops and eventually reproduces through black holes, each of which may result in a new big bang and a new universe. Natural selection may guide the appearence of the laws of physics, favouring those universes which best reproduce. The result would be a cosmology according to which life is a natural consequence of the fundamertal principles on which the universe has been built.

১৪.৫ : বহু মহাবিশ্ব

সাম্প্রতিককালে বহু মহাবিশ্বের ধারণাটি বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে। বহু মহাবিশ্বের ধারণাটি হলো এই : এটাকে যদি সত্য বলে ধরে নেয়া হয় যে, মহাবিস্ফোরণের আগের অবস্থাটা ছিল কৃষ্ণগহ্বরের মতো অবস্থা, তাহলে আমাদের মহাবিশ্বে যে অসংখ্য কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে, এগলোর কোন কোনটি ভিন্ন ডাইমেনশনে নিশ্চয়ই নতুন মহাবিশ্বের জন্ম দিচ্ছে। আর ব্যাপারটা যদি তাই হয়, তাহলে তো আমাদের বিশ্বজগতের কাঠামোটি হবে এত দিনের প্রচলিত ধারণার চেয়ে অনেক বিশাল যেখানে মহাবিশ্ব শুধু একটি নয়—আছে অসংখ্য।

১. পেনসিলভানিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী লী স্মোলিন মনে করেন, সুদূর অতীতে কোন এক দুর্জ্ঞেয় ঘটনা থেকে বহু মহাবিশ্ব সৃষ্টির ভিত্তি রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এমন

www.pathagar.com

অনেক মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছিল যেগুলোর ভৌত নিয়মগুলো ছিল সেগুলোর অস্তিত্বের পরিপন্থী। ফলে সেগুলো আপনা থেকে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা বাষ্প হয়ে উবে যায়। পরে আর এগুলোর কথা শোনা যায়নি। কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের মতো একই ধরনের প্রাকৃতিক বা ভৌত নিয়মসূত্র নিয়ে যেসব মহাবিশ্ব জন্মলাভ করেছিল সেগুলোতে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হওয়ার অনুকূল পরিবেশও অবশ্যই ছিল। এ জাতীয় মহাবিশ্ব কৃষ্ণগহ্বরগুলোকে কন্যা মহাবিশ্ব জন্মদানেরও সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। কালের প্রবাহে কল্পনাতীত রকমের বিশাল ও জটিল ধরনের বহু মহাবিশ্বের আবির্ভাব ঘটে। মহাজগতের অধিকাংশ স্থানে কাজ করে চলে একই রকমের ভৌত বা প্রাকৃতিক নিয়মসূত্র। তখন মহাজাগতিক পরিসরে শুরু হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যে পারে সে টিক থাকে। যে পারে না, সে বিলীন হয়ে যায়। আজকের বিজ্ঞানীদের এক বিরাট অংশ বহু মহাবিশ্বের ধারণাকে সমর্থন করলেও এখনও পর্যন্ত অন্যান্য মহাবিশ্ব বা মাত্রার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২. মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে স্ফীতি বা Inflation তত্ত্বে। বিজ্ঞানী মহলে এই ব্যাখ্যা নিয়েও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। স্ফীতি তত্ত্ব বলে যে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের (Big bang) প্রবক্তারা যেভাবে কল্পনা করেছেন, সৃষ্টির মুহূর্তটি তার চেয়েও অনেক চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। প্রচলিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বলে, যে পদার্থ দিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত তার অস্তিত্ব আগে থেকে ছিল। প্রবল চাপে সেগুলো অনন্যতায় পরিণত হয়েছিল অথবা অতি উত্তপ্ত হয়ে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু স্ফীতি তত্ত্ব বলে যে, সৃষ্টির শুরুতে ছিল একটা কৃত্রিম শূন্যতা (False vacuum) বা স্বচ্ছ এলাকা যা বিপুল পরিমাণ 'কল্পিত' কণিকায় (Virtual Particles) পরিপূর্ণ ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণের ঠিক আগে কৃত্রিম শূন্য স্থানটি নিম্নমুখী হয়ে পাক খাচ্ছিল। এ সময় অবিশ্বাস্য মাত্রায় মহাকর্ষ শক্তি মুক্ত হয়ে পড়ে এবং কল্পিত কণিকাগুলো অবিশ্বাস্য সংখ্যায় বস্তুকণিকায় পরিণত হতে থাকে। এ সময় মহাকর্ষবিরোধী শক্তিও শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে যায়। ফলে সবকিছুই প্রচণ্ড গতিতে বাইরের দিকে ছুটতে থাকে। বস্তুকণিকা ও শক্তি এত কল্পনাতীত রকম বিপুল পরিমাণে সৃষ্টি হয় যে, নতুন মহাবিশ্বের পক্ষে সম্ভাব্য সকল স্থান দখল করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

স্ফীতি তত্ত্বের মূল ধারণাটির প্রস্তাবনা করেছিলেন ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার পদার্থবিদ আলেক্সি স্টারোবিনস্কি। পরে একে বিকশিত করেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী এলান গুথ। এতে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে নাকচ করা না হলেও এর সীমাবদ্ধতাও দেখানো হয়েছে। গুথ বলেছেন, যে 'কৃত্রিম শূন্যতা' (False vacuum) থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হয়ত ছিল একটা প্রোটনের চেয়েও ছোট। মহাজাগতিক সেই সর্ষে দানা থেকে শুধু আমাদের এই দৃশ্যমান মহাজগতই সৃষ্টি হয়নি তার চেয়েও অনেক বড় কাঠামো তৈরি হয়েছে যার নীহারিকাগুলো টেলিস্কোপের আওতা ছাড়িয়ে ধারণাতীত দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

গুথের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সৃষ্টির সময় মহাবিশ্ব সম্ভবত এক অতি দ্রুত সম্প্রসারণকালের মধ্য দিয়ে গেছে। এই সম্প্রসারণই হলো স্ফীতি বা Inflation। সম্প্রসারণের হার ছিল

www.pathagar.com

এত বেশি যে, এক সেকেন্ডের সামান্য মাত্র ভগ্নাংশকালের ভিতরে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন (অর্থাৎ একের পিঠে ত্রিশটি শূন্য) গুণ বেড়েছে।

অবশ্য গুথের স্ফীতি তত্ত্বের যে সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। এই তত্ত্ব বেশ কিছু অপরীক্ষিত ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে আছে। গুথের প্রারম্ভিক পর্যায়ের মহাবিশ্বের নিয়মসূত্রগুলো 'আজ্ঞা'। তবে তিনি বিশ্বাস করেন একদিন সেই সূত্রগুলো ঠিকই জানা যাবে। গুথের অতি শক্তিসম্পন্ন কৃত্রিম শূন্যতা ছিল অতিমাত্রায় জল্পনামূলক। গবেষকরা বাহ্যত শূন্যস্থান থেকে পদার্থ কণিকার আবির্ভাব নির্ণয় করতে পেরেছেন। কিন্তু সেটা এত ক্ষুদ্র পরিসরে হয়েছে যে তা দিয়ে বলা যায় না যে, শূন্য থেকে নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টি সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানী রীস-এর ভাষায় : 'শূন্যস্থানে কিভাবে শক্তি থাকে এটা মূলত এক রহস্যময় ব্যাপার।"

৩. শূন্য থেকে সব কিছু?

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে স্ফীতি তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আছে অনেক বিজ্ঞানী সেটা মানতে নারাজ। তাঁরা বলেন, "স্ফীতির ব্যাপারটা যদি একবার ঘটতে পারে তবে তা অসংখ্যবার ঘটা উচিত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যলয়ের জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞানী মাইকেল টার্নার বলেন : 'সামান্য আঁচড়ের মতো অবস্থা থেকে যদি পদার্থ ও শক্তির উৎপত্তি ঘটতে পারে তাহলে তা বার বার ঘটবে না কেন?

এরই আলোকে আলেকজান্ডার ভিলেনকিন নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী বলেছেন, মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও শক্তির ক্ষয় না করেও মহাবিস্ফোরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন, "শ্বাশত স্ফীতি"। ভিলেনকিন বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির আগে আক্ষরিক অর্থে কিছুই ছিল না। কাজেই মহাবিশ্বসমূহের সৃষ্টি কখনই শেষ হবে না। কেননা শূন্যতার কখনই শেষ নেই।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী আন্দ্রেই লিন্ডে চিরন্তন বা শাশ্বত স্ফীতি সংক্রান্ত বক্তব্যকে যুক্তিসঙ্গত মাত্রা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, মহাবিশ্ব নিজেই নিজের বংশবিস্তার করে চলেছে। সর্বক্ষণ, এমনকি হয়ত সেকেন্ডে একবারের বেশি নিজেকে কপি করে চলেছে। লিন্ডের মতে, এজন্য কৃত্রিম শূন্যতার প্রয়োজন নেই।

স্বাভাবিক স্থানে যে কোয়ান্টাম শক্তিগুলো রয়েছে সেগুলোই আরেক মহাবিশ্বের সূচনা ঘটাতে সক্ষম। যেহেতু স্বাভাবিক স্থান সবখানেই আছে তাই কার্যত যে কোন সময় মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারটা ঘটতে পারে। লিণ্ডে মনে করেন, মহাবিশ্ব নতুন নতুন স্থান অবিশ্বাস্য সংখ্যায়, সম্ভবত কয়েক বিলিয়ন করে তৈরি হচ্ছে। আমরা সেই সব মহাবিশ্ব চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কেননা প্রতিটি মহাবিশ্বই ভিন্ন ডাইমেনশন বা মাত্রায় প্রসারিত হয়ে চলেছে।

লিন্ডের এই বংশবিস্তারকারী মহাবিশ্ব চিরকাল স্থায়ী হবে এবং সর্বক্ষণ বড় হতেই থাকবে। স্ফীতিতত্ত্বের যৌক্তিকতা দেখিয়ে লিন্ডে বলেন, আমরা আস্থাবান হতে পারি যে—মহাবিশ্বের শেষ বলে কিছু নেই, থাকবেও না।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড গট এবং লী-জিন-লী সম্প্রতি মহাবিশ্বের সৃষ্টি সংক্রান্ত ভাবনায় নতুন উপাদান যুক্ত করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো : মহাবিস্ফোরণ একের পর এক সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সর্বদাই বর্তমান।

গট ও লী ধরে নিয়েছেন যে, স্থান ও কালের কোন এক জায়গায় একটা এককেন্দ্রিক ও শাশ্বত নীহারকাগুচ্ছ আছে। তাদের ভাষায় এটা এমন এক মহাবিশ্ব যার অস্তিত্ব কেবল চতুর্মাত্রিক অবস্থান থেকেই অনুভব করা সম্ভব। এটাকেই তাঁরা বলছেন প্রথম মহাবিশ্ব যা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাবিশ্ব তার নিজেরই মা। এই মহাবিশ্ব এমন কোন উপায়ে প্রথম বস্তু বা পদার্থ তৈরি করেছে যা আমরা কোন প্রকারে জানতে পারব না।

গট ও লী'র মতে, এই শাশ্বত মৃত মহাবিশ্ব থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতো আরও অসংখ্য মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে যেগুলোর সীমান্ত প্রসারিত এবং সময়ের গতি একমুখী। এ জাতীয় প্রতিটি "স্বাভাবিক" মহাবিশ্ব থেকে এক কৃষ্ণগহ্বরের (Black hole) দ্বারা কিংবা স্ফীতি বা বিস্ফোরণের কারণে শাখা-প্রশাখার মতো আরও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যদি সময়ের বিপরীত পথ ধরে যাত্রা করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলো একের পর এক অনুসরণ করে চলে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মাতৃ মহাবিশ্বে গিয়ে পৌঁছবে। তবে সেই মাতৃ মহাবিশ্ব থেকে আর কোথাও যাওয়ার পথ পাবে না।

১৪.৬ : হকিংয়ের কিছু থিয়োরীর প্রসঙ্গে

প্রকৃতির সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হলো সময় ও স্থান। সময় মানেই হলো যে কোন কিছুর একটা শুরু আছে এবং শেষও আছে। স্থান হচ্ছে সাগরের মতো যার ভিতর কোয়ার্ক থেকে শুরু করে নীহারিকা পর্যন্ত সবকিছু সাঁতরে বেড়াচ্ছে। এই দুটি রহস্যের কিনারা করার জন্য স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ দুই বিপরীত অবস্থান থেকে (রিলেটেভিটি ও কোয়ান্টাম) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্থান ও কাল নিয়ে এর আগে নিলস বোর ও আইনস্টাইনের মধ্যেও বিতর্ক হয়েছে। আইনস্টাইনের ভূমিকায় আজকে নেমেছেন হকিং আর বোরের ভূমিকায় পেনরোজ। এই বিতর্কের শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না। উৎসাহী পাঠক Scientific American জার্নালের July 1996 সংখ্যাটির ৬০-৬৫ পৃষ্ঠায় the nature of space & time শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন অথবা উভয়ের লেখা উক্ত বইটি যা অক্সফোর্ড থেকে ১৯৯৭ সনে প্রকাশিত (১৪১ পৃষ্ঠায়) হয়েছে।

হকিংয়ের মতে 'মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে'। অবশ্য পবিত্র কোরআনের মতে আল্লাহ তার সৃষ্টিকে গুটিয়ে আনবেন কাগজের পাতার মত এবং একে ধ্বংস করে শেষ বিচার অনুষ্ঠান করবেন তারপর আবার সৃষ্টি করে তাতে স্বর্গ-নরকে মানুষকে চিরস্থায়ী বাসস্থান দিবেন।

অদৃষ্টবাদের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হকিং। তিনি মনে করে যা কিছুই ঘটুক না কেন, নিয়তিই এর পেছনে কাজ করে। তথাকথিত থিওরী অব এভরিথিং (টিওই) সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিজ্ঞানীরা আজও পারেনি। থিওরী অব এভরিথিং

www.pathagar.com

হলো এমন একটি অনন্য তত্ত্ব যার মাধ্যমে কল্পনাসাধ্য সবকিছুরই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাখ্যা করা যায় গ্রহজগতের গতিবিধি ও আবর্তন থেকে শুরু করে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসমূহের জটিল ক্রিয়াকর্মেরও। কিন্তু থিওরী অব এভরিথিং তার নিয়তির উপর বিশ্বাসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি নিশ্চিত যে, একটিই মাত্র আইন পৃথিবীকে পরিচালনা করছে। আইনস্টাইনের একনিষ্ঠ অনুসারী হকিং তাই স্রষ্টার মনের সঙ্গে নিখুঁত একটি বোঝাপড়ার সন্ধান করছেন।

একটি বক্তৃতার (বক্তৃতাটি তাঁর 'ব্ল্যাক হোল এন্ড বেবি ইউনিভার্সেস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে) শুরুতে হকিং দর্শনশাস্ত্রের সেই আদিতম জিজ্ঞাসাটিই নতুন করে উত্থাপন করেছিলেন : 'সব কিছুই কি নিয়তি নির্ধারিত?' তার দ্ব্যর্থহীন জবাব ছিল : 'হ্যাঁ।' যদিও তিনি একথা স্বীকার করেছেন, 'আমরা কখনেই জানতে পারি না নিয়তি নির্ধারিত মানে কি।'আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা ধরে নেই যে, নিয়তি মানে ইউটোপিয়া অর্থাৎ কাল্পনিক কোন কিছু।

বিজ্ঞানের বিবিধ সূত্র ও নিয়মের প্রতি হকিং-এর অটল বিশ্বাস তাঁকে সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি পৃথক ও বৈশিষ্ট্যময় সত্তা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নিয়তিবাদের এই প্রবক্তা বিশ্বাস করেন যে, মানবমনের স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা মানেই হলো মরীচিকা।

মানব আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না বলে হকিং-এর বিশ্বাস। তাঁর মতে এই ভবিষ্যদ্বাণী না করতে পারাটা আইনহীনতার লক্ষণ নয়। 'কেন আমরা মানব আচরণের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি না তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে কাজটি জটিল, 'তার বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি ভৌত মৌলিক আইনসমূহ যা মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করে এবং যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সরল। কিন্তু যখন সমীকরণে বেশ কিছু পার্টিকেল এসে সংযুক্ত হয় তখন তার সমাধান কারাটা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। এমনকি নিউটনের একেবারে জটিলতাহীন সরল তত্ত্ব 'আপেক্ষিক গুরুত্ব'-এর ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব, শুধুমাত্র দুটি পার্টিকেলের ভিত্তিতেই কেউ একজন সঠিকভাবে সমীকরণ মেলাতে পারবে। তিনটি বা তার চেয়ে বেশি পদার্থ বা পার্টিকেল নিয়ে কেউ পরীক্ষাটি করলে সে যথাযথভাবে সমীকরণ মেলাতে পারবে না। তাকে আশ্রয় নিতে হবে আসন্ন মানের (এপ্রোক্সিমেশন) কাছে। পার্টিকেলের সংখ্যা যত বাড়বে জটিলতাও তত দ্রুত বাড়বে। মানব মস্তিষ্ক $১০^{২৬}$ বা ১ মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন পদার্থ কণা বা পার্টিকেল ধারণ করে। সুতরাং মানব মস্তিষ্কের সমীকরণ মেলানো বা মস্তিষ্কের আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমরা কবে সক্ষম হব তা কেউ বলতে পারে না। বহু বহু দূরের ব্যাপার সেটি।

১৪.৭ : ডাইমেনসন কয়টি? ১১টি এবং 'এম-থিয়োরী'

পদার্থ বিজ্ঞানীরা এতদিন বলতেন মহাবিস্ফোরণের সময় ৬টি ডাইমেনসন বা মাত্রা কম্প্যাকটিফায়েড হয়ে ক্ষুদ্র একটি গোলকে পরিণত হয় আর বাকী ৪টি মাত্রা (স্থান ও কাল) সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্বজগতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ৬টি মাত্রা নিয়ে গবেষনা চলছে। এর জন্য দরকারী টপোলজি এবং উচ্চ-মাত্রার বিশ্বের গুণাবলীর কোন গণিত

www.pathagar.com

অদ্যাবধি না থাকাতে তা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। ফলে লক্ষ লক্ষ ধরনের Compactifications তথা ঘনসন্নিবিষ্ট করা প্যাটার্নের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কোয়ার্ক, ইলেক্ট্রন ইত্যাদির সেট সমেত।

বিজ্ঞানীরা আপেক্ষিকতার সূত্রকে কোয়ান্টাম সূত্রের সঙ্গে একীভূত করে "সবকিছুর থিয়োরী" Theory of everything সৃষ্টির গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বয়ং আইনস্টাইন এই কাজটা শুরু করেছিলেন। তবে সমাধান দিতে পারেননি। আমার মনে হয় যেহেতু তার মস্তিষ্কে মহাবিশ্বের অন্যতম মূলসূত্র $E = mc^2$ তথা আপেক্ষিকবাদে আচ্ছন্ন ছিল তাই তার মস্তিষ্কের কোষগুলি বিপরীত চিন্তাধারার সূত্র কোয়ান্টাম নীতি গ্রহণ করতে পারেনি বা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তিনি বলেছিলেন God does not play dice (কোয়ান্টাম নীতিতে ঈশ্বর পাশা শুধুই খেলেন না। তিনি মাঝে মাঝে তা এমন জায়গায় নিক্ষেপ করেন যা খুঁজে পাওয়া যায় না)।

যা হোক আশির দশকে সুপারস্ট্রিং থিয়োরীর উদয় হল। এই থিয়োরী অনুসারে 'প্রকৃতিতে বিরাজমান সব আনবিক কণিকাগুলি হচ্ছে মহাবিশ্বের ছন্দিত (Vibrating) অতি তন্তুগুলির অনুনাদ মাত্র' (resonance)। এই তন্তুগুলির দৈর্ঘ্য হচ্ছে $১০^{-৩৫}$ মিটার মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে এই কম্পিত বা ছন্দিত সূতাগুলির সিমফোনী। বর্তমানে ৫টি স্ট্রিং থিয়োরী প্রচলিত। প্রিন্সটনের এডভান্স স্টাডিজ ইনসটিটিউট (এখানে আইনস্টাইন কাজ করতেন) এডওয়ার্ড ভিটেন সর্বশেষ (১৯৯৭ সনে) এম-থিয়োরী প্রকাশ করেছেন। এম-হচ্ছে মেমব্রেন বা মাদার অব অল স্ট্রিং অথবা মিস্ট্রির সংক্ষেপণ। পাঁচ অন্ধ হস্তী দেখলে যেমন ৫ রকম বর্ণনা দেয়, এই ৫টি স্ট্রিং মতবাদও তেমনি। সব মিলিয়ে পুরো হাতির বর্ণনা যেমন ঠিক। ঠিক তেমনি এম-থিয়োরীটি—সর্বাঙ্গীন স্ট্রিং থিয়োরী।

বিষয়টি হলো এই যে, এতদিনকার ডাইমেনসান দিয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং দরকার হয়ে পড়ল ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের ন্যায় ইলেকট্রিক ফিল্ডের E = ম্যাগনেটিক ফিল্ডের B, সুতরাং ($E \leftrightarrow B$) দ্বৈতাবস্থার। এই duality প্রয়োগ করে এম-থিয়োরী এই প্রশ্নগুলির সমাধান দিতে পারছে। তবে এতে জন্ম নিচ্ছে ১১তম ডাইমেনসন। সুতরাং শেষ থিয়োরীটি ১০,১১ কিংবা ১২ নম্বর ডাইমেনসনওয়ালা বিশ্বের জন্ম দিয়ে প্রমাণিত হবে। একটি নোবেল পুরস্কার এই সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছে।

কেন স্রষ্টা বা ঈশ্বর পাশা খেলেন এর জবাবে মার্ক বুখানান (নিউ সাইন্টিস্ট, ২২ আগস্ট ১৯৯৮) বলেন যে :

আপেক্ষিকতার নীতির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন দূরবর্তী প্রান্তের মধ্যে আলাদাকরণ এবং স্বতন্ত্রতা ব্যবস্থা চালু রাখেন। আর কোয়ান্টাম জট বা ফাঁদের মাধ্যমে তিনি দূরবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন; এবং এভাবে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সুসঙ্গতিভাবে সংযুক্ত রাখেন। এই কাজে যথেচ্ছবাদ (randomness) তিনি ব্যবহার করেন, যার দরুণ বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বন্ধন রক্ষা সম্ভবপর হয়, অন্যথায় এটা অসম্ভব হয়ে পড়ত। এতে কার্য-কারণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পাশা খেলেই তিনি তা করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

কোয়ান্টাম যথেচ্ছবাদের গুরুত্ব প্রথম চোটে মনে হয় গুরুত্বহীন, কিন্তু এটির পেছনে একটি পরিকল্পনা অবশ্যই আছে। কণিকাগুলির মধ্যকার যোগসূত্র হচ্ছে অবস্থানিক। আমাদের বিশ্বের জন্য অস্থানিকতা বা non-locality একটি প্রধান ধর্ম। অর্থাৎ পনেরশ কোটি বছর দূরে অবস্থান করলেও দুটি জমজ ইলেকট্রন, প্রোটন, মানুষ পরস্পরকে অনুভব করবে। স্রষ্টার জন্য কোয়ান্টাম থিয়োরীই একমাত্র অস্থানিক থিয়োরী নয় যা আপেক্ষিকবাদকে সমর্থন করে। অন্যান্য আরও কিছু মৌলিক সূত্র ভগবানের যদেচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করে যা পরিণতিতে আমাদের বিশ্বকে কোয়ান্টাম চরিত্র দান করে।

১৪.৮ : সমান্তরাল মহাবিশ্ব : এভারেট-হুইলার-গ্রাহামের নতুন তত্ত্ব

'এলিসের আয়নার ভেতরে' অচেনা উল্টো মহাবিশ্ব এবং স্টার ট্রেকের এন্টারপ্রাইজ মহাকাশযানে ভ্রমণের সময় হুবহু প্রতিরূপ দেখা এসব কল্পসাহিত্যের বদৌলতে ১৯৩৮ সাল থেকে আমরা পরিচিত। কল্পবিজ্ঞান লেখক জ্যাফ উইলিয়ামসন এ সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন।

তবে পদার্থ বিজ্ঞানীরা সমান্তরাল মহাবিশ্ব বলতে সাধারণত মনে করেন আমাদের গোটা মহাবিশ্বের মতো কোনো অন্য মহাবিশ্ব (other world) যা দেশকালের মধ্যে একটি অঞ্চল নিয়ে আছে। অথবা বলা যায় যে, আমাদের মহাবিশ্বেরই প্রতিরূপ (duplicate) কোনো মহাবিশ্ব যেখানে আমাদের মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর প্রতিরূপ একটি করে বস্তু রয়েছে।

এ শতকের বৈপ্লবিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে সবচেয়ে উত্তেজনাকর যে ধারণাটি বের হয়েছে তা হলো, এভারেট-হুইলার-গ্রাহামের সমান্তরাল মহাবিশ্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'ওয়েভ ফাংশন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ভৌত ধারণা যা দ্বারা কখনও কোথায় সম্ভাব্য কিছু ঘটতে পারে তা বুঝায়।

সংক্ষেপে এটি একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার পরিমাপক। এ সম্ভাবনা মনের ভেতর ছাড়াও দেশকালের মধ্যে বিরাজমান। এভারেট-হুইলার-গ্রাহামের তত্ত্বে ওয়েভ ফাংশন শুধু সম্ভাবনার কথাই বলেনা—এটা সত্যি সত্যিই যা কিছু ঘটে বা ঘটছে তার নির্দেশ দেয় যা আসলে দেশকালের সবরকম সম্ভাব্য ঘটনা প্রবাহকে তুলে ধরে।

এমনকি যদি তারা পরস্পর বিপরীতে বা বিরোধীও হয়। এই তত্ত্বানুসারে, ওয়েভ ফাংশনের প্রতিটি সম্ভাবনার জন্য অস্তিত্ব রয়েছে 'একটি করে মহাবিশ্বের' যেখানে সম্ভাব্য ঘটনাটি সত্যি সত্যিই ঘটে। অর্থাৎ একটি পয়সার দুটি পিঠ হেড এবং অন্য বিশ্বে টেল। যিনি পয়সাটি ছুড়বেন তিনি এক মহাবিশ্বে পয়সাটির হেড ও আরেক মহাবিশ্বে টেল অবস্থাটি দেখতে পাবেন। সে ব্যক্তি কোনোভাবে যুগপৎভাবে উভয় মহাবিশ্বে রয়েছে। অথবা বলা যায়, ঐ ব্যক্তির প্রতিরূপ রয়েছে ভিন্ন মহাবিশ্বে আয়নার মত। এলিস যা দেখেছিল আয়নাতে তার উল্টোরূপ। যদিও উভয় মহাবিশ্ব পরস্পর নিজেদের অপর প্রতিরূপ দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন।

একটি মহাবিশ্ব অপরটির প্রতিবিম্ব বা mirror image। এ-হু-গ্রা তত্ত্বানুসারে অবশ্য মহাবিশ্বের সংখ্যা অসংখ্য হওয়া সম্ভব। এই তত্ত্বের ভাষ্যকার ব্রাইস ডিউইটের মতে এসব মহাবিশ্বের সংখ্যা $১০^{১০০}$ পর্যন্ত হতে পারে। আরেক মতে, আমাদের মতো একটি

www.pathagar.com

মহাবিশ্বে যত কণা আছে তার সংখ্যা প্রায় $১০^{৮০}$টি। মহাবিশ্বের সৃষ্টির কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি কণা প্রতিটি সেকেন্ডে যদি নুন্যতম দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে থাকে তা হলে মহাবিশ্বের সংখ্যা দাঁড়াবে $১০^{১০^{১২}}$ প্রায় অসীম ধরে নিতে পারি।

সমান্তরাল মহাবিশ্বের বাস্তবতা অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বে 'অভিন্ন' চরিত্রের হবে এমনটা ভাববার অবকাশ নেই। কারণ সমান্তরাল বাস্তবতা সমূহ বিভিন্ন রকম, বিভিন্ন ঘটনা সম্পন্ন হতে পারে। যেজন্য এক মহাবিশ্বে একটি জিনিস থাকলে অন্যটিতে তা নাও থাকতে পারে। একটি মহাবিশ্বে একটি ঘটনা একভাবে ঘটলে অন্য মহাবিশ্বে তা আরেকভাবে ঘটতে পারে অথবা একই ঘটনা থেকে দুই মহাবিশ্বে দু'ধরনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের মধ্যে এমন কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে সেখানে পৃথিবী (পৃথিবীর প্রতিরূপ অপর পৃথিবী) নামের গ্রহটির ইতিহাস আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের মতোই চলছে তবে একটু ভিন্ন ধরনে। সেই পৃথিবীতে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও ঘটেনি, বাংলাদেশের জন্ম এখনও হয়নি। বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেনি। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার-জাপানের জয় আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়।

এ থেকে অনেকে ভাবতে পারেন যে, কাল্পনিক জিনিসের অস্তিত্ব সম্ভব। সমান্তরাল মহাবিশ্বগুলো হয়তো রয়েছে আমাদের মহাবিশ্বে অণু প্রবিষ্ট (overlap) হয়ে, হয়তো বা পাশাপাশি অঞ্চলে, বা অন্যত্র, অথবা অসীম মাত্রাবিশিষ্ট 'সুপারস্পেস', হাইপারস্পেস নামক স্থানের কোনো অংশে।

মহানবী মিরাজের সময় ভাবীকালের বেহেস্ত-দোজখও দেখে এসেছিলেন। সমান্তরাল মহাবিশ্বগুলি উলম্ব ভাবেও থাকতেপারে। এদের পরস্পরের মাঝে মিথস্ক্রিয়ায় ঘটারও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সুপারস্পেসে এভাবে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় নতুন বাস্তবতা তথা নতুন মহাবিশ্ব। এ বিষয়ের উপর রয়েছে খুবই মজার একটি বই : Fred Alan Wolf এর Parallel Universes : The Search for other worlds, Paladin Pub. 1991, pp. 351, 7.

১৪.৯ : মহাকালের সৃষ্টি রহস্য

অতি প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল মহাবিশ্ব? তাই যদি হবে তার আগের অবস্থা কি ছিল? সেটা কি ছিল কৃষ্ণগহ্বরের (Black hole) মতো কিছু যেখানে সৃষ্টির উপাদানগুলো অসীম ঘনত্ব লাভ করে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল? নাকি প্রোটনের চেয়েও ছোট এক অবস্থা থেকে অপরিসীম গতিতে প্রসারিত হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি? মহাবিশ্ব কি একটি? নাকি প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনে বিলিয়ন বিলিয়ন মহাবিশ্ব তৈরি হয়ে চলেছে? "ইউএস নিউজ এ্যণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট"-এর নিবন্ধটির অনুবাদ এখানে দেয়া হলো।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানেরও আলাদা ব্যাখ্যা আছে। তবে সেই ব্যাখ্যাও কোন সুনির্দিষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতবাদ আছে। কেউ বলে, এক বৃহৎ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের জন্ম। কেউ বলে, অতি স্ফীতির মধ্য দিয়ে। আবার কেউ বলে,

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের শুরু বলে কিছু নেই—এটা চিরকাল আছে এবং থাকবে। পদার্থ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের কিছু কিছু উত্তরের আভাস পাওয়া গেছে। কোনদিন হয়ত এ উত্তরগুলোকে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মতো স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। তবে প্রকৃত ব্যাপারটা কি হবে একমাত্র সময়ই বলতে পারবে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যত রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই থাক না কেন, সৃষ্টির আগে কি ছিল—এই জটিলতম অধ্যায় নিয়ে খুব কম জনই নাড়াচাড়া করেছেন। মহাবিশ্বের আবির্ভাবের আগের অবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরাও স্বচ্ছ কোন ধারণা দিতে অপারগ। এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা বিজ্ঞানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, ঠিক যেমন ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছে—এই প্রশ্নটিকে সযত্নে এড়িয়ে যায় থিওলজি। কোপারনিকাস, নিউটন, আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মহাবিশ্বের ভৌত নিয়মগুলো (Physical laws) এবং এর প্রক্রিয়াসমূহ জানা সম্ভব, কিন্তু উৎপত্তির আগের অবস্থাটা নয়। কেননা উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্ত সূত্র সৃষ্টির মুহূর্তেই লুপ্ত হয়ে গেছে। স্টিফেন হকিংও বলেছেন যে, আমরা যদি শুধুমাত্র জানি যে, বৃহৎ বিস্ফোরণের পরে কি ঘটেছিল, তাহলেও আমরা বিস্ফোরণের আগের অবস্থাটা নির্ণয় করতে পারব না।

তারপরও এ প্রশ্ন আমাদের তাড়া করে চলে। সম্প্রতি হাবল টেলিস্কোপের পাঠানো বেশ কিছু ছবি ও তথ্যের আলোকে বিজ্ঞানীরা এখন মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগের অবস্থা কি উন্মোচনের চেষ্টা শুরু করেছেন। কেউ বলেছেন, কৃষ্ণগহ্বর (Black hole)-এর কেন্দ্রস্থলে অসীম ঘনত্বসম্পন্ন যেরূপ অবস্থা বিরাজমান মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগের অবস্থা ঠিক সেরূপ ছিল। কেউ 'স্ফীতি' (Inflation) তত্ত্ব দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে শূন্য বা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের আবির্ভাব। মহাবিশ্ব তখন হয়ত ছিল একটা প্রোটনের চেয়েও ছোট। কিন্তু কল্পনাতীত রকমের দ্রুত স্ফীতির মধ্য দিয়ে সেটি বিশালত্ব লাভ করে।

গবেষকরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহাবিস্ফোরণ (Big bang) তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। বিজ্ঞান আজ বহুলাংশে মেনে নিয়েছে যে মহাবিশ্বের জন্মের ব্যাখ্যা অন্ততপক্ষে রূপরেখার আকারে হলেও এই তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যাবে। মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ যদি প্রথমে এক জায়গায় ঠেসেঠুসে থাকত তাহলে কেমন হতো কল্পনা করে দেখার চেষ্টা হিসাবে মহাবিস্ফোরণ (Big bang) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেই ধরনের অবস্থা অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের একত্রে ঠেসেঠুসে থাকা যে সম্ভব ছিল তার সমর্থন পাওয়া যায় নীহারিকাগুলোর চলাচলের নিয়মের মধ্যে। তাছাড়া কণাবাদী বলবিদ্যাও (Quantum Mechanics) এমন ধারণাকে সমর্থন করে।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব আজ অবশ্য অনেক সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। একদম প্রথমদিকে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সমস্ত পদার্থকে চাপ দিয়ে যদি একটি বিন্দুতে নিয়ে আসা যেত সেটা নিশ্চয়ই অকল্পনীয় রকমের উত্তপ্ত হয়ে উঠত। কেননা চাপ প্রয়োগ করলেই তাপ উৎপন্ন হবে। মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থাটাও ছিল এরূপ। পদার্থে পরিপূর্ণ স্থানটি নিশ্চয়ই কয়েক ট্রিলিয়ন ডিগ্রীতে টগবগ করে ফুটছিল। তারপর অজ্ঞাত কারণে সেটা বিস্ফোরিত হয়। এর ভিতরকার যাবতীয় বস্তু বা পদার্থ শীতল মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতই ছড়িয়ে পড়তে থাকতে ততই তা ঠাণ্ডা হয়ে শনাক্ত হওয়ার উপযোগী আলাদা আলাদা উপাদানে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

ষাটের দশকে বিজ্ঞানীদের নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের পক্ষে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত হয় মহাজগতের সৃষ্টিকালীন পটভূমি বিকিরণ (Background radiation) এবং তা থেকে মহাবিস্ফোরণ সংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্বের যথার্থতাই সমর্থিত হয়। অতি সম্প্রতি কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা ছবিতে সৃষ্টিকালীন পটভূমি বিকিরণের ব্যাপারটা আরও পরিস্কারভাবে বোঝা গেছে। ওদিকে এ্যাটম চূর্ণ করার যন্ত্রের দ্বারা বিজ্ঞানীরা দ্বারা বিজ্ঞানীরা এ্যাটম বা পরমাণুর কণিকাগুলোকে (যথা : ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি) এত প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তা থেকে হিসাব করে তারা মহাবিশ্বের প্রথম গঠনবিন্যাস কেমন ছিল বলে দিতে পারছেন। যেমন একদম আদিম অবস্থায় মহাবিশ্ব চার ভাগের তিন ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ হিলিয়াম দিয়ে গঠিত ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আদিমতম নক্ষত্র বা নীহারিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, সেগুলোও মোটামুটি একইভাবে অর্থাৎ তিন ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ হিলিয়াম দিয়ে গঠিত। তাই বলে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে সমস্যা নেই, তা নয়।

যেমন এই প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে—মহাবিশ্বের আবির্ভাবই যেখানে ঘটেনি সেখানে ট্রিলিয়ন ডিগ্রী তাপে অতি-চাপযুক্ত পদার্থগুলো এলোই-বা কোত্থেকে? প্রশ্নটা বিজ্ঞানীদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে বিব্রতকর হলেও মার্টিন রীস নামে এক ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেশ আস্থাবান। তিনি বলেন, সৃষ্টির প্রথম মিলি সেকেন্ডের (এক হাজার ভাগের এক ভাগ) পর কি ঘটেছিল বিজ্ঞানের পক্ষে জানতে পারা সম্ভব। কেননা আমাদের চোখের সামনে সেই "ফসিল" রয়েছে। মহাবিশ্বে যে পরিমাণ হিলিয়াম আছে সেটাই হলো ওই ফসিল। তবে সৃষ্টির এক মিলি সেকেন্ড আগে কি ঘটেছিল তা জানার পথে অনেক অন্তরায় আছে।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়ার ঠিক আগের অবস্থাটা জানবার যা কিছু সম্ভাবনা ছিল মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার সবটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই সেই উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। হাতে পারে ব্যাপারটা তাই। কিন্তু সেটা কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয় বরং বলা যেতে পারে—এ হলো প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া।

মহাবিস্ফোরণের সময়কার সেই অতি চাপযুক্ত বস্তু বা পদার্থ কোত্থেকে এলো এই দুরূহতম প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কোন কোন বিজ্ঞানী বলতে চেয়েছেন যে, মহাবিস্ফোরণের আগে স্থান ও কালের একটা অনন্যতা (Singularity) বিরাজ করছিল। অনন্যতা (Singularity) হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো অচল। এটা থাকে কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রস্থলে।

আইনস্টাইনের সমীকরণ বলে যে, যদি বিপুল পরিমাণ বস্তু কৃষ্ণগহ্বরে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে যে অভিকর্ষ শক্তি সৃষ্টি হয় সেটা অন্য সকল শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় এবং এমন এক বিন্দু রচনা করে যার স্থান বা কালের কোন মাত্রা (Dimension) নেই, তবে আছে অসীম ঘনত্ব। স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজের মতো বিজ্ঞানীরাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, যে স্থান-কালের এই অনন্যতা (Singularity) স্রেফ অনুমানের কথা নয়। এর অস্তিত্ব সম্ভব। আর সম্ভব বলেই এই বিচিত্র কাঠামোগুলো মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার উপকরণ যোগাতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ধরে নেয়া হয় মহাবিস্ফোরণের সময় বিশ্বজগতের আয়তন ছিল শূন্য কিন্তু উত্তাপ ছিল অসীম। কথাটা আজগুবি মনে হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরের পক্ষে অসীম পদার্থকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে অপরিমেয় রকমের ক্ষুদ্র স্থানে ঘনীভূত রাখা অসম্ভবই মনে হবে। কিন্তু যত অসম্ভব বা আজগুবিই মনে হোক না কেন, মহাবিস্ফোরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্যাপারটা খুবই সম্ভব। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, কোন এক পর্যায়ে শূন্য বা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে পদার্থের উৎপত্তি হয়েছিল।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গভীর মহাশূন্যে এক অসাধারণ হাইপারনোভার সন্ধান পান সেখান থেকে ক্ষণিকের জন্য এত বিপুল পরিমাণ গামারশ্মি বিকিরিত হয়েছিল যে মহাবিশ্বে আর যত তারকারাজি আছে সব কটিকে একত্র করলে এতখানি গামারশ্মি বিকিরিত হবে না। এ থেকে একটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক ভৌত প্রক্রিয়া এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে—যা অতি ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে অতি বিশাল কিছু তৈরি করে দিতে পারে।

সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে এবং যতই প্রসারিত হয় ততই তা শীতলতর হয়ে ওঠে। মহাবিশ্বের প্রসারণ যদি বন্ধ হয় তাহলে কি হবে? স্টিফেন হকিংয়ের গাণিতিক হিসাব বলে যে, প্রসারণ বন্ধ হলে মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। নীহারিকা, ছায়াপথগুলো সঙ্কুচিত হতে হতে চুপসে আসবে তাদের প্রারম্ভিক বিন্দুতে এবং তখন মহাবিস্ফোরণের বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ মহাসঙ্কোচনের (Big crunch) রূপ নিয়ে ধ্বংস হতে যাবে এই মহাবিশ্ব।

তবে বাস্তবে মহাজাগতিক সঙ্কোচনের কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখছেন যে, দূরের নীহারিকাগুলো প্রতি সেকেন্ডে কয়েক শ' মাইল কি তারও বেশি গতিতে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী রুথ ড্যানি বলেছেন, বর্তমান উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে এবং তার প্রসারণের গতিও সম্ভবত চিরকাল ত্বরান্বিত হতে থাকবে।

জ্যামিতির একটি বিচিত্র প্রশ্ন মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যেমন আইনস্টাইন বলেছেন, মহাকাশ হলো বক্র। মহাবিশ্ব যদি ক্রমাগত প্রসারিত হতেই থাকে, তাহলে এই বক্র নভোমণ্ডলের কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে কিছু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়া উচিত। কিন্তু যন্ত্রপাতির সাহায্যে যতদূর দেখা গেছে তা থেকে বলা যায় যে, মহাজগত স্থানটা একঘেয়ে রকমের সাধারণ।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব কিভাবে এলো

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang) প্রথম প্রস্তাবিত হয় ১৯২০-এর দশকে। প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের অনেকে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীকালে এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ক্যাথলিক যাজক জর্জ লেমাইত্রে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটলে আইনস্টাইনের

www.pathagar.com

মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত সমীকরণের কি হবে তা পর্যালোচনা করেছিলেন। সে সময় আইনস্টাইনসহ বেশির ভাগ সাংবাদিক বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্ব স্থির। লেমাইত্রের লেখাটি ছাপা হওয়ার কয়েক বছর আগে রুশ গণিতবিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্রিডম্যান বলেছিলেন যে, মহাবিশ্ব স্থির নয়—খুব সম্ভব এর প্রসারণ ঘটে চলেছে।

আইনস্টাইন ও ফ্রিডম্যান—এই দু'জনের চিন্তাধারার মিশ্রণ ঘটিত লেমাইত্রে একটা বিচিত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তিনি বলেন, একদা মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছিল। বলা যায় একটি আদিম এ্যাটমের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং সেই এ্যাটমের ভর ছিল অচিন্ত্যনীয় রকমের বিপুল। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই তখন লেমাইত্রের এই ধারনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছিলেন। এর পিছনে তাদের এমন উদ্বেগও খানিকটা কাজ করেছিল যে এটা হয়ত সৃষ্টির মুহূর্ত সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক যে ব্যাখ্যা আছে সেটাকেই বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়ার একটা চেষ্টা মাত্র।

ঠিক দু'বছর পর এডউইন হাবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম অসাধারণ একটি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, দূরবর্তী নীহারিকাগুলোর আলো লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (wave length) দিকে সরে যাচ্ছে। আলোর উৎস থেকে দূরত্ব যত বেশি, লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাওয়ার হারও ততই বেশি।

এর অর্থই হলো, নীহারিকাগুলো অপরূপ সুন্দর ঝাড়লণ্ঠনের মতো স্থির নয় বরং তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফ্রিডম্যান ও লেমাইত্র অন্তর্দৃষ্টিতে যা দেখতে পেয়েছিলেন হাবল স্বচক্ষে সে জিনিসটাই দেখতে পেয়েছেন। নীহারিকাগুলোর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির মুহূর্তে সব কিছু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল। তারপর তা বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের শুরুটাও বিস্ফোরণের আকারে এভাবেই হয়েছিল।

কথাটা সবাই যে মানলেন তা নয়। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বিশ্বাস করতেন যে, মহাবিশ্বের কোন সূচনা ছিল না। এটা স্থির অবস্থায় রয়ে গেছে। বিস্ফোরণের আকারে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারকে তিনি ঠাট্টা করে নাম দিলেন 'বিগ-ব্যঙ'। এই নামটাই শেষ পর্যন্ত টিকে গেল।

১৯৬৫ সালে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নামে দুই বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, নীহারিকাগুলোর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান সম্পূর্ণ শীতল নয় বরং পরম হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রী বেশি এবং এই অবস্থায় ওখান থেকে বিকিরণ ঘটে। তারকাগুলোর উত্তাপ মোটেই তেমন ঘনীভূত নয় যা থেকে এই বিকিরণ ঘটতে পারে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো—এই বিকিরণ হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময়কার। সে সময় মহাবশ্ব অতি উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এক পর্যায়ে সেটা আদিম বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ে। এই বিস্ফোরণের সময় আলোর যে বিকিরণ ঘটেছিল তা আজও রয়ে গেছে মহাশূন্যের বুকে। যা ১৯৯২ সালের এপ্রিল COBE পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। টাইম ও নিউজটাইম এ সম্পর্কে লিখেছিল 'হ্যান্ড সাইন অব দ্যা গড'। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালীন বিকিরণ আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রায় সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী কোন না কোনভাবে মহাবিস্ফোরণ (Big bang) তত্ত্বটি সমর্থন করতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

সময় ভ্রমণ : বাস্তবে নাকি কল্পকথায়

১৫.১ : সময়ের পথ ধরে অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়া

এ. জে. ডব্লিউ ডান ১৯২৭ সালে একটা বই লিখেছিলেন। নাম "এন এক্সপেরিমেন্ট উইথ টাইম"। বইটা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ওটাতে সময় সম্পর্কে এমন একটা ধারণা দেয়া হয়েছিল যে সময়ের পথ ধরে অতীত বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়া সম্ভব। ম্যাক্স প্লাঙ্ক ডানের গাণিতিক সূত্রগুলোর মধ্যে কোনরকম ভুল বের করতে পারেন নি। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ডান যে যাত্রাবিন্দু থেকে অগ্রশর হয়েছেন সেটা প্রমাণের অসাধ্য এবং সেই হেতু তা অবৈজ্ঞানিক। পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানী বি চ্যাপমান একটা বই লেখেন। নাম "রিভার্স টাইম ট্রাভেল"। ওতে তিনি বিষয়টি নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। যদিও তিনি সময়ের পথ ধরে অতীত বা ভবিষ্যতে যাত্রার সম্ভাবনা নাকচ করে দেননি তথাপি ব্যাপারটা তার বইয়ে মোটেও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি।

সোভিয়েত মানবতাবাদী বিজ্ঞানী আন্দ্রেই সাখারভ তার এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে (Cosmological Models of the Universe with Reversal of Time's Arrow : Sov. Phys. JETP 52 : 349-351 (1980). See in Collected Scientific Works of AD Sakharov, Marcel Denker, Inc. NewYork, 1982, Paper 12, pp 131—136) বলেন :

চিরায়ত বলবিদ্যার গতির সমীকরণগুলি এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ননরিলেটিভসিটিক সূত্রগুলি সময়ের উল্টোগতি মেনে নেয়। এমনকি CP পরিবর্তনের সহিত কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরীর সমীকরণগুলি এর বিরোধিতা করে না। কিন্তু, অপর দিকে পরিসংখ্যাকের সমীকরণগুলি অপরিবর্তনীয়, উল্টানো যায় না এমন। এই দ্বন্দ্বটি চলে আসছে উনবিংশ শতকের শেষ থেকে। একে গ্লোবাল প্যারাডক্স অব রিভারসিবিলিটি অব সট্যাটিসটিক্যাল ফিজিক্স বলা হয়। সময়ের দুদিকের গতি (অতীত ও ভবিষ্যত) মানুষের মনে বিদ্যমান। প্রসারমান বর্তমান বিশ্বে সময়ের কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তকে F দ্বারা সূচিত করা যাক। এখানে F হচ্ছে ফ্রিডমান সিঙ্গুলারিটি। এতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থার পরিসংখ্যানিক ধর্মগুলি থেকে অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় যে সময়ের পথ ধরে এন্ট্রপি শুধু বাড়েই না সময়ের পথ ধরে অতীতেও যেতে পারে বাড়তে বাড়তেই। এখানে সময় যদি জিরো থেকে বেশি হয় তাহলে সাধারণ পরিসংখ্যানের সমীকরণ হয়, কিন্তু সময় যদি

www.pathagar.com

জিরো থেকে কম হয় ($t < 0$) তখন সময়ের উল্টো গতির সমীকরণ খাটে। সব ধরনের অসাম্য ব্যবস্থার জন্যও যেমন, জীবন প্রবাহ, এটি প্রযোজ্য। এ ধরনের পরিস্থিতিকেই "Reversal of Times Arrow" বলা হয়। এটি CPT সিমেট্রির উপর নির্ভর করে না। যে কোন সাধারণ উন্মুক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অথবা অসংখ্যবার চক্রাকারে জন্মগ্রহণকারী মহাবিশ্বে, স্পন্দিত বিশ্বে বা বহুভাঁজ বিশিষ্ট (many-sheeted) বিশ্বের জন্যও প্রযোজ্য।

ভবিষ্যত সম্বন্ধে আগ্রহ বা কৌতূহল এটা চিরন্তন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের পত্রিকাতে দৈনন্দিন রাশিফলের কলাম দেখেই এর চাহিদা টের পাওয়া যায়। মানুষ জানতে চায় সত্যিই কি ভবিষ্যত জানা যায়? ভবিষ্যত পূর্ব নির্ধারিত হলেও সেটা সঠিকভাবে জানা কি সম্ভব? কেউ কি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন বা পেরেছেন আজ পর্যন্ত? আর যদি পেরে থাকে, কোন পন্থায়?

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বস্তুজগতের বিচিত্র জটিলতার মধ্যেই এক স্বয়ম্ভূ চৈতন্যময় শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। তারা অনুমান করেন অদ্বিতীয়া, স্বস্থিতা, স্বপ্রকাশ এক শক্তিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। নতুবা প্রকৃতি বলতে আর কি বোঝায়? এই প্রকৃতির স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রণকর্তাই বা কে? বস্তুজগতের গবেষণা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যুক্তির মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী প্রকৃতিকে আত্মা বলতেই বা আপত্তি কিসের? এই প্রকৃতি বা আত্মা বা শক্তিকেন্দ্র অবশ্য তাঁদের কাছে একটি ধারণা বা অনুমানমাত্র, প্রত্যক্ষ সত্য নয়।

ভারতীয় ঋষি ও সাধকগণ আধ্যাত্মিক যোগ ও সাধনার মাধ্যমে এই মহাশক্তিকে উপলব্ধি করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন সত্তা রূপে। অর্ন্তজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে তারা বাইরে ও অন্তরে দেখেছেন এবং এই শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সফল হয়েছেন। তার ফলে তারা অকল্পনীয় শক্তির অধিকারীও হয়েছেন। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রশাস্ত্রে এই যোগ আত্মার বিপুল শক্তির অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তারা বলেন, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে যে বিশ্বের ইঙ্গিতমাত্র পাই, সেটা সেই অনাদি অনন্ত মহাশক্তির এক খণ্ডিত প্রকাশ মাত্র। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পরিধি সীমিত, তা আমাদের বিশ্ব উৎসের অভিকেন্দ্রে যে মহাশক্তি নিরন্তর কাজ করে চলেছে তার সন্ধান দিতে পারে না।

তন্ত্র সাধকগণ এই মহাশক্তিকে মহাদেবী মহামায়া রূপে দেখেছেন। এই মহাশক্তি শুধু চৈতন্যময়ী ও সর্বশক্তির উৎসই নয়, অপার করুণারও উৎস স্বরূপ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাছে শক্তি অচেতন, অনুভূতিহীন; তাই তাদের প্রয়াস এই শক্তিকে করায়ত্ব করে মানুষের কাজে নিয়োজিত করা। সাধকগণ বলেন যে কেউ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তাকে পেতে পারেন সাধনার দ্বারা। তাকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাকে জানলে সব জানা যায়। আর কিছু পাওয়ার বা জানার বাকী থাকে না।

এডিংটন বলেন, "অতীত ও ভবিষ্যত কাল বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে আমাদের কার্যকারণ সম্পর্কের আদর্শ ও স্বাধীন ইচ্ছা। নিখুঁত সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা বা সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ও ভবিষ্যত দুই-ই পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট আছে এবং তা নির্ণয় করা সম্ভব, অর্থাৎ অনুসন্ধানের ফলে দেখা বা জানা যায়। যেমন মহাকাশের বহু

www.pathagar.com

দূরবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধেও আজ আমরা বহু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে জ্ঞান লাভ করতে সফল হচ্ছি, তেমনি কালের গর্ভে সমাহিত ঘটনাবলীও সঠিক গবেষণার দ্বারা জানা সম্ভব। অর্থাৎ বলা যায়—ঘটনা ঘটে না, ঘটে আছে বা বর্তমান (যদিও অদৃশ্য) এবং আমরা যথাসময়ে সেগুলির মুখোমুখি হই বা দেখতে পাই।"

মহাজাগতিক শক্তিবিন্যাস পদ্ধতিকে এডিংটন মননের (World mind) সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর জেমস জীনস্ বলেন, বিশ্বব্যবস্থার সুষ্ঠু গাণিতিক চেতনা সুপরিস্ফুট। আইনস্টাইনত সুপারিয়র মাইন্ডের কথা বলেছেন।

"ঘটনা ঘটে না, ঘটে আছে?" এডিংটনের এই মন্তব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্যের সঙ্গে মিল আছে "আমি মহাকাল, লোকক্ষয়ে প্রবৃত। অর্জুন, তুমি যুদ্ধে তোমার সাথী, আত্মীয়দের হত্যা না করলেও এদের মৃত্যু হবে। এদের সকলকে আমিই হত্যা করে রেখেছি। তুমি কেবল উপলক্ষ্য হও।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অখন্ড কালপ্রবাহের একটি অংশ—ভবিষ্যতকে কালগর্ভ থেকে বের করে এনে যেন অর্জুনকে দেখাচ্ছেন।

শ্রেষ্ঠ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়ঙের শিষ্য জন ডান (John William Dunne) বলেন অখণ্ডকালের যে কোন খণ্ড অংশ জানা অসম্ভব নয়। তিনি ত্রিমাত্রিক কাল ও স্থূল-সূক্ষ্ম দ্বিস্তর মনের তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে বা কেন অনাগত ভবিষ্যত কখনো কখনো স্বপ্নে বা অবচেতনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরি উপর ভিত্তি করে অপরের চিন্তা পাঠ thought reading), দূর জ্ঞান (telepathy), সম্মোহন (hypnotism) ইত্যাদি বিষয়গুলি বিকশিত হয়ে উঠছে।

ইয়ঙ বলেন, আমাদের সচেতন মনের পরিধি 'অহম' (ego) দ্বারা সীমিত। কিন্তু ব্যক্তি অহম-এর চেতনাই সব নয়। এই 'অহম' ব্যতীত আর একটি সমষ্টি নির্জ্ঞান (collective unconscious) বা অন্তর্নিহিত সর্বজ্ঞান-সম্বলিত "অহম্' আছে। এই নির্জ্ঞানের গভীরে আমরা যতই ডুব দেব ততই দেখব, আমাদের ব্যক্তি সত্ত্বা বা চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সাধকদের যোগের সঙ্গে এই বক্তব্যের আশ্চর্য সামঞ্জস্য সমাধি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করলেই লক্ষ্য করা যায়।

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাংক সুন্দর,
ভাসে বোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ সংসার ভাসে।
উঠে ভাসে, ডুবে পুনঃ অহম্ স্রোতে নিরন্তর।
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্যে মিলাইল,
বহে মাত্র 'আমি, এই ধারা অনুক্ষণ।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল
"অবাঙ্মনাসাগোচরম্' বোঝে, প্রাণ বোঝে যার।"

ইয়ুঙে-এর ভাষায় নির্জ্ঞানের ব্যাখ্যা হলো : "The unconscious is anything but a capsulated personal system; it is the wide world, and objectively as open as the world ... a boundless expanse full of

www.pathagar.com

unprecedented uncertainty, with apparently no inside and no outside, no above and no below, no here and no there, no mine and no thine, no good and no bad. It is the world of water where everything living floats in suspension, where the kingdom of the sympathetic system, of the soul of everything living begins, when I am inseparably this and that, and this and that are I! where I experience the other person in myself, and the other as myself experiences me." (The Integration of Personality-translated by Stanley M. Dell.)

—অর্থাৎ "এই নির্জ্ঞান বা সর্বজ্ঞানের সুপ্ত চেতনা সীমিত ব্যক্তিগত চেতনা নয়; এটা হলো বিশ্বজগৎ, বাহ্য প্রকৃতির দিক থেকে এটা বিশ্বের মতই উন্মুক্ত... অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তাপূর্ণ অসীম বিস্তার—বাহ্যত যার অন্তঃ-বহি, ঊর্ধ্ব-অধঃ, এইস্থান-ঐ স্থান, আমার-তোমার, ভাল-মন্দ, বলে কিছু নেই। এ যেন এক মহা-সমুদ্র (কাল সমুদ্র?) যেখানে প্রত্যেকটি জীবন অনির্দিষ্টভাবে ভাসমান, যেখানে সহ-অনুভূতির বা প্রত্যেকটি সজীব পদার্থের আত্মার প্রারম্ভ, যখন আমি অবিচ্ছিন্নভাবে 'এইটা এবং ওটা', এবং 'এইটা ও ওটা'ই আমি, যেখানে আমি আমার মধ্যেই অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং অন্য সত্তাও আমারই মত আমার অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

অর্থাৎ বলা যায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য উপনিষদেরই মূল কথা 'সবই ব্রহ্ম'। ভারতীয় যোগীগণের দুর্জ্ঞেয় বিশ্বসত্তা সম্পর্কে উপলব্ধি বা অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি।

ইয়ুঙের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যৎ হল সমষ্টিগত বিশ্বচেতনা যা ঈশ্বরের মনের মধ্যে বর্তমান। ঈশ্বর কথাটি স্পষ্ট না হলেও, বক্তব্য যে এই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইয়ুঙের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তো এও বলা যায় যে পৃথিবীর ইতিহাস একটি পূর্বলিখিত নাটক মাত্র, এবং হঠাৎ এর কোন কোন দৃশ্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কোন কোন মনীষীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাই নয় কি?

বস্তুতঃ ঋষি, যোগী ও অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে মহাপ্রকৃতির লীলা চলেছে যেন গণক যন্ত্রের মত। মহামায়া যেন অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণ-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর উপাদান প্রকৃতির মহাগণক যন্ত্রের মধ্যে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন, আর তারই ফলে কল্প থেকে কল্পান্তরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অনন্ত লীলা চলেছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি অনাগত-আগত-গত-অনাগতের পারম্পর্যে দৃশ্যমান্ হচ্ছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা আজ যা বলতে শুরু করেছেন ঋষি দ্রষ্টারা তা বহু পূর্বেই ধ্যানদৃষ্টির মাধ্যমে সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিন্তু এতো আধ্যাত্মিক যোগী-ঋষিদের উপলব্ধি ও জ্ঞানের কথা—যাঁরা দেশকালের গণ্ডী দ্বারা সীমিত নন; যাঁরা পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন সময়ের, বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যতের যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। (যেমন বিবেকানন্দ ধ্যান যোগে শূদ্রের অভ্যুত্থান অর্থাৎ রাশিয়ার বিপ্লবের কথা পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মহাযোগীর পক্ষে বহির্বিশ্বের অর্থাৎ অন্য সৌরজগতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়াও অসম্ভব নয়।)

www.pathagar.com

এ যুগেও মাদাম ব্লাভাৎস্কি তুরীয় (আধ্যাত্মিক) দর্শন এবং জীন ডিক্সন অলৌকিক (দিব্য) দর্শনের কথা বলেছেন। তবে ব্লাভাৎস্কি দূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই বলেছেন, এবং জীন ডিক্সনের অলৌকিক দর্শন তাঁর বিনা প্রয়াসেই আকস্মিকভাবে ঘটেছিল।

আমরা এবার আয়সসাধ্য একটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো যার দ্বারা সাধারণ মানুষও অভ্যাস করলে 'মিডিয়ামের' মাধ্যমে অথবা অত্যন্ত তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন হলে নিজেকে সম্মোহিত করে (self-hypnosis) সেই সর্বব্যাপী চেতনা বা জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন। এই সম্মোহন শক্তি বা mesmerism-এর কিছু কিছু খেলা যাদুবিদ্যা প্রদর্শকরা দেখিয়ে থাকেন। তা ছাড়া শক্তিমান mesmerist (সম্মোহনকারী) এর সাহায্যে রোগও সারিয়ে ফেলতে পারেন। এটা অলৌকিক কিছু নয়, মনোবিজ্ঞান।

মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের মধ্যে দুটি মন আছে। একটি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সমষ্টি যা দিয়ে আমরা কাজকর্ম, দেখা-শোনা ইত্যাদি করি। আর দ্বিতীয় মন হল অবচেতন বা অন্তর্মন (subconscious)। এই অন্তর্মনই হল মুখ্য, এরই ইঙ্গিতে বহিরিন্দ্রিয়গুলি পরিচালিত হয়। মনোবিজ্ঞানে একে duality of mind বলা হয়। সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী পুরুষ তাঁর তীব্র ইচ্ছাশক্তি, দৃষ্টি, স্পর্শ বা মর্মস্পর্শী আদেশের সাহায্যে অন্য ব্যক্তির বাহিরের মনটাকে অভিভূত করে ফেলতে পারেন। যখন ঐ বহিরিন্দ্রিয়গুলি কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে (hypnosis বা সম্মোহন নিদ্রা) তখনই ঐ ব্যক্তির (medium) অন্তর্মনটি এই শক্তিমান পুরুষের আজ্ঞাধীন হয়ে পড়ে। ভারতীয় ঋষিগণ যোগচর্চার ফলে অচিরেই এই শক্তির অধিকারী হতেন। যোগীগণ এই বহির্মন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি স্তব্ধ করে অন্তর্মনের সাহায্যে নিজেকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত করেই ভূতভবিষ্যৎ দেখতে পান।

মেসমেরিজম কথাটি যাঁর নাম থেকে এসেছে সেই Dr. Friedrich Anton Mesmer মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন তীব্র মনঃসংযোগ তথা অধ্যাত্মশক্তির ওপর সম্মোহনের ক্ষমতা অনেকটাই নির্ভরশীল। তবে যোগী না হলেও চর্চা ও অধ্যবসায়ের ফলে অপরকে সম্মোহিত করার শক্তি অর্জন করা যায়। সম্মোহনকারী যাঁকে medium করেন তাঁকে স্বপ্নস্তরে নিয়ে গিয়ে শুধু যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই জানতে পারেন তা নয়, অনেক সময় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে কোন্ রোগ কী ভাবে কোন্ ওষুধে সারবে তাও বলে দিতে পারেন। সম্মোহন শক্তি দ্বারা যে রোগ সারানো যায় সে কথা হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক Dr. Hahnemann-ও স্বীকার করেছেন।

অতীন্দ্রিয় বা দিব্যদর্শনের মত আর এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত দর্শনের ফলেও অনেক সময় ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। এই দর্শন ঘটে স্বপ্নের মাধ্যমে। কী করে এটা সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে কার্ল ইয়ুঙ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁর শিষ্য ডান্ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

এটা যে সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'টাইটানিক' জাহাজ ডুবির ১৪ বছর পূর্বে লেখা একটি অখ্যাত উপন্যাসে। এই উপন্যাসটির নাম The Wreck of the Titan।

www.pathagar.com

লেখকের নাম মর্গান রবার্টসন। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসে তিনি টাইটানিক ডুবির নিখুঁত বর্ণনা দেন।

টাইটানিক ডুবির পূর্বাভাষ

এমনকি বৃহত্তম সবচেয়ে নিরাপদ ও বিলাসবহুল বলে বিজ্ঞাপিত সেই জাহাজটির নামও, ঠিক টাইটানিক না হলেও, ছিল টাইটান। প্রথম সমুদ্রযাত্রা কালে উপন্যাসের 'সর্বোত্তম' এই জাহাজটি সাদামপটন ও নিউ ইয়র্কের মাঝামাঝি আটলান্টিকে একটি ভাসমান হিমশৈলে ধাক্কা লেগে ২৫০০ যাত্রীসহ ডুবে যায়।

ডুবে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই এই বিশ্বাসে, এত বড় জাহাজে জীবনতরী (life-boat) ছিল না বললেই হয়। মাত্র ২৪টি রাখা হয়েছিল নিয়ম রক্ষার জন্য। বাস্তবের টাইটানিক জাহাজ সম্বন্ধে এই রকমই বৃহত্তম, বিলাসবহুল ও সবচেয়ে নিরাপদ বলে দাবী করা হয়। সেই জাহাজে যাত্রী সংখ্যাও ছিল প্রায় ২৫০০। এবং জীবনতরী ছিল (উপন্যাসে লিখিত ২৪টি নয়) মাত্র ২০টি।

জাহাজটি উপন্যাসে বর্ণিত দুর্ঘটনার মতই উত্তর আটলান্টিকে হিমশৈলে ধাক্কা লেগে নিমজ্জিত হয়। মোট ২২২৪ জন যাত্রীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই বেঁচে যান। মৃত্যু হয় ১৫১৩ জনের। ঘটনাটি ঘটে ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল।

এই উপন্যাসটির পাঠক সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু যাঁরা পড়েছিলেন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান বাস্তব ও উপন্যাসের ঘটনা ও বর্ণনার আশ্চর্য মিলে। টাইটানিক ডুবির অল্পদিনের মধ্যেই অখ্যাত উপন্যাসটি বিখ্যাত হয়ে যায়।

লেখক কি করে ১৪ বছর আগে উপন্যাসের এই দুর্ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিলেন? অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে তিনি স্বপ্নে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অপর একটি পরিচিত এবং বহুল প্রচারিত পন্থা হল রাশিচক্র থেকে কোষ্ঠী বিচার; অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব বিচার করে রাশিচক্র দ্বারা গণনার সাহায্যে শুধু ব্যক্তি বিশেষেরই নয়, জাতি, দেশ ও সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেরও ভবিষ্যৎ জানার প্রয়াস।

এছাড়া প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত পাশা, অন্য গুটি বা ফলের বীজ ইত্যাদি ফেলেও 'হ্যাঁ'-'না' সিদ্ধান্তে এসে ভবিষ্যৎ জানার একটি পদ্ধতির কথাও ইতিহাসে আমরা পাই। চীনের 'আই চিঙ' ও ফ্রান্সের তারৎ তাসের প্রথম ব্যবহার হয় ভবিষ্যৎ গণনার জন্যই।

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি যে সাধারণভাবে প্রচলিত এই মাধ্যমগুলি এবং সম্মোহন ছাড়াও আর একটি পন্থায় ভবিষ্যৎ দেখা যায়—সেটি সাধুসন্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে এই পন্থাটি হলো বিশেষ একটি যোগ যার সাহায্যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই মুহূর্তের মধ্যে যোগীর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। কোন কোন যোগী মানুষের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতিরশ্মি (halo) বা বিদ্যুৎতরঙ্গ দেখতে পান এবং তা থেকে মানুষটির চরিত্র ও ভবিষ্যৎ-ও বুঝে নিতে পারেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে একবার মাত্র দৃষ্টিপাতেই মহাজ্ঞানী দ্রষ্টাগন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দেখতে পান, তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি যোগী ও সাধকগণ

www.pathagar.com

সাধারণত লোক সমাজের বাইরেই থাকেন। লোকালয়ে মুষ্টিমেয় যে কয়জন আছেন তাঁরাও থাকেন প্রচ্ছন্নভাবে। এঁরা কী পন্থায় গত-অনাগত-আগত কালকে মহাকালের খণ্ডরূপ হিসাবে নিমেষে প্রত্যক্ষ করেন তার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি।

বিভিন্ন মাধ্যমগুলি বা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা একে একে আলোচনা করব। এখন স্বপ্নের কথায় ফিরে আসি। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই সংক্ষেপে দু একটি উদাহরণ দিয়েছি। এব্রাহাম লিঙ্কনের স্বীয় শবদর্শন এবং টাইটানিক জাহাজ ডুবি সম্বন্ধে মর্গান রবার্টসনের কথা আমরা জেনেছি। এ বিষয়ে প্রাচীনতম উদাহরণ হলো বাইবেলে উল্লিখিত মিশরের ফারাও-য়ের একটি স্বপ্ন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

এই ঘটনা বা কাহিনী প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে মিশর সম্রাট অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখে বিমূঢ় হয়ে যান এবং এর তাৎপর্য জানার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন।

স্বপ্নটা ছিল এই রকম : সাতটি নধর গোরুকে খেয়ে ফেললো সাতটি কৃশ গোরু। এরপর আবার ফারাও দেখলেন সাতটি সরু সরু শস্যের শীষ সাতটি পাকা পুষ্ট শীষকে গ্রাস করে নিল।

শেষ পর্যন্ত একজন জ্ঞানী ক্রীতদাস (জোসেফ) স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ সাত বছর প্রচুর ফসল হবে আর তারপর সাত বছর চলবে আকাল। সাত বছরের জমানো ফসল নিঃশেষ হয়ে যাবে পরবর্তী সাত বছরে। অর্থাৎ এটা ছিল সাবধানবাণী।

স্বপ্নে যে ভবিষ্যতের সংকেত পাওয়া যায় এটা সে যুগে সকলেই বিশ্বাস করতেন। তবে স্বপ্নগুলি অনেক সময়েই ছিল হেঁয়ালির মত। সে জন্য সঠিক তাৎপর্য বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব হতো না, ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন হতো।

আসুরবানিপালের গ্রন্থাগার

আসিরীয় সম্রাট আসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে স্বপ্নব্যাখ্যা-সম্বলিত অসংখ্য মৃৎফলক সংরক্ষিত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই মৃৎফলকগুলি ৬৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে প্রস্তুত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এরপর ১৫০ খৃস্টাব্দে রোমক ভবিষ্যৎ-বক্তা আর্টেমিডোরাস বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংকলিত করেন। এই গ্রন্থটি প্রায় ১০০০ বছর ধরে অধ্যয়ন করা হতো স্বপ্নব্যাখ্যার জন্য।

স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা পরবর্তীকালে গবেষণা করেন তাঁদের মধ্যে উনবিংশ শতকের ফরাসী মনীষী আলফ্রেড মোরির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোরি স্বপ্নে ফরাসী বিপ্লবের সমগ্র ঘটনাবলী দেখতে পান। তিনি নিজে যে এতে অংশ নেবেন এবং পরে গিলোটিনে তাঁর মৃত্যু হবে এও তিনি দেখেন। ইংলন্ডের একজন খনি ইঞ্জিনিয়ারের স্বপ্নে ভবিষ্যৎ-দর্শনের কথাও আমরা জানি। ইনি ১৮১২ খৃস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী স্পেনসার পার্সিভালের হত্যাকাণ্ড স্বপ্নে দেখেন। এগুলি প্রমাণিত তথ্য।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী ও স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ কার্ল ইয়ুঙ্ (Carl Jung)-এর গবেষণার কথাও আমরা জানি। ইয়ুঙ্ প্রথম দিকে ফ্রয়েডের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মূল সূত্র যৌন কামনা অথবা অন্যের উপর ক্ষমতা বিস্তারের ইচ্ছা—ফ্রয়েড-এর এই তত্ত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেন।

'আবহমানকালের স্মৃতি'

ইয়ুঙ্ বলেন, স্বপ্ন হলো আবহমানকালের স্মৃতি, চিন্তাভাবনা ও সংস্কার বিশ্বাসের রত্নভাণ্ডার। তাঁর মতে আদি যুগ থেকে আহৃত স্মৃতি, সংস্কার, বিশ্বাস, চিন্তা ও জ্ঞান পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে বর্তমানকালের মানুষের মধ্যেও সঞ্চালিত হয়।

মনোবিজ্ঞানী ইয়ুঙ্য়ের পর একজন গবেষক এই স্বপ্নদর্শনের উপর অন্য একটি আরো চমকপ্রদ তত্ত্বের কথা বলেছেন। এঁর নাম জে. ডব্লু. ডান (J. W. Dunne)। ডান পেশায় ছিলেন একজন বিমানযন্ত্র-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম সামরিক বিমান নির্মাণের কৃতিত্ব ছিল এঁরই!

ডান্ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বপ্নে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস পেতে থাকেন কয়েক রাত্রি ধরে। এগুলি সত্য কিনা যাচাই করার জন্য তিনি স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলি লিখে রাখতেন। এগুলি ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ার পর তিনি এ বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহী হন। ১৯১৬ সালে ডানের দেখা একটি স্বপ্ন ১৯১৭ সালের জানুয়ারি অদ্ভুতভাবে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটি পত্রপত্রিকাতেও আলোড়ন তুলেছিল। এই স্বপ্নটা ছিল লন্ডনের একটি বোমা তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৭৩ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হওয়া সম্পর্কিত।

'সময়-সম্পর্কিত পরীক্ষা'

ডান্ তাঁর গবেষণার ফলে একটি দার্শনিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছান এবং পর পর তিনটি গ্রন্থে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ও কালতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রন্থ তিনটির নাম 'সময়-সম্পর্কিত পরীক্ষা' (Experiment with Time), 'ক্রমিক বিশ্ব' (The Serial Universe) এবং 'নব অমরত্ব' (The New Immortality)। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৩৪ এবং তৃতীয়টি তার চার বছর পরে।

ডানের প্রধান তত্ত্ব হলো : কালের অভিজ্ঞতা হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এবং এর একটি স্তরে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের মতই স্পষ্টভাবে দেখতে পারে মানুষ। এই তত্ত্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাঁর মানুষের (অর্থাৎ আত্মার) অমরত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন তাঁর "সময়-সম্পর্কিত পরীক্ষা" গ্রন্থটি মানুষের অমরত্ব সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক যুক্তি। ডানের কালতত্ত্ব অনুসারে আমরা কালপ্রবাহের মধ্যে প্রথমকালের প্রথম পর্যবেক্ষক। কিন্তু এইটাই শেষ বা আসল কথা নয়। আমাদের পাশাপাশিই আছে আরো একটি সত্তা—যার নাম দেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয়কালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক বা দর্শক।

www.pathagar.com

প্রিস্টলির গবেষণা

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক প্রিস্টলি এবং সমারসেট মম ডানের এই কালসূত্র ও অমরতা তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের দুজনের সাহিত্যেই এর প্রতিফলন হয়, উপরন্তু প্রিস্টলি এত উৎসাহিত হন যে তিনি ডানের শিষ্যরূপে কাল সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করে দেন।

১৯৬৩ সালে প্রিস্টলি ব্রিটিশ টেলিভিশনের মারফৎ জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন যে কাল সম্বন্ধে কারো কোন রকম অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হলে তাঁকে যেন অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করেন। ডানের তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রিস্টলি বলেন, দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক যা দেখেন সেটা হল প্রথম পর্যবেক্ষকের মস্তিষ্কে রক্ষিত প্রথম কালের অভিজ্ঞতাসমূহ অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধানুভূতি, স্মৃতিপুঞ্জ এবং তদ্‌জাত চিন্তাপ্রবাহ।

প্রথম পর্যবেক্ষক যখন জাগরিত থাকে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক তখন লক্ষ্য করে প্রথমকালে প্রথম পর্যবেক্ষক কী দেখছে। কেমন করে এটা হয়? এটা সম্ভব হয় ত্রি-মাত্রিক দৃষ্টি শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে। প্রিস্টলির নিজের ভাষায় :

"What Observer 2 observes are what Dunne calls 'the brain states' of Observer 1 (his experience in Time 1)—'the sensory phenomenon, memory phenomena and trains of associative thinking' belonging to the ordinary working life. Now when Observer 1 is awake Observer 2 is attending to what observer 1 is discovering in Time 1 using the three-dimensional focus."

কিন্তু দ্বিতীয় কালের দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিশক্তি চতুর্মাত্রিক। অর্থাৎ প্রথম পর্যবেক্ষকের মস্তিষ্কের সংগৃহীত বা রক্ষিত ভবিষ্যৎ বিষয়াবলীও এই দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের কাছে তার অতীত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিষয়াবলীর মতই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু তখন তো প্রথম পর্যবেক্ষক নিদ্রিত, সেজন্য তার ত্রিমাত্রিক কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিশক্তি দ্বিতীয় পর্যবেক্ষককে সাহায্য করতে পারছে না। দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিশক্তি কিন্তু চতুর্থমাত্রিক এবং প্রথম কালের বিরাট ব্যাপ্তি এর গোচরীভূত।

প্রথম পর্যবেক্ষকের কাছে যা অজানা ভবিষ্যৎ সেই সব বিষয়াবলীও এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক তো সব দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে না এবং সব সময় ঠিক মত মনঃসংযোগও সম্ভব হয় না। তারই ফলে আমাদের বহু স্বপ্নই অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

"But Observer 2 in time 2 has a four-dimensional outlook. This means that the 'future' brain states of Observer 1 may be as open to Observer 2's inspection as Observer 1's past brain states. But it also means that Observer 1 is asleep and his 3-dimensional focus can no longer act as guide for Observer 2 who is left with 4-

www.pathagar.com

dimensional focus can no longer act as guide for Observer 2 who is left with 4-dimensional focus which has a wide Time 1 range-much of it 'future' to Observer 1. Observer 2 cannot attend to all this and it is only now and then that he may succeed. That is why most of the dreams are bewildering."

'মানুষ ও সময়' শীর্ষক অধ্যায়ে প্রিস্টলি বলছেন, "এটা সত্য যে প্রথম পর্যবেক্ষক যখন চতুর্মাত্রা ধরে অগ্রসর হতে হতে শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায় তখন প্রথমকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মৃত্যু হয়। তখন প্রথমকালে কোন কিছু হস্তক্ষেপ বা কাজ করার সব সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এর ফলে প্রথম পর্যবেক্ষকের মস্তিষ্ক ভাণ্ডারের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতালাভ সীমিত হয়ে পড়ে, কিন্তু তার মৃত্যু হয় না। দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক তখন দ্বিতীয়কালে বিরাজ করে।

"দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক এখন দ্বিতীয়কালের মধ্যে অবস্থিত হয়ে প্রথম পর্যবেক্ষক প্রথমকালের মধ্যে থেকে যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তেমনিভাবেই স্মৃতিসংস্কারবোধ লাভ করে। অর্থাৎ তখন দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ পরবর্তীকাল হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তাকে আবার নতুন করে সব কিছু শিখতে হয়; তখন তার চতুর্মাত্রিক কেন্দ্রীভূত প্রত্যক্ষ শক্তি তৃতীয়কালের পঞ্চম মাত্রা ধরে এগিয়ে চলে।"

মানুষ ও বস্তু একই থাকছে, আবার পরিবর্তিতও হচ্ছে—অথবা বলা যায় সেই একই মানুষ ও বস্তু বদলে যাচ্ছে।

মৃত্যুর পরের এই অস্তিত্বেরই কিছু ভগ্নাংশ অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বিকৃতভাবে দেখতে পাই এবং এজন্যই সেটা অদ্ভুত বা দুর্বোধ্য মনে হয়। এর অর্থ বিভিন্নকালের স্মৃতি সংস্কার ও ঘটনা মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে যায় এবং তার তাৎপর্য বোঝা যায় না। এটা বুঝতে হলে মনোবিজ্ঞানী বা জ্ঞানী দ্রষ্টার প্রয়োজন হয়।

লক্ষণীয় যে ডানের কাল ও অমরতার মূল তত্ত্বের অন্তর্গত অনুসিদ্ধান্ত (একই মানুষের দুই স্তরে দুই রকম পর্যবেক্ষণ শক্তি) এবং দুই সত্তা (আধিভৌতিক স্থূল দেহ ও অপ্রত্যক্ষ আত্মিক বা সূক্ষ দেহ) সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ঋষি ও যোগীগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্ভূত স্থির সিদ্ধান্ত এবং উপলব্ধ জ্ঞান ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবহমান দেশকাল (Time-Space continiuum) ও বহুমাত্রিক (multi-dimensional) তত্ত্বের সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় ঋষিগণের ধ্যানধারণা, সাধনা, জিজ্ঞাসা-গবেষণা দেশকালাতীত, অথচ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত অতীন্দ্রিয়ভাবে মহাকাল ও বিরাট সত্তাকে ঘিরে। এরই ফলে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন অনাদি অনন্ত কালপ্রবাহে অবিনাশী আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে গমন। সত্যান্বেষী বিজ্ঞানীরা আজ সেই পথেরই প্রান্তে উপনীত।

মহান কিরো হস্তরেখা পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করতেন তা বাঙ্গালী পাঠক সবারই জানা। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করা হল না। মানুষের হাত টেনে নিলেই তাদের কাছে একটা সত্ত্বা ধরা পড়ত, তাদের মনে হত ... ভবিষ্যত তারা দেখতে

www.pathagar.com

পেতেন। বুলগেরিয়ার অন্ধ ভবিষ্যতদ্রষ্টা ভঙ্গাও এমনিভাবে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। ভঙ্গা ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯৯৬ তে মারা যান।

১৫.২ সময় ভ্রমণ বিজ্ঞান

যে কোন জিনিসের পরিবর্তন দ্বারা সময়কে মাপা যায়। চন্দ্র-সূর্যের ঋতু পরিবর্তন, পালস্-বিট ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে সময় বিরামহীনভাবে পৌনঃপুণিক ধারায় বয়ে চলছে। সময়ের নিষ্ঠুর হাত সবকিছুকে ক্ষয়, লয়, বিলয়, মৃত্যুর (decay, destructicn, disrolution, death) হাতে সপে দেয়। নিউটনীয় চিরায়ত পদার্থবিদ্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নীতিগুলি সময়কে সামনে এবং পেছনে যেতে বাধা দেয় না। গ্যাসের একটি বাকানো অণুকে যদি আমরা বিপরীত দিকে এর গতিপ্রবাহ চালু করি তাহলে এটির আবক্রপথ (trajectory) উভয়দিকেই সমরূপ দেখায়। কিন্তু বেলুন থেকে গ্যাস চেড়ে দিলে (গ্যাসে বহু কণিকার সমাবেশ থাকে) এগুলি শুধু চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়, পিছনে এসে আর বেলুনে ঢুকে না। এতে গ্যাসের একমুখী গতি বুঝা যায়। যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি সময়ের উভয়মুখী (সামনে ও পেছনদিকে) গতি স্বীকার করে সেখানে কণিকা সমাবেশের এই আবরণ কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? এ নিয়ে বোলজ্‌ম্যান এবং ম্যাক্সওয়েল যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

নিউটনের সূত্রগুলিও সময়ের দ্বৈতমুখীনতা মেনে নেয়। তারপর তাপগতিবিদ্যার শুরু হয় এবং এন্ট্রপি ধারণার বিকাশ হয়। শুরু হওয়া যে কোন জিনিসের ধ্বংস আছে—এটার কোনো উল্টো দিক নেই। তাই এন্ট্রপিকে সময়ের একমুখী তীর (arrow) আখ্যায়িত করা হয়। আইনস্টাইন এসে বললেন 'সময় ও আপেক্ষিক' প্রপঞ্চ মাত্র। দেখা গেল গত তিনশত বৎসরে বহু ধরনের "সময়" এর ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সময়ের ধারণা প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানেই সময় রহস্যময়। তাই বিজ্ঞানীর চাইতে কবিই তার অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা সময়কে উপলব্ধি করতে পারেন বেশি। যেমন—

All kings and all their favourites,
All glory of honours, beauties, wits,
The Sun itself, which makes times as they pass,
Is elder by a year, now, than it was
When thou and I first one another saw;
All things to their destruction draw,
Only our love hath no decay;
This, no tomorrow hath, not yesterday;
Running it never runs from us away,
But truly keeps his first, last everlasting day
from "The Anniversary" by John Donne

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর নতুন বিজ্ঞানে চিরায়ত বিজ্ঞানের সর্বজনীন সরলতা, নিয়মানুবর্তিতা, অনিবার্যতা, শৃঙ্খলা ও কালের উভয়মুখিনতার স্থান নিয়েছে জটিলতা, আকস্মিকতা, নিয়মানুবর্তী বিশৃঙ্খলা ও কালের একমুখিনতা। ভারসাম্যের রাজ্য ছেড়ে এই বিজ্ঞান পৌঁছে গেছে ভারসাম্যহীনতার রাজত্বে, সরলরৈখিক সম্বন্ধ ছেড়ে বক্ররৈখিক সম্বন্ধের গাণিতিক জটিলতায়। সেখানে এনট্রপি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলা থেকে নতুন নতুন বিলয়ী মূর্তির স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই বিশ্বের মধ্যে ভারসাম্য আছে বটে, কিন্তু সেটাই তার প্রধান পরিচয় নয়—তার প্রধান পরিচয় ভারসাম্যহীনতা। নিয়তপরিবর্তনশীলতাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সনাতনী ভাবধারার শাশ্বতবাদ থেকে এই বিজ্ঞান সরে এসেছে ক্রমবিবর্তনবাদে, being থেকে becoming এ।

এই জটিলতা ও কালের ভবিষ্যন্মুখিনতা বাস্তব জগতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। সময়ের এই একমুখিনতার চেতনা বিবর্তনের জটিলতার ধাপে ধাপে বাড়তে দেখা যায়। মানুষের চেতনায় এসে ঘটে তার চরম অভিব্যক্তি। আমরা কেবল অতীতকেই স্মরণ করতে পারি, ভবিষ্যতকে নয়। আমাদের এই চেতনাকে আমাদের অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে আমরা ভাবতেই পারি না। ধ্রুপদী বিজ্ঞান আমাদের এই চেতনাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কি ভ্রম।

বিশ্বতত্ত্বে কালের একমুখিনতার উৎপত্তি একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। বিশ্বের আদিপর্বে মহাকর্ষের সঙ্গে অন্যান্য মৌলিক বলগুলো একীকৃত হয়েছিল আর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা পৃথক হয়ে বৈচিত্রময় জগতের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রথমেই ঠিক কী ভাবে কাঠের একমুখিনতার উৎপত্তি হয়েছিল তা আজও পরিষ্কার নয়। কালের তিনটি তীর যথা CPT: একটাকে নির্দিষ্ট করছে বিশ্বের সম্প্রসারণ (Charge), দ্বিতীয়টাকে নির্দিষ্ট করছে এন্ট্রপি বৃদ্ধি (Postion), আর তৃতীয়টা রয়েছে জীববিবর্তনের চরম অভিব্যক্তি হয়ে আমদেরই চেতনার মধ্যে (Time)। এই তিনটি তীর কি পরস্পর স্বাধীন? নাকি তাদের মধ্যে রয়েছে কোনো গুঢ় সম্বন্ধ? কোনো সম্বন্ধ না থাকলে তারা একই দিক নির্দেশ করছে কেন? এদের মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কি সে সম্পর্ক তা আজও বিজ্ঞানের কাছে সুস্পষ্ট নয়।

এন্ট্রপি বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের চেতনায় সময়ের একমুখিনতার সম্বন্ধটা আজ অনেকটা পরিষ্কার। কিন্তু তার সঙ্গে বিশ্বতত্ত্ব ও বিশ্বের সম্প্রসারণের কি কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে? যদি থাকে, ও একদিন যদি বিশ্বের সংকোচন শুরু হয়ে যায়, তাহলে সেই সংকোচনের সঙ্গে এন্ট্রপি বৃদ্ধিজাত কালের একমুখিনতার একটা বিরোধ দেখা দেবে। তখন কি তাপগতিবিজ্ঞানের কালের রথ উল্টোদিকে চলবে? আধুনিক বিজ্ঞানের এই সমস্ত প্রশ্নের আজ কোনো উত্তর নেই।

যদিও আইনস্টাইনের আপেক্ষিবাদের সমীকরণ দিয়ে "বদ্ধ সময়-এর মত বক্র" রেখা ধরে দেশকালের আবক্র পথে সময়ে পেছনদিকে ভ্রমণ করা যায়; তথাপি এই সূত্র ধরে কোন টাইম মেশিন অদ্যাবধি তৈরি করা সম্ভব হয়নি, পদার্থবিজ্ঞানের কোন নীতি দ্বারা তা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত করা যায় নি বলে। চিরায়ত বলবিজ্ঞান ও কোয়াটাম বলবিদ্যার

www.pathagar.com

সমীকরণগুলি আরও সূক্ষ্ম, আরও বিকশিত হলে পর হয়ত বা টাইম মেশিন বসানো যাবে। যা দিয়ে সময়ের পেছনে বা সামনে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে।

নীতিগতভাবে আলোর গতির কাছাকাছি (দশমিক পার্থক্যে) বেগে চলে মহাকাশযানের সময়ে ৫৬ বছর লাগবে পরিচিত বিশ্ব ভ্রমণ করতে। ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরে আসতাম এক হাজার কোটি বছর দূর ভবিষ্যতের পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে এবং তার মৃত সূর্যকে দেখতে। আপেক্ষিকতাভিত্তিক মহাকাশ ভ্রমণ অপরিমেয় মহাবিশ্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে উন্নত সভ্যতার কাছে, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের কাছে যারা ভ্রমণে যাবে। এমন কোনো পথ নেই যাতে রেখে আসা পৃথিবীতে আলোর গতি থেকে দ্রুত তথ্য পাঠানো যেতে পারে, আর যে যাবে সে নিজেও সেই পরিচিত পৃথিবী, ভাইবোন এবং প্রিয়জনদের কাছে কখনো ফিরে আসবে না। তারা সবাই কালের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে সময়ের গতিকে শ্লথ করে দেওয়া সম্ভব, দূর ভবিষ্যতেও যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেখান থেকে কোনোক্রমে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের সবচেয়ে বোধগম্য একক হলো ৬ থেকে ১২ সেকেন্ডের একটি ব্যাপ্তি। আর তা যদি না হয়ে ১ সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হতো তবে সঙ্গীতের প্রতিটি নোট, প্রবন্ধের প্রতিটি ধ্বনি পৃথকভাবে প্রতিভাত হতো এবং প্রবন্ধের উপজীব্য অথবা সঙ্গীতের মূর্ছনা আমরা বুঝতে পারতাম না। বিভিন্ন পরীক্ষা এটা দেখায় যে, অন্যান্য প্রাণীর সময় পার্থক্যের সংযোগ তৈরি করার সামর্থ্যের অভাব আছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা সময়ের এক সেকেন্ডকে ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগকে হাজার ভাগে ভাঙতে পারেন। জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চিতরূপে বলেন, আমাদের শরীর নিজেই হলো আমরা এখনো পর্যন্ত যতটুকু নির্মাণ করেছি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্লকওয়ার্ক বিশ্বের অংশ। আমরা জানি ভৌত সময় হলো আপেক্ষিক। কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে—আমরা কি সময়ের মধ্যে দিয়ে পরিভ্রমণ করতে পারি অথবা সময়ের উল্টোদিকে ছুটতে? কার না ইচ্ছা করে সময় অথবা ক্যালেন্ডারের পিছনের দিকে যেতে—অতীতের ভুলগুলোকে শোধরাতে, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান নিয়ে শৈশবে ফিরে যেতে, ডেমোক্রিটাসের সঙ্গে সক্রেটিসের কী আলাপ হয়েছিল এথেন্সে তা জানতে অথবা অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে তিব্বতের আলোআঁধারি পথে হেঁটে যেতে?

একটি সাবঅ্যাটোমিক কণা সম্ভবত যুগপৎভাবে সময়ের উল্টোদিকে পরিভ্রমণ করতে পারে। যেভাবেই হোক, এমনকি যদি ভৌত নিয়ম এই ধরনের ভ্রমণ অনুমোদন করে তারপরও বিশাল সন্দেহ থেকে যায়, মানুষের পক্ষে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব কিনা? 'নেচার' পত্রিকার ৩৫৭ খণ্ডের ৭ মে ১৯৯২ সংখ্যার (পৃষ্ঠা ১৯-২১) ব্রস এলেন এবং জনাথান সাইমন কসমিক তন্তু ধরে সময়ে ভ্রমণ করার ব্যাপারে দৃকপাত করেছেন। এতে তারা জে. আর গটের টাইম মেশিন, মরিস এবং থর্ণের কাসিমির এফেকটির দ্বারা তৈরি টাইম মেশিন নিয়ে আলোচনা করেন। দেখা যায় স্ট্রিং-এর সিস্টেমের ভর বেগ হবে টাকিয়নিক গতি আর স্ট্রিং এর কেন্দ্রের ভর হবে অট্যাকিয়নীয়, আমাদের বিশ্বে এমন ধরনের আপেক্ষিক বেগের স্ট্রিং পাওয়া যাবেনা। মেশিনটি স্টার্টই

www.pathagar.com

নেবে না। আর তাছাড়া অসীম দৈর্ঘের কসমিক সুতো পাওয়া ও যায় না। সীমিত দৈর্ঘের মহাজাগতিক তন্তু দিয়ে টাইম মেশিনটি বানালে এটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়ে যাবে আর স্টার্ট নেবার আগেই অদৃশ্য হয়ে পড়বে। হয়ত বা এমনও হয়ে আছে যে আমাদের মহাবিশ্ব ইতোমধ্যেই এমন ধরনের একটি টাইম মেশিন বানিয়ে রেখেছে।

যতদিন যায় তাই নূতন নূতন টাইম মেশিনের ডিজাইন কাগজের পাতায় আসে, তারপর যাচাই বাছাইয়ের বেলায় দেখা যায় কিছুই টেকেনা। এ যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রচেষ্টার কথা, যখন মানুষ ভাবত "চিরস্থায়ী ইঞ্জিন" বানানো সহজই বটে। অথচ বানানো গেলনা। তাপগতিবিদ্যার ২নং সূত্রানুযায়ী কার্ণটের চক্রের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে স্বয়ং প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত বাঁধা যা কোনদিন অতিক্রম করা যাবে না। টাইম মেশিনও এমনি এক প্রহেলিকা যা প্রকৃতি অনুমোদন করে না।

সায়েন্স ফিকশনে প্রায়ই হাইপার ডাইভ বলে একটি ব্যাপার দেখা যায়। কাল্পনিক মহাকাশ ভ্রমণের একটি কাহিনী যার সাহায্যে কেউ ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোলে লাফ দেন তবে তিনি দেশ-কালের একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে অতিক্রম করে মহাবিশ্বের অন্য স্থান দিয়ে বের হয়ে যাবেন। বাস্তবে কিন্তু তা হবেনা। ব্ল্যাকহোলে ঝাপ দিলে ইভেন্ট হরাইজনের সীমায় ঢুকার আগেই শরীর ঝাজরা হয়ে যাবে। আবার ব্ল্যাকহোলের বিপরীতে হোয়াইট হোলের কথা বলা হচ্ছে। ব্ল্যাকহোলে ঝাঁপ দিয়ে মহাকাশের অন্য কোন স্থানে অবস্থিত হোয়াইট হোল দিয়ে অতি দ্রুত হয়ত বেরিয়ে যাওয়া যাবে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ অনুযায়ী ব্ল্যাকহোল আর হোয়াইট হোল কাল্পনিক সরু সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত। তবে এ ধরনের সমাধান অস্থায়ী প্রকৃতির। সামান্য আলোড়নে ওয়ার্ম হোলটি নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি ওয়ার্ম হোলকে টিকিয়ে রাখা যায় এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার হলে পর তখন একে শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করে অল্প সময়ে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে।

আমরা জানি, ঠিক আলোর বেগে চললে সময়ের কাটা থেমে যাবে। আপেক্ষিকবাদ তাই বলে। বাইরের বস্তুজগতে কোটি কোটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, অথচ ইত্যবসরে সেই স্পেসশিপের যাত্রীদের কাছে মাত্র এক নিশি পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শক্তি ও বস্তুকণার মতো খণ্ড খণ্ডভাবে বিভক্ত। শক্তির এই খণ্ডকে কোয়ান্টাম বলে। সময়েরও কি কোয়ান্টাম আছে? এমন অবিভাজ্য কণা। দুটো পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটা আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে ন্যূনতম সময়ের ব্যবধানকে সময়ের কোয়ান্টাম বলা যেতে পারে। তাই যদি হয় তবে সময়ের প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন নয়, একে ধরা যায়। সময় লাফ দিয়ে দ্রুত প্রবাহিত হয়। আবার সময়ে আস্তে চলে কিংবা বেড়ে চলে। তবে এ জাতীয় ধারণা এখনও অপরীক্ষিত। তা কেবল মনেই আছে। ৫০ বছর আগে গণিতজ্ঞ কুর্ট গোডেল সাধারণ আপেক্ষিকবাদকে কাজে লাগিয়ে এমন ধরনের দেশকাল আবিষ্কার করেন যাতে সময় ভ্রমণ সম্ভব। তার প্রস্তাবিত স্থান-সময় অনুযায়ী মহাবিশ্ব লাটিমের মতো ঘূর্ণমান। এরকম একটি মহাবিশ্বে সময় ভ্রমণ করা যাবে। একজন টুরিস্ট পৃথিবী হতে রওয়ানা দিয়ে ফিরে এসে দেখবেন তিনি অতীতে চলে এসেছেন। বাস্তবে মহাবিশ্ব ঘূর্ণায়মান নয়। তাছাড়া গোডেলের সমাধানে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের মান আছে যা বর্তমানে

www.pathagar.com

স্বীকৃত নয়। গোডেলের স্থান-সময়টি একদম অন্য রকম। স্রষ্টা বোধহয় মহাবিশ্বকে এ রকমভাবে সৃষ্টি করেননি।

সময় ভ্রমণের জন্য ওয়ার্মহোলের সুড়ঙ্গটি (ব্রিজ) টিকিয়ে রাখা কিংবা স্থান-সময়কে সেই মতো করে বাঁকিয়ে আনতে যা করা প্রয়োজন তা হল ঋণাত্মক বক্রতার স্থান-সময় তৈরি করা। সে এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। তাই এ ধরনের টাইম ট্রাভেল কোনদিনও সম্ভব হয়তো হবে না। অনিশ্চয়তাবাদের কারণেই কোনও বস্তুর অতীতমুখী যাত্রা সম্ভব না। এতে অতিবিকীরণ উৎপন্ন হবে যার জন্য দেশকাল তীব্রভাবে বেঁকে যাবে। ফলে যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া অতীতে যেতে চাইলে তার পরিণতি সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে লয় পাবে। টিভিতে 'স্টার ট্রেক' সিরিজটি দেখানোর পর আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস "ফিজিক্স অফ স্টার ট্রেক" নামে একটি বই লিখেন। অবশ্য ইতোমধ্যে তিনি *Beyond Star Trek, More Physics of Star Trek*ও লিখেছেন। তা ছাড়া বের হয়েছে Thomas Richards এর *The Meaning of Star Trek* এবং Richard Hanley এর *The Metaphysics of Star Trek* বইগুলি। আমার মনে হয়, আমাদের বাঙালী পাঠকদের এই বইগুলো পড়া খুবই জরুরী।

'স্টার ট্রেকের' এন্টারপ্রাইজ জাহাজের অভিযাত্রীরা (ক্যাপ্টেইন পিকার্ড ও তার সঙ্গীরা) দেখা যায় পৃথিবী থেকে ৪ আলোকবর্ষ দূরের তারায় গিয়ে হাজির হয় মাত্র কয়েক মুহূর্তে। অথচ আপেক্ষিকবাদের সূত্র তারা ভাঙ্গে না। এটা তারা সম্ভব করে এ উপায়ে। তারা তাদের রকেটটি নিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠের ২০০০ মাইল উর্ধ্বাকাশে পৌঁছে। তারপর তাদের এবং ঐ তারকাটির মধ্যকার দূরত্বের স্থানকে ধসিয়ে ফেলে মুহূর্তে। ফলে তাদের সাথে পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে হয় ৪ আলোকবর্ষ। অভিযাত্রীরা ঐ তারায় পৌঁছে যায় নিমেষেই, ঘড়িতে কোন পরিবর্তন আসেনি, কোনো বস্তু পরিবর্তন হয় না। এটাকে Warp Drive বলে। অঙ্কের সাহায্যে এটা প্রমাণিত। আর বাস্তবে এটা ঘটাতে চাইলে দেশ বা স্থানকে প্রসারিত করতে চাইলে ধাক্কা দেবার (প্রতিঘাত) একটা ঋণাত্মক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে মধ্যাকর্ষীয় শক্তির সঙ্গে। আবার সেই ওয়ার্মহোলের ব্যাপার।

১৫.৩ : সময় ভ্রমণ কল্প-বিজ্ঞান

যদি আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিসম্পন্ন না হয় তাহলে টাইম মেশিনে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে কিভাবে? তাতে করে আর যাই হোক কোনো মানুষ আর তার বর্তমান অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে না।

উল্লিখিত বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। ধরা যাক, কেউ টাইম মেশিনে করে চেঙ্গিস খানের আমলে চলে গেলো এবং কিছু সময় অবস্থানের পর সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলো তার বর্তমান অবস্থানে। কিন্তু যদি আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতিতে না আসতে পারে তাহলে তার ফিরে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততোক্ষণে হয়তো ভ্রমণকারীর প্রজন্মের অনেক কিছুই বদলে যাবে। কিংবা ধরা যাক টাইম মেশিনে কেউ হয়তো অন্য গ্রহের কোনো এক অতীত মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছালো। সেখানে যাওয়া এবং ফিরে আসার জন্য যদি আলোর চেয়ে দ্রুতগামী মেশিন না পাওয়া যায় তাহলে

www.pathagar.com

ভ্রমণকারী হয়তো জীবদ্দশায় আর ফিরে আসতে পারবে না তার জন্মদানকারী এই মোহময় পৃথিবীতে।

আলোর গতির চেয়ে দ্রুত চলার একটি উদাহরণ অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে (১৯৯৭) পাওয়া গেছে। কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুণতার নিমজ সম্প্রতি মোজার্ট-এর ৪০তম সিম্ফনি সময়ের মেশিনে আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদেরকে টাইম মেশিনের যাত্রী হতে উৎসাহিত না করে পারে না। পদার্থবিদ্যার এতোদিনকার প্রচলিত ধারণা কিন্তু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে যায় কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রফেসরের এই পরীক্ষা দ্বারা। শুধু জার্মানি নয় অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী মহলও কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এই কারণে নয় যে, এটি একটি ভ্রান্ত প্রতিপাদ্য। বরং এটিকে এগিয়ে নেওয়া ঠিক নয় এই মুহূর্তে—এটাই তাদের অভিমত।

এইসব নানামুখী কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে কল্পকাহিনী থেকে বাস্তব বিতর্কে নেমে আসতে সক্ষম হয়েছে টাইম ট্যুরিজমের বিষয়টি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ড. ডেভিড ডেইস সম্প্রতি একটি পুস্তক রচনা করেছেন দি **ফেব্রিক্স অফ রিয়েলিটি** নামে যা পেঙ্গুইন প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। টাইম ট্যুরিজমের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ করে সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি কাল্পনিক ঘটনা যেখানে একজন টাইম মেশিনে ভর করে অতীতে ফিরে গেলো তার পূর্ব পুরুষের জমানায়। সেখানে গিয়ে ঘটনাক্রমে তার নিজের ঠাকুরদাকেই হত্যা করে বসলো ভ্রমণকারী। এখন প্রশ্ন হলো, ভ্রমণকারী যদি সত্যি সত্যিই নিজের ঠাকুরদাকে হত্যা করে তাহলে কি তার জন্ম হতে পারে? তার জন্ম না হলে সে অতীতে গেলো কিভাবে?

টাইম মেশিনের সম্ভাব্যতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে অতিসম্প্রতি। অটোমোটিক একটি কসমিক ঘড়ি লন্ডন থেকে প্রেরণ করা হয় ওয়াশিংটনে। এতে মধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সময়ের গতির একটি তুলনামূলক রেকর্ড রক্ষিত হয়। ফ্লাইট সময় ও ভূমণ্ডলীয় সময়ের মধ্যে কিছুটা হলেও হেরফের নজরে আসে পর্যবেক্ষণকারী ঘড়িটিতে, যা টাইম মেশিনের ধারণাকেই শক্ত ভিত্তি দান করে। সময় যে গতির দ্বারা প্রভাবিত হয় তা জানান দিল এই নিরীক্ষণ।

টাইম মেশিন নিয়ে পরবর্তী পরীক্ষাটি হলো ক্যালিফোর্নিয়া টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের কীপ থর্ন ও তার দুই সহযোগীর। তারা ১৯৮৫ সাল থেকে মহাকাশের কৃষ্ণ গহবরের আদলে ওয়ার্মহোলের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তারা এই কৃষ্ণ গহ্বরের মাধ্যমে দুই বিশ্বের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফিজিকাল রিভিউতে ওই পরীক্ষার ফলস্বরূপ তাদের বিখ্যাত লেখা টাইম ট্রাভেল প্রকাশের পর হৈচৈ পড়ে গেলো আমেরিকা জুড়ে। এই ধারণাকে অবলম্বন করে টাইম ট্রাভেলারের কল্পকাহিনীও প্রকাশ হতে থাকে।

টাইম ট্রাভেলের ধারণাকে নিয়ে এরপর অগ্রসর হলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী **ইগর নভিকভ**। তিনি থর্নের ধারণাকে সমর্থন করে আরো অগ্রসর করতে প্রয়াসী হন। তার সঙ্গে যুক্ত হন স্টিফেন হকিনস। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থর্ন তার ধারণাকে আরো পাকাপোক্ত করে একটি টাইম মেশিন তৈরি করতে উদ্যোগী হন।

www.pathagar.com

টাইম মেশিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো একটি ওয়ার্মহোল সৃষ্টি করা যা ভ্রমণকারীকে এক সময় থেকে অন্য সময়ে নিয়ে যাবে। অনেকটা যাদুর বাক্সের মতোই। ভ্রমণকারী টাইম মেশিনের সাহায্যে অদৃশ্য হয়ে যাবেন এক সময় থেকে অন্য সময়ে। **এই অদৃশ্য হওয়ার বিষয়টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।** কারণ যদি সবকিছু ঠিকঠাক মতো না এগোয় কিংবা সামান্য ত্রুটিও থাকে তাহলে হয়তো ভ্রমণকারী হারিয়ে যাবেন চিরদিনের মতো। এমনকি তিনি পুড়ে নিঃশেষও হয়ে যেতে পারেন। টাইম মেশিনের বিষয়টি এখনো বিজ্ঞানীদের মনোজগতে আর কল্পকাহিনী লেখকদের হাতের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও টাইম ট্রাভেলের মূল প্রতিপাদ্য নিয়ে কিন্তু ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। সেই ভাবনার একটি হলো এরকম :

টাইম ট্রাভেলের বিষয়টি বাস্তবে ঘটতে পারে ভিন্নতর গ্রহে। **একজন ভ্রমণকারী ভিন্ন গ্রহে গিয়ে কাউকে হত্যা করলেও তার গ্রহের বর্তমান**—ভবিষ্যতের কিছু আসবে যাবে না। যদি এই তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমাদেরকে **বহুবিশ্বতত্ত্ব** মেনে নিতে হয়। আমাদের পৃথিবীর মতো অসংখ্য জীবনবাহী বিশ্ব আছে এই মহাব্রহ্মাণ্ডে যাতে ভ্রমণ করাও সম্ভব। এই ভ্রমণ তালিকায় আমরা আদিকাল থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকেও পা দিতে পারি। অনেকটা পুরানের স্বর্গ মর্ত পাতাল ভ্রমণের মতো ব্যাপার।

তবে এই সময় ভ্রমণের **অভিধানে প্রত্যাবর্তন নামে কোনো শব্দ আছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন না।** অবশ্য দার্শনিকের মতো তারা এই কথাও বলেন যে, কোনো ভ্রমণই দ্বিমুখী নয়। একজন যে স্থান থেকে যাত্রা করে সে তো আর সেই স্থানে ফিরে আসে না। **সতত চলমান এই বিশ্বে প্রত্যাবর্তন বলে কোনো শব্দ তো নেই।** আমি আজ সকালে যেখান থেকে যে সময়ে যাত্রা করছি বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এলেও তো সময়ের হেরফের ঘটছে। আর ঘটছে মহাকাশের নিয়মে **স্থানেরও রকমফের**। আসলে এভাবেই সময় ভ্রমণ করতে করতে আমরা এক সময় যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়ে যাই যা হয়তো আমরা প্রতিদিন টের পাই না। যখন অনুভব করি তখন তো **সময় ভ্রমণে অনেক পথ** পেরিয়ে এসেছি যা থেকে ফিরতি যাত্রা সম্ভব নয়। সময় ভ্রমণটিকে এভাবে তো আমরা দেখতে পারি। বিজ্ঞানীরা যাকে দেখেন আরো গুছিয়ে এবং তত্ত্বগতভাবে। হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে তা আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠবে বিজ্ঞান আরো অগ্রসর হাওয়ার কল্যাণে।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

অচেনা অজানা অদ্ভুত সময়ের কাহিনী

সময় চমকে ভরা। যতই গভীরে ঢুকবে ততই অচেনা লাগবে, অজানা মনে হবে আর অদ্ভুত দেখাবে—Strange Times. চিরায়ত ধারণার সময় নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহমান সাথে আমাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যায়।

(ক) বিস্ময়কর মনে হবে যদি বলা হয় যে সময় আদৌ প্রবাহিত হয় না। যদিও সময় সুনির্দিষ্টভাবে একটি দিক নির্দেশ করে থাকে এবং সময়ের তীরটির হদিস পাওয়া যায় স্বয়ং বিগব্যাঙের কাছ থেকেই। সময়ের তীর নিয়ে ইতোমধ্যে আমরা কিছু বলে ফেলেছি—এবার এর বাকীটুকু বলার চেষ্টা করব।

(খ) জনপ্রিয়ভাবে মনে করা হয়, সময় হচ্ছে এমন একটি মাত্রা বিশেষ যাহা স্থানের মাত্রার সঙ্গে মিশে আমাদের চারিপাশের দৃশ্যমান জগতকে গঠন করে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে সেখানেত আরেকটি সময়-মাত্রা বিদ্যমান যে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। আবির্ভূত হবার পর সে অতীত ও বর্তমান কালকে নিয়ে মহা তোলপাড় শুরু করে দিবে। আসছে এবার অধি-সময় বা অধিককাল। হাইপার স্পেসের মতই হাইপারটাইম।

(গ) প্রথাগত ধারণানুযায়ী পার্থিব একটি দিনকে সেকেন্ডে ভাগ করে নিলেই কাজ কর্ম চালাতে সুবিধে—সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। এটা ঠিক না! পৃথিবীর ঘুর্ণনের সঙ্গে সেকেন্ডের ঘুরার কোন সম্পর্কই নেই বন্ধু। এমনকি পরমাণুর অদ্ভুতজনক কম্পনের সঙ্গেও এর কোন যোগাযোগ নেই। সেকেন্ডের মিলিয়ন-বিলিয়ন গুণ ছোট সময়কেও রেকর্ড করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং নোবেল লাভ করেছেন তজ্জন্য। পরমাণুর (একটি) পিট্‌পিট্ করে তাকানো নিয়ে কিছু বলা যাবে।

(ঘ) টেলিফোন নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে বিদ্যুৎপ্রবাহ পর্যন্ত সর্বত্র অতি সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম পরিমাণ সময়কে নির্ধারণ করা হয় আজকের দিনে টাইম পালস্ ব্যবহার করে। কি হবে, যদি কোন সন্ত্রাসী দল পালসগুলিকে হাইজ্যাক করে বসে? শুধু ঘড়িগুলোই বন্ধ হবে না, আরও কিছু ঘটবে তখন। আসুন এবার ক্যাওয়াসের কাউন্টডাউন (গণনা) শুরু করে দেই।

(ঙ) এতসব অদ্ভুত, অচেনা বিষয়ের ভেতর একটি চিরচেনা জিনিস কিন্তু আছে ঠিকই—যা নিয়ে নতুন করে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে ভাবা যায়। তা হ'ল মজা বা কৌতুকের সময়, সময় কিন্তু অজান্তে দৌড়ে অতিক্রম করে পথ আর কষ্টের সময়, সময়ের পথ খুবই দীর্ঘ মনে হয়। আশ্চর্য হবেন শুনলে যে মস্তিষ্ক সঠিকভাবেই এই কৃতিত্ব চালিয়ে যায়। যখন একটি সেকেণ্ড দীর্ঘ হয়ে যায় চিরকালের জন্য...

www.pathagar.com

সময়ের এতসব উদ্ভট অদ্ভুত কাহিনী শোনার এটাই উপযুক্ত সময়। যদি আপনি আরও জানতে চান, কয়েকটি মুহূর্ত ব্যয় করেন অনুগ্রহপূর্বক এবং পড়তে শুরু করুন ...

১৬.১ : সময়ের দিক বা লক্ষ্য ধরে

অতীতের সেই সোনার শৈশব আর ফিরে আসবেনা। শৈশব আমাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ। সেই শৈশবের স্মৃতি অবিস্মরণীয়, ভোলা যায় কি? সেই স্মৃতি প্রেরণা জাগায় মনে—উদ্বুদ্ধ করে, সেই সজীবতা আর প্রশান্তি কি আর কোনদিন ফিরবে? না ফিরবেনা। হৃদয় ভাবীকালের মাঝে বেচে রয়। ভাবীকাল আর আসেনা। যা আসে তা হয়ে যায় আজ। বাস্তব শুধু আজকের দিনটিই; এখন মুহূর্তটি। আমাদের কমনসেন্স এমন কথাই বলে। বাধ সেধেছেন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা। তারা বলছেন, ঠিক না। সময় একদমই বহেনা। সময় দাঁড়িয়ে আছে।

শতাব্দীর শুরুতে কেম্ব্রিজের দার্শনিক জন টেগার্ড সময়ের দুটি বিরোধপূর্ণ ধারণা পেশ করেন। যার একটি হচ্ছে, ঘটনার স্থানাঙ্ক বিন্দু, অন্যটি হচ্ছে সময়ের প্রবাহ ঘটনার সংঘটন, ভাবীকাল। কিন্তু সঠিক কোনটি? হার্ভাডের দার্শনিক ডোনাল্ড উইলিয়ামস ১৯৫১ সনে "দ্যা মাইথ অব দ্যা পেসেজ" শীর্ষক প্রবন্ধে এর জবাব দেবার প্রয়াস পান। তার মতে স্টেটিক, স্থির, স্থানাঙ্কবিন্দুর সময়ের ধারণাটিই সঠিক। অনেকে তাকে সমর্থন জানান।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব জানান দিল যে সময় বিশ্বজননীন বা সবার জন্য কমনভাবে উপস্থিত নয়। সময় আপেক্ষিক। আলাদাভাবে সংঘটিত দুটি ঘটনা এবং একজন দর্শনের কাছে আলাদাভাবে অনুভূত হবে। দর্শকের গতিবেগের উপর সময় ব ঘটনার কাল নির্ভর করে। যুগপৎ-এর আপেক্ষিকতা সময় সম্পর্কের ধারণায় পরিবর্তন এনেছে। পদার্থবিদরা সময়কে সর্বত্র একভাবে দেখতে চান ভূব্যাপী বিস্তারিত জমির মত। এই ধারণাকে ব্লক টাইম বলে।

সময়ের প্রবাহকে আমাদের কাছে মানসিক ঝাকুনি (quirk) বলে মনে হয়। রজার পেনরোজ মনে করেন ওয়েভ ফাংসনের লয়ের দরুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বদৌলতে সময়ের উৎপত্তি ঘটে। আমাদের চেতনায় কোয়ান্টাম স্তরের দ্বৈততার দ্বন্দেই সময়ের প্রবাহ শুরু হয়। বাস্তব জগতে সময় চলতেই থাকে। সময়ের তীর বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকেই ছুটে চলে। প্রশ্ন হলো এই দিক চিহ্নটা আসে কোত্থেকে? এর উৎস কি? নিয়ম বা order সর্বদাই অনন্য। কিন্তু বিশৃঙ্খলা বা disorder অবস্থা হচ্ছে একাধিক। নিয়মকে নাড়া দিলে বহু অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটি কম অনিয়ম অবস্থা বেরিয়ে আসে। সুতরাং সময়ের দিকচিহ্নের উৎস খুঁজতে হলে আমাদেরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের উৎসটাই খুঁজতে হবে। অথচ বিগব্যাঙে দেখা গেছে সবচেয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। এখানেই মাধ্যাকর্ষণের আগমন ঘটে।

মহাকর্ষের টানে বস্তু জমাট বাঁধে—শেষমেষ কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। মহাকর্ষে তাপগতিবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করলে পর কৃষ্ণবহ্বরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অন্তিম পর্যায় ধরা যায়। সাম্য অবস্থায় আসলে তথ্য প্রবাহ সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণগহ্বরেও তথ্যের সমাধি ঘটে যায়।

www.pathagar.com

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অপরদিকে মহাকর্ষীয় বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে। তাপগতিবিদ্যা সূত্র ঠিকই থাকে। তাই দেখা গেল, বিশ্বের শুরুতে মহাকর্ষীয় সুবিন্যস্তকরণের থেকেই সময়ের তীরটি তার যাত্রা শুরু করেছিল। বিশ্ব তখন স্ফীতির মাধ্যমে স্থান বাড়াচ্ছিল, তাই স্থান খুবই শৃঙ্খলভাবে চলছিল চৌ-দিকে।

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা সূত্র এবং সম্ভাব্য বহু বিশ্বের ধারণা কিন্তু বাস্তব জীবনে শৃঙ্খলভাবে দেখি। তাপগতিবিদ্যার অসাম্য নীতিই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এমনটিই জীবিত প্রাণীরা অনুভব করে। সবকিছুর 'শুরু' আছে এবং তা শেষ হয় 'সমাপ্তি'তে।

পদার্থবিজ্ঞানে যেমন স্থানের কোনো দিক নেই, তেমনি কালের ও কোন দিক সে পছন্দ করে না। একেকটি গ্যালাক্সির তীর এক এক দিকে। তারা প্রতিসাম্যকে ভেঙ্গে দেয়। তাই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও রয়েছে বহুসংখ্যক সময়ের তীর। যদি আমাদের বিশ্ব তার নিয়মাবলীর 'টাইম সিমেট্রি"কে ইতোমধ্যেই না ভেঙ্গে থাকে, এবং একটি "সময়ের তীর" উৎপন্ন করে থাকে, তাহলে তা লক্ষ্য করার জন্য কেউ এখানে রবেনা।

১৬.২ একটি অতিরিক্ত "সময়ের" মাত্রা—হাইপারটাইম

ভবিষ্যতকে এড়াতে চাইলে অথবা অতীতকে পুনরায় সাজাতে হলে আপনার দরকার পড়বে সময়ের একটি অতিরিক্ত মাত্রা। আজকে মনে করা হয়, স্পেসের ১০টি মাত্রা বিদ্যমান যার ৭টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, তাই এদের দেখা যায় না।

এতদিন মনে করা হত সময়ের একটি মাত্র মাত্রা বিদ্যমান। এর বেশি থাকলে অনেক সমস্যা হত। হার্ভাডের পদার্থবিজ্ঞানী কামরুন ভাফা তা মনে করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গণিতের বাইরে কোথায় লুকিয়ে আছে সময়ের সেই অতিরিক্ত মাত্রাগুলি? অতীত, ভবিষ্যত, কার্য-কারণ এসব ধারণা-গুলিতে এর কি প্রভাব পড়বে? এডওয়ার্ড ভীটনের ১১তম মাত্রা (এম-স্ট্রিং থিয়োরী) এর পর ভাকা তার ১২তম মাত্রা নিয়ে "এফ-থিয়োরী" ঘোষণা করেছেন। এখানে সময়ের মাত্রা ২টি।

একটি সরলরেখার মত একমুখী সময় প্রবাহের প্রতিটি বিন্দু হচ্ছে বর্তমান অস্তিত্ব মুহূর্ত। একটি বিন্দু আরেকটি বিন্দুর পেছনে হলে তা হয় অতীত, আর সামনে থাকলে তা হয় তার ভবিষ্যত। প্রতিটি ঘটনা প্রতিবিন্দুতে একবার মাত্র সংঘটিত হয়। এখন আরেকটি মাত্রা যোগ করলে তখন কিছু অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা হয়। আরেকটি মাত্রা যোগ করলে পর লাইনটি (সরল রেখাটি) একটি সমতলে পরিণত হবে।

এখন কোথায় ভবিষ্যত আর কোথায় অতীত? কার্যফল কোথায় যাবে যখন 'কারণ'-ই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঘটনাকে কিভাবে সংযুক্ত করবেন? তাছাড়া সমীকরণে "সময়" প্রবেশ করালে পর তা একটি ঋণাত্মক চিহ্নের রূপ নেয়। যেমন বস্তু আলোর চাইতে দ্রুতগতিতে ঘুরে, নেগেটিভ এনার্জী হয় ফোটনের, সব সম্ভাব্য ঘটনাবলীর যোগফল ১ হয় না কোনমতেই।

ভাফার সমীকরণ থেকে এ মুহূর্তে সময়ের অতিরিক্ত মাত্রাটি চেতনায় প্রবেশ করছেনা। এতে সময় 'অসাধারণ সময়' এ অবতীর্ণ হয়। আশা করা যাচ্ছে একবিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতে কম্পিউটারের ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জগতে প্রথমে এটির সমাধান হবে কোয়ার্কের বাস্তব অস্তিত্বের মত। তারপর মানব চৈতন্যে তা নাড়া দেবে এবং বেরিয়ে আসবে স্বরূপে। তখন আমরা সময়কে অন্য চোখে দেখবো। বেহেস্তে "সময়ত" বইবেনা। স্থির থাকবে চিরকাল। কোরআনেত এমন কথাই বলে রেখেছে অনেক আগে থেকেই।

স্থানের ৭টি গুটানো মাত্রার ভেতরে সময়ের অতিরিক্ত মাত্রাটি লুকায়িত আছে। বের হবে সময়ে। স্থানের ৩টি মাত্রা থাকাতে আমরা যে কোনো দিকে সরে যেতে পারি কোনো আঘাত, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে। সময়ের ২টি মাত্রা থাকলে আমরা পাশে সরে বা উলম্বভাবে অপসারিত হতে পারতাম বিপদের মুহূর্তটি থেকে। কিছু পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন কৃষ্ণ-বিহ্বরের কেন্দ্রে এমনটি ঘটতে পারে। অথবা অসংখ্য মহাবিশ্বের কোনো কোনটিতে তার নিজস্ব স্থানকাল অনেক মাত্রায় চালু থাকতে পারে। শেষমেষ বলতে হয় 'সত্য কল্পনার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক'।

১৬.৩ : বিমূর্ত্ত বিশৃঙ্খলার গণনা হল শুরু

টাইম-সিগনাল জগতকে চালায় ধাপে ধাপে। এখন এতে একটু খামছি (tweak) লাগাও, দেখবে জীবন একেবারে থেমে গেছে। অর্থাৎ ঠিক দম দেয়া ঘড়ির মত। স্প্রিং একটু বাড়ালে কমালে হঠাৎ ঘড়িটিই বন্ধ হয়ে যায়। পারমাণবিক ঘড়ির সময় দিয়ে গঠিত ইউনিভার্সাল কোর্ডিনেটেড টাইম এর কেন্দ্রস্থলে যদি সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে বলে 'সময় হচ্ছে মানবজাতির উৎপন্ন বস্তু বা ধারণা বিশেষ। যত সুক্ষ্মভাবে সময় আমরা নির্ধারণ করেছি ততই এর ক্রতদাস হয়ে পড়েছি। তাই সময়াসক্তি থেকে বাচার জন্য চাই ঘড়ির ধ্বংস। সব ঘড়ি ধ্বংস করে দাও।'

সময়ের কাটা একটু নেড়ে দিলেই কারেন্ট সাপ্লাই, তথ্যপ্রবাহ তারপরে কলকারখানায় উৎপাদন থেমে যাবে। যানবাহন দাড়িয়ে পড়বে। একটি ব্যবস্থা আরেকটি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়াতে মানব সভ্যতার এই দূরবস্থা ঘটবে। ইউরোপ এবং আমেরিকা, জাপানে সব ব্যবস্থাই অতি সূক্ষ্ম সময়ে পরিচালিত হয়। তাই দেখা গেছে কোথাও একটু গণ্ডগোল দেখা দিলে সর্বত্র একটা ক্যাওয়াসের সৃষ্টি হয়। (দ্রষ্টব্য : নিউ সাইনটিস্ট, ১ নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪২-৪৫) ঘড়ি বন্ধ হলে পর সভ্যতাই বন্ধ হয়ে যায়। সব কিছু দাড়িয়ে পড়ে, ওলটপালট হয়ে যায়, তারপর ভাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

১৬.৪ একটি পরমাণুর পিট-পিটানী সৃষ্টি

১৯৬৭ সনে সময় এর সেকেন্ডকে মাপা হল এভাবে। সিজিয়াম পদার্থের কেন্দ্রীন ও ইলেক্ট্রনের ২টি স্পিন (চক্রন) এর লম্ফের কলে উদ্ভুত হাইফারফাইন ট্রানজিসানই হচ্ছে সেকেন্ড। এর রোসোন্যানট পৌনঃপুণিকতা হচ্ছে ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ দোলন (মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের)। অর্থাৎ ১ সেকেন্ডে এতবার এটি স্পন্দিত হয় বা দোলে। আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী দ্রুতগতিতে চলা বস্তুর সেকেন্ড লম্বা হয় স্থিতাবস্থার সেকেন্ডের চাইতে।

www.pathagar.com

বর্তমানে এমন সুক্ষ্ম গণনার কথা বলা হচ্ছে যে যাতে মিলিয়ন বিলিয়ন দোলন প্রতি সেকেন্ডে মাপা যায় ($১০^{-১৭}$)। এতে প্রতি ১০০০ কোটি বছরে ১ সেকেন্ডের হের ফের হতে পারে মাত্র। ১ মিটার দৈর্ঘ্য আজকাল মাপা হয় সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তাই সেকেন্ডকে যত শূন্যস্থানে আলো কর্তৃক অতিক্রান্ত পথ দ্বারা। সুক্ষ্মভাবে মাপা যাবে, মিটারের দৈর্ঘ্য মাপাও তত সুক্ষ্ম হবে।

১৬.৫ সময় নিয়ে মনের খেলা : যখন একটি সেকেন্ড চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়

কিছু মানসিক রোগীর কাছে সময় এর অস্তিত্ব অর্থহীন। সময় এদের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। কারো মস্তিষ্কে আঘাত লাগলেও এমনটি হতে দেখা যায়। পরে তাদের কেউ আরোগ্য লাভ করলেও তারা কিছুই মনে করতে পারে না। সময়ের যোগসূত্রটা হারিয়ে যায়। তাদের কাছে ভালো থাকার শেষ দিনটির পর অতিক্রান্ত রোগাক্রান্ত সময়টির কাল মনে পড়ে না। যারা মরিজুয়ানা, এল এসডি ব্যবহার করেন, সময় তাদের কাছে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দূর্ঘটনা ঘটার আগের মুহূর্তটিকে লোকেরা বলে "সময় দাঁড়িয়েছিল" বা ঘটনা ঘটে খুবই ধীর লয়ে। সময়ের চেতনাকে ধারণ করে মস্তিষ্ক। কিন্তু কিভাবে তা করে?

স্নায়ু বিশারদেরা মনে করেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থিত নিউরোনে ও কোষে ঘড়ির ক্রিয়াকৌশল চালু আছে। অন্যরা মনে করেন স্মৃতি ও দৃষ্টিপটের সতর্কতার ফলেই সময়ের ধারণা জন্মে। কেউ বলেন, মস্তিষ্ক সরাসরিভাবে সময়কে মনিটার করে না। ঘটনার মুহূর্তগুলোর সংখ্যাই সময়ের দৈর্ঘ্য মাপে। কারণ একই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা দেয়। দেখা গেছে বিরক্তবোধ করলে সময়কে দীর্ঘ মনে হয় অথচ মস্তিষ্ক ঠিক বিপরীত সত্যটাই লিপিবদ্ধ করে। বৃদ্ধ বয়সে মনে হবে সময় খুব দ্রুত অতিক্রান্ত হচ্ছে, আর জোয়ান বয়সে সময়কে লম্বা মনে হয় কারণ ভবিষ্যতকালটা সামনে দেখা যায়—হাতছানি দেয়। বিছানায় শায়িত রোগীর কাছেও সময় খুব দীর্ঘকালের বলে মনে হয়। জ্বর হলে পর দেহের অভ্যন্তরস্থ ঘড়ি মনে হয় দ্রুত গণনা করে সময়। আর বাস্তবের ঘড়িতে দেখা যায় সময় খুব আস্তে আস্তে চলছে। খুব গরম ঘরে বসে থাকলে অল্প সময়ও মনে হবে দীর্ঘকাল। কোরআনে বলা আছে—কবরে শায়িত মোমেন ব্যক্তিদের কাছে পরকালের জাগরণ মুহূর্তে মনে হবে তারা মাত্র ১ দিন ১রাত্র ঘুমিয়েছিল বা পৃথিবীতে মাত্র ১ দিন বা ১ ঘন্টা (সবার কাছে আপেক্ষিক মনে হবে পাপপূর্ণের অভিজ্ঞতানুয়ায়ী) অতিবাহিত করেছিল।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন (পরীক্ষান্তে), মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বাড়ালে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত সময়ের হেরফের ঘটে যায় ধারণায়। ব্লক-থিয়োরীর সর্বশেষ ফলাফল হচ্ছে এরূপ : হর্ণ বাজালে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায় চাপের ফলে বা কোন ওষুধ খেলেও মস্তিষ্ক সঠিকভাবে সময়কে রেকর্ড করতে পারে না। যেমন : হ্যালোপেরিডল, মিথ্যামপফেটামাইন, মারিজুয়ানা, ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থিত সময় মাপার স্থানটি সনাক্ত করেছেন। এটি হল সিরিব্রাল গোলকের ধূসর ভরের নার্ভকোষ যা ব্যাসাল গ্যাঙ্গলিয়াতে অবস্থিত। এটি

www.pathagar.com

মস্তিষ্কের কোর্টেক্সের সঙ্গে নাভসার্কিটি দ্বারা যুক্ত। নার্ভ-সার্কিটটি লুপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। এটি তথ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি মস্তিষ্ক প্রবেশ করার পরই কেবল সময় সম্পর্কে সচেতন হয় মস্তিষ্ক।

মনে হয় মস্তিষ্কের ইন্টারন্যাল ক্লক (এটি সিরকাডিয়ান ক্লক থেকে ভিন্ন) যা দৈনন্দিন কর্মতৎপরতায় চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বৃদ্ধ লোকদের বেলায় আস্তে চলে। ফলে জীবনের পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে মনে হয় বৃদ্ধদের কাছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সংবাদবাহক ডোপামাইন উৎপাদনকারী কোষেরা নির্জীব হয়ে পড়ে। তাই ব্যাসাল গ্যাঙ্গলিয়া এবং সাবস্ট্যানসিয়া নিগ্রা এলাকায় অভ্যন্তরীণ ঘড়ির কারখানায় এদের কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মজার সময় না সময়ের মজা

১৭.১ : ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালী

সময়ের দাম আছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আদিম মানুষ যতই সভ্য হয়ে উঠেছে, ততই সময়ের দাম বেড়ে গেছে তার কাছে। সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে নানা আবিষ্কার। না কি নানা আবিষ্কারের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছে সভ্যতা।

ঘটনা যা-ই হোক, সময়ের দাম বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা বুঝতে পারা মাত্রই মানুষ সময় মাপার চেষ্টা করেছে। সময় মাপার প্রথম পদক্ষেপ সূর্য-ঘড়ি। অর্থাৎ, বিভিন্ন সময়ে একটা খাড়া লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে সময় আন্দাজ করতে চেয়েছে মানুষ। এই চেষ্টা হয়েছিল প্রায় ৫০০০ বছর আগে—মিশর, ইউরোপ ও এশিয়ায়। এর পর চিনদেশে আগুন ব্যবহার করা হয়েছিল সময়ের হিসেব কষতে। এ ছাড়া জ্বলন্ত মোমবাতি পুড়ে যাওয়ার সময় থেকেও সময়ের আন্দাজ করতে পারত পুরনো দিনের মানুষ।

এইরকম সূর্য-ঘড়ি, মোমবাতি-ঘড়ি, বালি-ঘড়ি, জল-ঘড়ির পর্ব পেরিয়ে ১৩৬০ সাল নাগাদ তৈরি হল যান্ত্রিক ঘড়ি। ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের প্যারিসের রাজপ্রাসাদের জন্য তৈরি হয়েছিল ঘড়িটা। আজও সচল এই ঘড়ি তৈরি করেছিলেন হেনরি দ্য ভিক। ১৫০০ সাল নাগাদ এক জার্মান তরুণ পিটার হেনলাইন ঘড়িতে স্প্রিং এর ব্যবহার চালু করেন। আর ১৫৮৩ সালে ইতালির বিজ্ঞানী গালিলেও গ্যালিলাই আবিষ্কার করেন পেন্ডুলামের তত্ত্ব—যা থেকে পরে পাওয়া গেছে পেন্ডুলাম-ঘড়ি। ১৬৫৭ সালে এটি আবিষ্কার করেছিলেন ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্‌জ।

কিন্তু জাহাজে সঠিক সময় দেওয়ার মতো ঘড়ি তখনও তৈরি হয়নি। সেটা তৈরি হল ১৭১৩ সালে—তৈরি করলেন ইংল্যান্ডের জন হ্যারিসন। জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে বিপর্যস্ত হলেও ওই ঘড়িটা ঠিক সময় দিতে পারত। এর পর ক্রমে-ক্রমে এল বৈদ্যুতিক ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, আর পারমাণবিক ঘড়ি। এখন তো ঘড়ি আমাদের হাতে-হাতে। কিন্তু হাতঘড়ি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন? ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন ১৮০৯ সালে ব্রেসলেটে বসানো একটি ঘড়ি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং, ইতিহাসে তিনিই প্রথম হাতঘড়ির মালিক।

ঘড়ি নিয়ে এত কথা বলার পর এবারের ধাঁধা দেওয়া যাক সময় ও ঘড়ি নিয়ে।

www.pathagar.com

মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটায় যখন আড়ি

মিনিটের কাঁটা যে-সময়ে পুরো এক পাক ঘুরে যায়, ঘণ্টার সেই সময়ে যায় এক পাকের ১২ ভাগের এক ভাগ। যদি কাঁটা দুটো বাঁকা পথে না ঘুরে সোজা পথে দৌড়ত, তা হলে মিনিটের কাঁটা খরগোশের মতো ছুট লাগাত, আর ঘণ্টার কাঁটা কচ্ছপের মতো পড়ে থাকত পিছনে। কিন্তু ঘড়ির ডায়ালে বৃত্তাকার পথে ঘোরে বলেই বারবার ওদের দেখা হয়। আবার কখনও-কখনও ওরা আড়ি করে পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়ে থাকে একই সরললেখায়। যেমন—ঠিক ছ'টার সময় এই ঘটনা ঘটে। আবার কোন-কোন সময়ে ঘড়ির কাঁটা দুটো এইরকম বিপরীতমুখী হয়ে একই সরলরেখায় থাকবে?

জ্যাক লন্ডনের অভিযানের গল্প

আমেরিকার সাহিত্যিক জ্যাক লন্ডনের জীবনে জড়িয়ে ছিল দুরন্ত সব অভিযান। ১৮৯৬ সালে আলাস্কার ক্লন্ডাইক অঞ্চলে সোনার খোঁজ পাওয়া যায়। তখন সোনার খোঁজে আলাস্কার দুরন্ত শীত উপেক্ষা করে অনেক মানুষ রওনা হয়ে পড়েছিল সোনার সন্ধানে। জ্যাক লন্ডনও ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন এই অভিযানে। সোনা তিনি পাননি বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রোমাঞ্চকর অভিযানের বিরল সব অভিজ্ঞতা।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে জ্যাক লন্ডন এক জায়গায় লিখেছেন, স্লেজ-টানা দুটো হাস্কি মাঝপথে পালিয়ে যাওয়ায় কীভাবে একটি ক্যাম্পে পৌঁছতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল।

লন্ডন রওনা হয়েছিলেন আলাস্কার স্ক্যাগওয়ে থেকে। তাঁর স্লেজ টানছিল পাঁচটি হাস্কি। তিনি বেশ কিছু দূরের একটি ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছিলেন, কারণ সেখানে তাঁর এক বন্ধু তখন মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে কুকুরগুলো পুরোদমে স্লেজ টানল। তারপর দুটো কুকুর হঠাৎই পালিয়ে গিয়ে মিশে গেল নেকড়ের পালের সঙ্গে।

সুতরাং কুকুরের সংখ্যার আনুপাতিক হারে কমে গেল তাঁর স্লেজের গতি। ফলে লন্ডন সেই ক্যাম্পে পৌঁছলেন হিসেবের চেয়ে ৪৮ ঘণ্টা দেরিতে। পালিয়ে যাওয়া হাস্কি দুটো যদি আরও ৫০ মাইল স্লেজের সঙ্গে থাকত, তা হলে লন্ডনের দেরি হত ২৪ ঘন্টা।

জ্যাক লন্ডন তো লিখেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এসব তথ্য থেকে কি বের করা যায়, স্ক্যাগওয়ে থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব কত?

১৭.২ : স্বাস্থ্যক্ষয় সময় বিচার

গবেষকরা ইদানীং লক্ষ্য করেছেন রোগ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে আমরা কি করছি কেবল তাই শেষ কথা নয়। কখন তা করছি এও গুরুত্বপূর্ণ। দেহছন্দ নিয়ে এই চর্চা, এই বিজ্ঞান থেকে জন্ম নিয়েছে ক্রোনোবায়োলজি নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা। হয়তো কম কিছু লোকে এ নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু ভাবনার শুরু যে হয়েছে এও কম কথা নয়।

দেহের ছন্দপতন সুখ-অসুখের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে, বেচাল হলে সুখ থেকে অসুখে আমরা চলে যাই, এও জানা গেলো। এই বিজ্ঞানটা থেকে নতুন কৌশল

www.pathagar.com

বেরিয়েছে। সুস্থ থাকার নব কৌশল। সময়মতো কাজ করলে, দিনের কর্মসূচি ঠিকমতো করলে, কার্য উদ্ধারও যেমন হয়, তেমনি স্বাস্থ্য ও ভালো থাকে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এরকম কিছু কাজ, অসুখ, চিকিৎসা সময় নির্ঘন্ট নিয়ে কিছু কথা বলি এবার।

হার্টএটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কখন বেশি

বিজ্ঞানীরা বলেন, সকাল ৬টা থেকে দুপুর পর্যন্ত। ঝুঁকি কম সন্ধ্যা ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠার পর রক্তচাপ বাড়ার হার দ্রুত, রক্ত জমাট বাধার হারও তখন বেশি, এজন্য দিনের প্রথম ভাগে এসব রোগের ঝুঁকি বেশি।

তখন দ্রুত হাঁটা, শরীরচর্চা, ব্যায়াম তাই বয়স্কদের জন্য সকালের চেয়ে শেষ বিকেল বা সন্ধ্যায় করা ভালো।

হাঁপানির আক্রমন

শেষ রাত ৪টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বেশি হয়। কম হয় বিকেল ৪টা-৬টার মধ্যে। বিকেলের দিকে বায়ুপথগুলো উদার উন্মুক্ত থাকে। শরীরে ধীরে ধীরে উৎসারিত হয়। দিনে একবার সেব্য হাঁপানির ওষুধ সন্ধ্যায় খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ট্যাক্সি দুর্ঘটনা

৩০ বছরের অনুর্ধ্ব ড্রাইভাররা বেশি করে রাত ২টার দিকে। বয়স্ক ড্রাইভার বেশি দুর্ঘটনা করে দুপুর ২টা থেকে ৪টার মধ্যে। দেখা যায় বিভিন্ন বয়সের ড্রাইভার বিভিন্ন সময় হুইলের উপর ঝিমিয়ে পড়েন।

মেডিকেল চেকআপ

সকালের ভালো। দিনের শেষে এতো প্রশস্ত নয় কালক্ষণ। দিনমান চাপ বাড়ে, জমতে থাকে চাপ, রক্ত চাপ ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল একটু বেচাল হয়ে যায়।

ঠাণ্ডা সর্দির ওষুধ

রাতে নেবেন এন্টিহিস্টামিন ওষুধ। নাকের ড্রপ সকালে। নাকের ড্রপে আছে উত্তেজক বস্তু, এন্টিহিস্টামিন ওষুধ আমাদের নিদ্রালু করে, এজন্য।

ব্যায়াম কখন করবেন?

শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যার আগে আগে ভালো। সকালে ব্যায়াম ততো সুসময় নয়। সকালের ব্যায়ামে অনেকের হার্ট এটাকের সূচনা হতে পারে। সকাল বেলা যে পরিমাণ ক্যালরি পুড়ে এতে হৃদপিণ্ড ও রক্তনালীতে হিতকর প্রভাব আসে কমই।

www.pathagar.com

(মেয়েদের জন্য) ক্যান্সার সার্জারি

শেষ রজঃক্ষরণের প্রথম দিন থেকে গুণে ১৩-২১ দিনের মাথায় সার্জারি করলে ভালো। রজঃক্ষরণের কাছাকাছি সময় এ সার্জারি করা ততো ভালো হবে না।

ঋতুচক্রের কালে ডিম্বস্ফোটনের কাছাকাছি সময় (Ovulation) অথবা এর পরে সার্জারি করলে সাফল্যের হার বেশি, পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনাও কমে যায়।

১৭.৩ দিনের কোন সময়ে আপনি কি করবেন

মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি একটি বায়োলজিক্যাল ইউনিট। তাই দিন রাত্রি সব সময় একরকম কার্যক্ষম থাকতে পারে না। বিশেষ সময় বিশেষ ধরনের ক্ষমতায় সে প্রভাবিত হয়। এখানেই মানুষের সঙ্গে মেশিনের তফাৎ। মেশিনের সুইচ টিপলেই সে তার পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ শুরু করে। আমরা এই নিবন্ধে আপনাদের জন্য এমন একটি গাইড লাইন তুলে ধরছি যা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন দিন রাত্রির কোন সময়টা আপনি সবচেয়ে ভাল অনুভব করবেন, ভাল কাজ করবেন এবং ভাল চিন্তা করবেন।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমাদের দেশে শীতকালে আমরা মনে যেমন ফূর্তি পাই, যেমন ফুরফুরে চাঙা অনুভব করি, গরমের দিনে কিন্তু তেমনটি পাই না। গ্রীষ্মে আমাদের শরীরে শিথিলতা আসে, কাজ করায় উৎসাহের ভাটা পড়ে। এই কারণে সম্ভবত অফিস আদালতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে কর্মীরা তাদের পুরো দক্ষতায় কাজ করে যেতে পারেন।

সমস্ত চেতন পদার্থের মধ্যেই একটি 'বায়োলজিক্যাল ছন্দ' বিদ্যমান। এদের মধ্যে কিছু ছন্দ স্বল্পকালীন মিনিট বা ঘন্টার ভেতর সীমাবদ্ধ। আবার কিছু ছন্দ সুদীর্ঘ সময়ের- কয়েক দিন বা মাস নিয়ে বিস্তৃত। প্রত্যেকের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় সন্ধ্যাবেলায়। এও এক ধরনের ছন্দ। মেয়েদের পিরিয়ড অথবা ঋতুস্রাব একটি মাসিক ছন্দ। নারী পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ গরমে যত বেশি থাকে, শীতে কিন্তু ততটা থাকে না—এটি বাৎসরিক ছন্দ।

বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন একটি বিশেষ ওষুধ দিনের একটি বিশেষ সময় যেমন উপকারে আসে, অন্য সময় তা আসে না। একজন ক্যানসার রোগীকেও দেখা গেছে, এক্স-রে অথবা কোন চিকিৎসা কোন একটি বিশেষ সময়ে যেমন উপকার দিচ্ছে, তা সত্যিই অভাবনীয়।

জেনে নিন ক্রোনোবায়োলজী

বিজ্ঞানের এই নতুন উদ্ভাবনকে বলা হয় CHRONO BIOLOGY। পাশ্চাত্যের সব নামীদামী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শরীরের 'ন্যাচারাল রিদম' সম্পর্কে একজনের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে তার কর্ম ও ক্রীড়া দু'টোতেই সে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। দিনের সবচেয়ে আবশ্যিক ছন্দ হলো ঘুম এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার আবর্ত। এ ছাড়াও দিনের অন্যান্য ছন্দ থাকবে। যেমন, শরীরের

www.pathagar.com

তাপমাত্রা, রক্তচাপ, হর্মোন, লেভেল ইত্যাদি। এসব কারণেই আপনি সকাল ৯টার সময় যেমন অনুভব করবেন অবশ্যই তেমন করবেন না। আপনার সামগ্রিক অনুভূতি, কর্মক্ষমতা, সচেতনতা, স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, সঙ্গীতের ভালবাসার প্রতি আগ্রহ সবকিছুই বদলায় দিনের ঘড়ির কাটার সঙ্গে সঙ্গে।

আমাদের সবারই সচেতনা তুঙ্গে থাকে দুপুর বেলা, অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে এটি কমতে থাকে। ঘুমের প্রতি আগ্রহ জাগে অপরাহ্নের পর থেকে। স্মৃতিশক্তিরও হেরফের হয়। সবার ভেতর সকালে এটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে। দিনের অন্যান্য সময়ের চেয়ে স্মৃতিশক্তি প্রায় ১৫% বেশি দক্ষ থাকে এসময়টায়। সুতরাং এখানে ছাত্রদের মনে রাখা প্রয়োজন, সকালের লেখাপড়াই সবচেয়ে বেশি উপকার আসবে। দীর্ঘকালীন মনে রাখার মত কোন লেখাপড়ার উপযুক্ত সময় হলো বিকেল অথবা সন্ধ্যাবেলা।

রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বড় এক্সিকিউটিভ অথবা নাট্যকর্মীরা যারা বক্তৃতা বা সংলাপ মনে রাখতে চান তাদের জন্য বিকেল বেলায় চর্চা করলেই ভাল। ছাত্রীদের কঠিন বিষয়গুলো বিকেল বেলা অধ্যয়নের জন্য রেখে দেওয়াই শ্রেয়। অনেকেই বেশি রাতে লেখাপড়া করেন ভাল ফল পাওয়ার জন্য। এই ধারনাটি সঠিক নয়।

যেসব কাজ হাত দিয়ে সম্পাদন করতে হয় যেমন কাঠের কাজ, টাইপিং অথবা সেলাই, সেগুলোর জন্যও বিকেলই উপযুক্ত সময়।

এখন আসি খেলাধুলায়। এর সঠিক সময় কোনটি? আমরা সবাই কি তা জানি? অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমাদের শরীর ও মন খেলাধুলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। অপরাহ্নে শরীরে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়। এ কারণেই এ সময়ে যেকোন ধরনের কসরত করতে ক্লান্তি কম হয়।

দৌড়বিদ, সাঁতারু, সটপুট নিক্ষেপকারী, নৌকা বাইচকারী এদের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, দিনের অন্যান্য সময়ের চেয়ে তাদের পারফরমেন্স বিকেলে এবং সন্ধ্যায় অনেক ভাল হয়। মূলতঃ আমাদের সব কিছুই যেমন অনুভূতি, স্বাদ, দেখা ও শ্রবণ শক্তি, ছোঁয়া, গন্ধ বিকেল ও সন্ধ্যায় প্রখরতম থাকে। সে কারণেই হয়ত আমাদের কাছে লাঞ্চের চেয়ে ডিনার বেশি তৃপ্তিকর মনে হয়। দিনের আলো রাতের আলোর চেয়ে বেশি মনোহর মনে হয়।

সময়ের আকৃতি আমাদের কাছে ঘন্টা থেকে ঘন্টায় পরিবর্তন হয়। আপনি যখন আনন্দঘন মুহূর্ত কাটান, সময় নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়। কিন্তু কখনো লক্ষ্য করছেন কি, সেই আনন্দঘন মুহূর্ত বিকেলে বা সন্ধ্যায় আগে হলে মনে হয় ঘড়ি আরও তাড়াতাড়ি চলছে। কারণ এ সময় আপনার শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকে।

প্রত্যেক নারী-পুরুষের ভেতর একটি বায়োলজিক্যাল ব্যাপার স্যাপার আছে। ত দিয়েই দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা সবাই কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদের শরীরের ছন্দটি উপলব্ধি করতে পারি।

ছন্দ মাফিক আপনার দিনের কাজের রুটিন তৈরি করুন। তাহলেই দেখবেন আপনি সুস্বাস্থ্য এবং সানন্দ জীবন কাটাচ্ছেন। যীশু বলেছেন-সব ফলনের যেমনি একটি ঋতু থাকে, মর্তেও তেমন সব উদ্দেশ্য সাধনের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।

www.pathagar.com

১৭.৪ : আপনার দেহ-ঘড়ির নানা খবর

যৌন মিলনের সেরা সময় হলো সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত।

ওই সময়ে আপনার হরমোন থাকে উজানে। তথ্যটি প্রকাশ করেছেন সুসান পেরী ও জিম ডসন তাঁদের সম্প্রতি প্রকাশিত 'দ্য সিক্রেটস আওয়ার বডি ক্লকস্ রিভিল' গ্রন্থে।

এই স্বামী ও স্ত্রী জুটি ব্যাপক গবেষণা করেছেন ক্রনোবায়োলজি-এ বিজ্ঞান, বায়োলজিক্যাল রিদম-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমাদের জীবনে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে।

আপনি কি জানেন আপনার দন্ত-চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সেরা সময় কখন?

'আপনার দন্ত-চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সেরা সময় হলো বিকেল বেলা,' পেরী জানান। 'ওই সময়টায় কারো যন্ত্রণার সূত্রপাত থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।'

গবেষকদের তদন্তে প্রাপ্ত আরো কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ :

১. বেশির ভাগ বেদনানাশক ঔষধের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর হয় যদি তা সেবন করা যায় বিকেল বেলায়।

২. সকাল ৭টায় অ্যাসপিরিন খেলে তা অধিক কার্যকরী হয়, কারণ তা দেহে সক্রিয় থাকে ২২ ঘণ্টা। একই ডোজ সন্ধ্যা ৭টায় খেলে তা সক্রিয় থাকে মাত্র ১৭ ঘন্টা।

৩. প্রাথমিক গবেষণা থেকে ইংগিত পাওয়া গেছে, ক্যান্সার-রোগীদের যদি বায়োরিদম অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয় তবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা হবে কম।

৪. বিকেলে ও সন্ধ্যার দিকে হাঁপানির হামলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে কম। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় হলো রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত।

৫. আপনার খিটখিটে মেজাজের শিশু যদি লম্বা লোমঅলা বেড়ালের সঙ্গে খেলার বায়না ধরে তবে তাকে সকাল বেলায় খেলার অনুমতি দিন।

৬. বাথরুমে যাওয়া, ঘুমানো, মনোযোগ- কাল ও আহারের কয়েকটি চক্র চলে ৯০ মিনিট পর-পর।

যাঁরা ডায়েট করছেন তাঁরা লক্ষ্য করুন : প্রতি ৯০ মিনিট পর আপনার খাওয়ার ইচ্ছা বাড়বে, কাজের চাপে থাকলে এই চক্র দ্রুত হয়ে চলবে ৬০ মিনিট পর-পর।

তবে সুখবর হলো : ক্ষুধার এই তীব্রতা পরবর্তী ৯০ মিনিটের চক্রে একেবারেই থাকবে না। কাজেই রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধই রাখুন।

৭. বেশির ভাগ মানুষই সবচেয়ে বেশি ভার বোধ করেন সকাল বেলায়; আর একাগ্র মনোযোগের চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করেন সকাল ১১টার দিকে।

৮. আমাদের সকল ইন্দ্রিয় সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর থাকে বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ওই সময়ে খাবার সবচেয়ে বেশি স্বাদু ও উপাদেয় লাগে, কিন্তু গোলামাল—আর শিশুদের হৈচৈ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে কম।

সবশেষে সন্তানসম্ভবা পাঠিকারা, যাঁরা এই রচনাটি পড়ছেন, তাঁদের প্রতি একটি পরামর্শ : মধ্যরাতে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকুন। রাতের মধ্যভাগে আপনার সন্তান জন্ম নেবে এই সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

www.pathagar.com

পেরী জানান, তাত্ত্বিকরা উল্লেখ করে থাকেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা অন্ধকারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন—তাতে শিশুদের রক্ষা করা সহজ হয়। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রকৃতি কখনো উৎসাহী হয়নি।

মূল্যবান সময়

দিনটি যদি আরো কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ হতো তাহলে ওই সময়গুলো আমরা কাটাতাম কিভাবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২০০ নর-নারী এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাঁদের একাধিক উত্তর দেয়াও সুযোগ ছিল।

পরিবারের সঙ্গে	৫৮%
বিনোদনে	৫৪%
ঘর সাজানো বা গোছানোতে	৪৩%
হবিতে, টিভি দেখে, বই পড়ে	৩৯%
গৃহস্থালী ধোয়ামোছায়	১১%
কেনাকাটায়	১১%
কর্মক্ষেত্রে	৯%
ঘুরে বেড়িয়ে	২%

১৭.৫ দেহ মনের গোপন ঘড়ি

সমস্ত বিশ্ব যেনো আবর্তনের ছন্দে নাচছে। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে, আবহাওয়ার বদল হচ্ছে, ফুল ফুটছে, পাতা ঝরছে, ইলেকট্রন প্রোটন পাক খাচ্ছে। কিন্তু মানুষের শরীর ও মনের কাজকর্মগুলোও কি ছন্দ খুঁজে ফিরছে? উৎফুল্ল বা বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়া, হজমের গোলমাল হওয়া বা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া কি ঘড়ি ধরে ঘটতে পারে? অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর শরীর ও মনের বিভিন্ন অবস্থা কি ঘুরে ফিরে আসে? অনেকে বলবেন, তা কি করে হয়? বংশগত প্রবৃত্তি বা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তো তার শরীর ও মনের গতিবিধি পাল্টাবে! কিন্তু ক্রোনোবায়োলজি বা বায়োমেট্রিকস নামে নতুন এক বিজ্ঞান ফুলে ফেঁপে উঠছে, যার প্রবক্তারা জন্ম বা পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করেন না বটে, তবে তার সঙ্গে একটা নতুন ভাবনা জুড়ে দিয়েছেন। তারা বলতে চান যে, মহিলারা যেমন নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঋতুমতী হন, তেমনি দেহ-মনের অনেক অবস্থাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘুরে ফিরে আসতে চায়। অবশ্য বিভিন্ন কারণে এই সময়ের হেরফের হতে পারে বটে, তবে আবর্তনের প্রবণতা থেকেই যায়। অর্থাৎ কোনো এক অদৃশ্য ঘড়ির কাটার সঙ্গে যেনো বাঁধা আছে দেহ-মনের সূক্ষ্ম সুতো।

শরীর তত্ত্ববিদ ড. জে ডেভি লক্ষ্য করেছিলেন যে তার নিজের দেহের তাপমাত্রা তিন ঘন্টা অন্তর বদলে যাচ্ছে। বিকেল চারপের সময় এই তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াতো ৯৮.৯ ডিগ্রী ফাঃ আর ভোর সাতটায় দাঁড়াতো ৯৭.৬ ডিগ্রী ফাঃ অর্থাৎ প্রায় ১.৩ ডিগ্রির তফাৎ যা কি না স্বাভাবিক নিরোগ শরীরের তাপমাত্রা। শুধু ডেভি সাহেবের নয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হবে, যদি হাতের কাছে একটা সূক্ষ্ম তাপমাপক যন্ত্র থাকে।

www.pathagar.com

একালে প্রাতরাশ এসে দাঁড়িয়েছে অল্প কিছু জলযোগে আর পেট ঠেসে ভোজন করা হয় দুপুরের দিকে বা মাঝরাতের কিছু আগে। কিন্তু কেউই খোঁজ রাখেন না যে, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে ভালোভাবে শরীর গ্রহণ করবে যদি ঘুম থেকে ওঠার একটু পরে বেশি খাবার খেয়ে নেয়া যায়। অথচ রাতে বিয়ে বাড়িতে যখন আমরা কব্জি ডুবিয়ে খাই তখন পরিপাকঘটিত সমস্ত যন্ত্রগুলো চলে নিস্তেজ হয়ে। মদের বেলাতেও একই কথা। সাত সকালে মদ খাওয়া যতই অবাক লাগুক, রাতের চেয়ে তা কিছুটা ভালো। কেননা, অ্যালকোহল বিশ্লিষ্ট করার শক্তি অনেক বেশি থাকে ভোরবেলা। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফ্রানজ হলবার্গ দু'দলের ইঁদুরকে ভদ্‌কা খাইয়ে দেখিয়েছেন যে ভোরে মাতাল ইঁদুরগুলোর বাঁচার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ আর রাতে মাতাল ইঁদুরগুলোর মাত্র ১২ শতাংশ। আবার রক্তে অ্যালকোহলের স্থায়িত্ব মদের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, কোন কোন সময়ে সামান্য একটু খেলেই বেড়ে যেতে পারে। একদল লোককে প্রতি ঘন্টার নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল খাইয়ে দেখা গেছে যে সকাল ১০টায় এর স্থায়িত্ব খুব কমে আসে। তাই সকাল ১০টায় মদ খেলে একটুতেই মাতাল হবার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান ইনস্টিটিউট অফ ফ্লাইট মেডিসিনের ড. কে ই ক্লেইন এই বিজ্ঞানকে টেনে এনেছেন অফিস-কাচারিতে। ২৪ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন পেশার কর্মীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে উনি লক্ষ্য করেছেন যে কর্মীরা সবচেয়ে বেশি কর্মঠ থাকে দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে। কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয় দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে। আর সবচেয়ে কম হয় রাত দুটো থেকে চারটের মধ্যে। আবার রাত তিনটের সময় তারা অক্সিজেনের অভাব যতটা সহ্য করতে পারে, বিকেল তিনটের সময় এই সহ্য ক্ষমতা কমে যায় তার চেয়ে অনেক বেশি। যারা টেলিপ্রিন্টারে কাজ করে তারা কলের প্রত্যুত্তর দিতে বেশি সময় নেয় ভোর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে, আর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় দুপুরের শেষ দিকে। একটা গ্যাস কোম্পানিতে তিনজন মিটার-রিডারের ওপর নজর রাখা হয়েছিলো কয়েক বছর ধরে। ভোর তিনটের সময় তারা যত ভুল করেছিলো, অন্য কোন সময়ে তার অর্ধেক ভুল ও করেনি।

আজ জেট বিমানের যুগে শরীরের ভেতরকার এই গোপন ঘড়ির গুরুত্ব খুব বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে। গ্রিনউইচ মিন টাইম (জিএমটি) অনুযায়ী দুপুর ১২টায় লণ্ডন থেকে যাত্রা করলেন এক ভদ্রলোক। তিনি যখন সানফ্রানসিসকো পৌঁছলেন তখন জিএমটি প্রায় রাত ১২টা। ফলে ঘন্টা অনুযায়ী তাঁর ঘুম পাবার কথা। কিন্তু সানফ্রানসিসকোর ঘড়িগুলো চলে প্যাসিফিক টাইম অনুযায়ী, যা জিএমটির চেয়ে আট ঘন্টা পেছনে। অর্থাৎ সানফ্রানসিসকোতে তখন বিকেল ৪টা, অফিস কাচারীতে চলছে পুরোপুরি ব্যস্ততা। আবার সানফ্রানসিসকোতে রাত ২টার সময় ভদ্রলোকের শরীরের অবস্থা হবে সকাল ১০টার মতো।

জার্মান ইনস্টিটিউট অফ ফ্লাইট মেডিসিন এবং আমেরিকান ফেডারাল এভিয়েশন অথরিটি এ নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। দেখা গেছে এ রকম ঝটিকা সফরে দেহের তাপমাত্রা ও হৃদস্পন্দনের বেগ অনেকটা এদিক ওদিক হয়ে পড়ে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে অন্তত ৪দিন সময় লাগে। শুধু তাই নয়, প্রতিক্রিয়ার সময়েও খুব

www.pathagar.com

হেরফের ঘটে আর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। মহিলাদের ঋতুঘটিত ব্যাপারেও খুব বেশি উৎপাত শুরু হয়ে যায়। ফলে, জেট বিমানের চালক, সেবিকা ও অন্য কর্মী তো বটেই, নিয়মিত যাত্রীদের ক্ষেত্রেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শরীরের ওপর পড়েই।

যারা কল-কারখানায় শিফটে কাজ করে তাদের শরীরের এই প্রকৃতিদত্ত ঘড়িটার সঙ্গে বারবার তাল পরিবর্তন করতে হয়। এর জন্যে যদি কিছু বিপত্তি হয় তা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় না। কিন্তু শিল্প বিজ্ঞানী তো গেয়ারলসে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আলসার ও হাইপোরটেনশন হচ্ছে শিফটে কাজ করার সম্ভাব্য পরিণতি। তাছাড়া বৃটেনে ৪৩৯ জন শিফট কর্মীদের ওপর যে পরীক্ষা চালিয়েছিল প্রাইসেস অ্যাণ্ড ইনকামস বোর্ড নামক সংস্থা তাতে দেখা গেছে যে এ ধরনের কর্মীদের বিমর্ষতা, অস্বাভাবিক যৌনাবেগ ও পেটের গণ্ডগোলে ভোগার সম্ভাবনা খুব বেশি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, সকলের শরীরের ঘড়ি এরকম নয়, অর্থাৎ কোন ঘটনায় বা আবর্তনের সময় সকলের ক্ষেত্রে এক নাও হতে পারে। কিছু লোকের জৈবঘড়ি এমন যে তারা নিশাচর হতেই ভালোবাসে, রাতে অনেকক্ষণ জেগে কাজকর্ম করতে পারে। আবার কিছুলোক ঠিক উল্টো, ভোরে কাক ডাকার আগে উঠে না পড়লে তাদের অস্বস্তি হয়। অনেকে বলবেন ব্যাপারটা নিছক অভ্যাসের দৌলতে। কিন্তু ক্রোনোবায়োলজিস্টরা বলছেন যে, অভ্যাসে কিছুটা হলেও আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক সংস্থার উচিত আবর্তনের ভিত্তিতে কর্মীদের একটা তালিকা তৈরি করে রাখা। এই তালিকা অনুযায়ী শিফট ঠিক করলে কাজের গতি ও নিপুণতাও বাড়বে, অনেক মানসিক সংঘর্ষও কমবে। এই কারণে বৃটেন ও আমেরিকার বিমান কোম্পানিগুলো কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করেছে, যাতে ঠিক করা আছে কোথায় কতক্ষণ বিশ্রাম নেবে। জেট বিমানের এই ঘড়ি ঘটিত বিপত্তির নাম দেয়া হয়েছে 'জেট-ল্যাগ' যা নিয়ে এখনি চিন্তাভাবনা না করলে এই শতাব্দী শেষ না হতেই একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

প্রত্যেকের শরীরে তার নিজস্ব ঘড়িটার দম দেয়া শুরু হয় জন্মের সময় থেকেই। ফলে কয়েকজন শিশুর সকালে পড়াশুনায় মন বসে না কিন্তু রাতে তারা পড়াশুনা ভালোই করে, আবার কিছু শিশুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটে যায়। এই আবর্তন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে অভিভাবকরা পড়াতে গিয়ে বিরক্তির শিকার হবেন এবং বকুনি ও প্রহারে শিশু যাবে বিগড়ে। শুধু বাড়িতেই নয়, স্কুলেও দেখা যায় এক একজন ছাত্র একটা বিশেষ সময় অন্তর ক্লাশে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অথচ সেই ছাত্রগুলো হয়তো সত্যিই পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের দোষ না দিয়ে তাদের গোপন ঘড়িটাকে দোষ দেয়া উচিত আর শিক্ষকদের উচিত সেই অনুযায়ী ছাত্রদের ওপর নজর রাখা।

এই ঘড়ির প্রভাব চিকিৎসা শাস্ত্রেও পড়েছে। অনেক আগেই ধরা পড়েছে যে, দিনের চেয়ে রাতে রাতে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি শিশু জন্মায়; বিশেষত রাত তিনটা থেকে চারটার মধ্যে জন্মহার সারা পৃথিবীতেই খুব বেশি আর দুপুর একটা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে

www.pathagar.com

জন্মের প্রবণতা খুব কম। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, ভোর ছ'টার কাছাকাছি হৃদযন্ত্র সবচেয়ে কম কার্যকর হয়ে পড়ে। বহুদিনের ব্রংকাইটিস, স্ট্রোক, রক্তক্ষরণ ও হাঁপানির চিকিৎসায় এই তথ্যটি মনে রাখা হচ্ছে। তেমনি মূর্ছারোগের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ভোর ৬টা থেকে ৭টার আর রাত ১০টার থেকে ১২ টার মধ্যে। বিকেল ৫টা থেকে ৮টার মধ্যে মূর্ছা যাবার সম্ভাবনা থাকে কম। বিমর্ষতা রোগ, সাইকোটিসম, সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগগুলোর বাড়া-কমার মধ্যেও একটা আশ্চর্য আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, বিশেষ ধরনের ভাইরাসঘটিত অসুখের প্রতিরোধ ক্ষমতাও নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ে বা কমে।

এই কারণে কোনো ওষুধ কার শরীরে কেমন কাজ করবে তা অনেকটা নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগের সময়ের ওপর। অ্যাসপিরিন যদি সকাল সাতটার সময় দেয়া হয় তাহলে তার ক্রিয়া চলে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত অর্থাৎ ২২ ঘন্টা। অথচ রাত ৭টার সময় থেকে একই পরিমাণ অ্যাসপিরিনের কাজ চলে মাত্র ১৭ ঘন্টা। ডায়াবেটিস রুগীর ওপর ইনসুলিন ইনজেকসনের ক্রিয়ারও বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে দিনের বিভিন্ন সময়ে। আবার ঘুমের বড়ি রাত ১১টার সময় খেলে তার প্রতিক্রিয়া চলে মাত্র ৪ ঘন্টা কিন্তু ভোর ৪টার সময় খেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি সময় ঘরে তার কাজ চলবে আর অবশ করে দেবার প্রবণতাও বাড়বে দ্বিগুণ। তাছাড়া টিকাম সংজ্ঞাহীনকারক ওষুধ ও ট্রানকুইলাইজারের ক্রিয়াও ঘড়ি ধরে বাড়ে কমে।

ঘড়ির প্রতি শরীর ও মনের এই আনুগত্য দেখে বায়োমেট্রিকসের একটা মজার ফর্মুলা খাড়া করা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে PSI, Physical, Sensitivity ও Intellectual-এই তিনটে শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছে PSI। মানুষের দেহে-মনে ছোটোখাটো সব ধরনের আবর্তন সনাক্ত করা মুশকিল। তার চেয়ে তিনটে প্রধান আবর্তন লক্ষ্য করলেই যথেষ্ট : পদার্থগত (P), সংবেদনগত (S) ও বুদ্ধিগত (I)। এগুলোর প্রত্যেকটাই নির্দিষ্ট কয়েক দিন অন্তর তেজী হয়ে ওঠে বা মন্দীভূত হয়। এই সময়ের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে, অর্থাৎ যখন তেজী ও মন্দার মাঝামাঝি বলা হয় ক্রিটিক্যাল বা সমস্যাসঙ্কুল। ধরা যাক, কোনো লোকের বুদ্ধিগত আবর্তনের সময় ২৪ দিন এবং তা সবচেয়ে তেজী পর্যায়ে উঠলো কোনো এক পয়লা জানুয়ারি। তাহলে ১২ দিন পর (১৩ জানুয়ারি) তা মন্দীভূত হবে ও আরো ১২ দিন পর (২৫ জানুয়ারি) আবার সর্বাপেক্ষা তেজী হবে। কিন্তু ১ জানুয়ারির পর ৬দিন বাদে তেজী ও মন্দার মাঝামাঝি পথে এসে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি হবে মধ্যবিন্দু।

এইভাবে পদার্থগত ও সংবেদনগত আবর্তনের সময় জানা গেলে হিসেব করা যাবে যে, সারাবছরে কোন্ তারিখগুলোর কাছাকাছি এই দুটি আবর্তনের মধ্যবিন্দু পড়বে। অন্যান্য বেশিরভাগ তারিখেই দেখা যাবে যে ৩টি আবর্তনের কোনো একটি বা দুটি তেজীর দিকে আর অপর দুটি বা একটি মন্দার দিকে। কোনো কোনো তারিখে তিনটেই তেজী বা মন্দার কাছাকাছি। এই হিসেবে তিনটে আবর্তনকে মিলিয়ে দেখা গেছে যে মানুষের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে তখনই যখন তিনটির কোনোটাই খুব তেজী বা মন্দা থাকে না, অর্থাৎ সেই

www.pathagar.com

মধ্যবিন্দুর তারিখগুলোতে। তবে বিশেষ ধরনের দুর্ঘটনার ব্যাপারে বিশেষ একটি আবর্তন দায়ী হতে পারে।

যেমন, টোকিওতে দেখা গেছে যে শহরের ট্যাক্সিচালকরা দুর্ঘটনায় পড়ে, যখন তারা পদার্থগত মধ্যবিন্দুর দিনগুলোতে গাড়ি চালায়। কিন্তু বুদ্ধিগত মধ্যবিন্দুর দিনগুলোতে দূর পাল্লার লরিচালকরা দুর্ঘটনায় পড়েন। তাই জাপান বায়োরিদম লেবরোটরির প্রফেসর তাই উপদেশ দিয়েছেন—যে তারিখগুলোতে কারো পদার্থগত ও বুদ্ধিগত দুটোরই মধ্যবিন্দু কাছাকাছি পড়ে, সেইসব তারিখগুলোতে তার পক্ষে গাড়ি না বের করাই মঙ্গল।

তত্ত্বটা প্রমাণ করার জন্য দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে এমন লোকদের আবর্তনের চার্ট খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। তোয়া তোমেসটিক এয়ারওয়েজের একটি বিমান ২৪১ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল ১৯৭১-এর জুলাই মাসে। পাইলটের বুদ্ধিগত মধ্যবিন্দু পড়েছিল ঐ দুর্ঘটনার দিনে। একটি পি-২-ভি ৭ বিমান যখন দুর্ঘটনায় পড়লো তখন তার পাইলটেরও দেখা গেল বুদ্ধিগত মধ্যবিন্দু। বৃটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজের একটি বিমান হিথরো বিমান বন্দর থেকে ছাড়বার পর ১১৮ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল। বিমানের ক্যাপ্টেন স্ট্যনলি কী'র বুদ্ধিগত মধ্যবিন্দু ছিল এ দিনে, ১৯৭১ সালের ১৮ জুন।

বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রিনহোল্ড বোচাউ ৪৯৭টি মোটর দুর্ঘটনার বিবরণ যোগাড় করেছিলেন, যেগুলোর সবকটাই ঘটেছিল চালকের দোষে। তারপর তাদের আবর্তনের সময় মিলিয়ে দেখতে পেলেন যে, চালকদের এক বা একাধিক আবর্তনের মধ্যবিন্দু ছিলো দুর্ঘটনার দিনে। আর এক বিজ্ঞানী অটো টোন্ সমীক্ষা করে দেখেছেন যে হ্যানোভার শহরে অন্তত ৮৩ শতাংশ মোটর দুর্ঘটনার সঙ্গে আবর্তনের মধ্যবিন্দু জড়িয়ে আছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করার মতো পরীক্ষা চালিয়েছেন জুরিখের প্রফেসর এইচ এল লী রয়। দি সুইস অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন নামক সংস্থা তাকে ২৪৫৯টি মোটর দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং মোটর চালকের জীবনপঞ্জী পাঠিয়েছিল। সেসব বিচার করে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আবর্তনের মধ্যবিন্দুর সঙ্গে দুর্ঘটনার সম্পর্ক বেশ নিবিড়—অন্তত রাশিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বলতে গেলে বিচারে তুল হবার সম্ভাবনা.০৪ অর্থাৎ দশ হাজারের ভেতর ৪টি।

এই কারণে বায়োরিদমের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। জাপানের ইয়াকোহোমা কিটা টেলিগ্রাফ নামক সংস্থায় ও টেলিফোন অফিসগুলোতে আদেশ দেয়া হয়েছে যে ওইসব সংস্থার মোটরগাড়ি ও ভারী মেশিন চালকদের যে তারিখে একটা আবর্তনের মধ্যবিন্দু পড়বে তারা হলদে ব্যাজ লাগাবে আর যে তারিখে দুটো আবর্তনের মধ্যবিন্দু পড়বে সেদিন তারা লাল ব্যাজ ধারণ করবে। সুপারভাইজারদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে এইসব দিনগুলোতে ঐসব কর্মীদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে। এর ফলে দেখা গেছে যে ঐসব সংস্থায় দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় এক চতুর্থাংশে নেমে এসেছে।

শুধু সতর্কতা হিসেবেই নয়, কাজের দক্ষতা ও উৎপাদন বাড়াতেও কর্মীদের আবর্তনের হিসেব রাখা হচ্ছে জাপানের ওমি রেলওয়ে কোম্পানি, কোকুসাই

www.pathagar.com

অটোমোবাইল কোম্পানি এবং নিশান মোটর কোম্পানিতে। এসব সংজ্ঞায় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যে কোনো কর্মী যখন বুদ্ধিগত আবর্তনের তেজী পর্যায়ে থাকবে তখন যেনো তাকে বুদ্ধি খাটানোর কাজে জোর দেয়া হয়; যখন কারো পদার্থগত আবর্তন তেজী থাকবে না, তখন যেনো তাকে দিয়ে কায়িক পরিশ্রম যথাসম্ভব কম করানো হয়; যখন কোনো কর্মী বুদ্ধিগত আবর্তনের তেজী অবস্থায় থাকবে না তখন যেনো তাদের নতুন কোনো কাজের ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া না হয়; সংবেদনগত আবর্তন তেজী হওয়ার চেয়ে মন্দা হওয়া ভালো কারণ তেজী হলে দিবাস্বপ্ন আর অভিমান মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু জাপান নয়, আমেরিকা (বিশেষত ইউএস অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন) ও ইউরোপের বহু দেশের দুর্ঘটনা প্রবল শিল্পে বায়োমেটিকসকে কাজে লাগানো হচ্ছে। শল্য চিকিৎসাতেও এই বিজ্ঞানের প্রয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন বহু বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক। এদের একজন ড. কিথ'ই জোলস দেখেছেন যে শারীরিক যন্ত্রণার অনুভব সবচেয়ে কম হয় যখন রুগীর পদার্থগত আবর্তন তেজী অবস্থায় থাকে। এই সময় দাঁত তুললে খুব কম যন্ত্রণা হয়, বড়ো অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আর ওষুধের ক্রিয়া চট্ করে ফলপ্রসূ হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ফলাফল হচ্ছে—যখন কোনো মহিলার পদার্থগত আবর্তন হয় তেজী, আর সংবেদনগত আবর্তন হয় মন্দা বা মধ্যবিন্দুর কাছাকাছি তখন যদি গর্ভাধারণ হয় তাহলে পুত্রসন্তানের সম্ভাবনা বেশি, আর যদি এ দুটো আবর্তনের অবস্থা হয় ঠিক উল্টো তাহলে কন্যা সন্তানের সম্ভাবনা শতকরা ৭০ ভাগ।

শুধু শিল্প ও চিকিৎসাতেই নয়, সুইজারল্যান্ডের জাতীয় জিমন্যাসটিক কোচ জ্যাক গুনথার্ড ও ব্যাসলে, ফুটবল ক্লাবের কোচ হেলমুট বেনথার্ডস প্রশিক্ষণ ও দল নির্বাচনের ব্যাপারে খেলোয়াড়দের ঐ তিনটি আবর্তনকে কাজে লাগিয়ে খুব সুফল পেয়েছেন। জাপানে তৈরি করা হয়েছে এমন একটা যন্ত্র (নাম দেয়া হয়েছে কায়োকন্ডিশনার) যার সাহায্যে আবর্তন চক্রের তেজী, মন্দা মধ্যবিন্দু চট করে গণনা করা যায়। বৃটেনের বায়োরিদমিক রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন কম্পিউটারে যে কোনো লোকের আবর্তন হিসেব করে এক বছরের তালিকা তৈরি করে দিতে পারে। খরচ পড়বে ১০০ পাউন্ডের মতো। অত্যুৎসাহীরা এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন Biorhythmic Research Association, Normanton-On-shore, Loughborough Leicester shire, U.K.।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

সময়ের বিচার

১৮.১ : আইনস্টাইনের সময় : বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও কাল

সময় বা কালের সত্তা এত রহস্যময় কেন? কারণ, তার চিরচঞ্চল গতি; তাকে ধরে বেধে জেনে নেবার কোনো উপায় নেই। এই অর্থে সে অন্য সমস্ত বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমরা বলি, দিন-কাল বদলে গেছে। তা বুঝি কেবলমাত্র আমাদের স্মৃতির ওপর নির্ভর করে।

আমরা কেবল বিগত দিনগুলোকে স্মরণ করতে পারি। আগামী দিনগুলোকে নয়। এর মাঝেই লুকিয়ে আছে কালের আরেকটা নিগুঢ় রহস্য—সে শুধু ভবিষ্যতের দিকেই ধাবমান, অতীতের দিকে নয়। সে কেবল একমুখী। এই ভবিষ্যৎমুখী কালই ইতিহাসের পৃষ্ঠা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন, পৃথিবীর বুকে জীববিবর্তন, সমাজবিবর্তন সবই সম্ভব হয়েছে কালের এই একমুখিতার জন্যে। যারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী নন, তারা সমস্ত 'মায়া' বলে মনে করে থাকেন। মহাবিশ্বের Steady state theory or Inflation theory এর প্রবক্তরা এই রকম ধারণা পোষণ করেন।

আমরা প্রত্যেকে কালের সত্যকে আমাদের চেতনার মধ্যে আন্তরিকভাবে অনুভব করে থাকি। মন মেজাজ যখন ভাল বা খুশী থাকে তখন সময় চট করে কেটে যায়। কিন্তু খারাপ থাকলে বা প্রতীক্ষায় থাকলে সময় আর কাটতে চায়না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেও বছরগুলো যেন ছোট হয়ে আসে।

প্রশ্ন ওঠে, আমাদের অনুভূত কালের (Imaginary Time) চৈতন্যের সঙ্গে বাহ্যিক জগতের যে কাল (Real Time) তার কোনো স্বন্ধ আছে কিনা ও থাকলে তা কী ধরনের। কালের সত্তার প্রকৃত রুপ যাই হোক না কেন, অন্তত বাহ্যিক বা বাস্তবিক কালকে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। এই কাজ আজও অসম্পূর্ণ। নিউটন, আইনস্টাইন, হকিং আর কোয়ান্টামবাদের অনুসারীরাও এই ধারনার অনেক ব্যাখ্যা যোগ করেছেন যা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে ধারা গড়ে উঠেছিল তাতে বাইরের জগতের ঘটনার ও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সমন্ধের বিবরণ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তি বা দর্শক নিরপেক্ষ। সমস্ত বিশ্বজুড়ে আদি অন্তহীন মহাকাল একই বেগে বেয়ে চলেছে। এমন একটা স্বাভাবিক ছবি সকলের মনের মধ্যে রেখে গিয়েছিল। দূরত্বের ও কালের মাপকাঠি যেসব

www.pathagar.com

দ্রষ্টার ক্ষেত্রেই এক, এটা সকলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। দ্রষ্টার গতির সঙ্গে বা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে যে মাপকাঠির রূপান্তর ঘটতে পারে একথা সকলেরই সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই কথা শোনালেন।

বুলেট ট্রেন, ফুটবল কিংবা পৃথিবীর সবকিছুরই গতি অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে আপেক্ষিক; ব্যতিক্রম হচ্ছে আলোর গতি। এটি কোনও কিছুর সঙ্গে আপেক্ষিক নয়। আলোর গতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র গতি যা পরমগতি আর অন্য সব গতিই আপেক্ষিক। এটাই আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের প্রবাহ বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বাস্তব কোনো ঘটনার উপরই এই ধরনের গতির কোনো প্রভাব পড়ে না। এই সার্বজনীন নীতিকেই আপেক্ষিকতাবাদ বলা হয়ে থাকে।

আলোর গতিবেগের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি নেই, অথচ আলোর গতিবেগ আপেক্ষিক নয়। তবে কি আলোর ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদ প্রযোজ্য নয়? আইনস্টাইন এটা ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। বস্তুর গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের তুলনায় খুবই সামান্য তখন নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কাজে লাগে। আর দ্রষ্টার গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় তখন তার কাছে দেশ-কালের আপেক্ষিকতা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

আলোর গতিবেগের নিরাপেক্ষিক দূরত্বের ফলে দ্রষ্টার গতিবেগের সঙ্গে দূরত্বের মাপকাঠি ছোট হয়ে আসে। কালের মাত্রা যায় বেড়ে। দ্রষ্টার গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের তুলনায় উপেক্ষণীয়, তখন তার কাছে দেশ-কাল স্বতঃপ্রতিটি ও গতিনিরপেক্ষ বলে মনে হয়। এখন মনে রাখা দরকার যে আপেক্ষিকতা কেবলমাত্র দেশ-কাল বোধের, প্রাকৃতিক নিয়মের নয়।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলো কিন্তু দ্রষ্টানিরপেক্ষ, সর্বজনীন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের এটাই হল প্রধান রীতি। তা না হলে বিজ্ঞানই সম্ভব হত না। আলোর বেগের নিরপেক্ষিক ধ্রুবত্ব এমনই একটা সর্বসাধারণ নিয়ম। এই মহান বিজ্ঞানী তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বলেই সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা এত বিস্তৃত ও বহুমুখী হতে পেরেছে।

এই থিয়োরীতে ভরসম্পন্ন বস্তুদের গতিবেগের একটা অলঙ্ঘনীয় সীমা আছে—তারা কখনোই আলোর গতিবেগের সমান বেগ অর্জন করতে পারে না। কেবলমাত্র ভরহীন কণারা (কার্বন বা আলোক কণিকা বা নিউট্রিনো) আলোর গতিবেগে চলতে থাকে। তাদের গতিবেগকে আবার কোনো মতেই কম-বেশি করা যায় না। এই তত্ত্বে আলোর ধ্রুব গতিবেগের মাধ্যমে দেশ ও কালের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এসে গেছে। তাই 'দেশ' ও 'কালে' ভাগটা দ্রষ্টার গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল।

আপেক্ষিকতাবাদে চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের গাণিতিক কল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। অবশ্য সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে তা সত্ত্বেও আমাদের দেশ ও কালের বোধ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। দেশ ও কালকে বাস্তবিকই সম্পূর্ণ অভিন্ন মনে করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

শান্ত পুকুরের পানিতে ঢিল ফেললে ছোট ছোট ঢেউগুলো গোলাকারে ছড়িয়ে পড়ে অবশেষে দূরে ভাসমান কোনো একটা বস্তুকে আন্দোলিত করে তুলতে পারে। এই

www.pathagar.com

ঢেউগুলো কিছু পরিমাণ শক্তি নিয়ে যতক্ষণ না সেই বস্তুটা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুচ্ছে, ততক্ষণ বস্তুটা স্থির। এর থেকে বোঝা যায় যে কার্য (বস্তুটার আন্দোলন) ও কারণ (পানিতে ঢিল পড়া) দেশ ও কালের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত, লাগোয়া। পানিতে ঢিল পড়ল আর তৎক্ষণাৎ বস্তুটার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল একটা কখনও দেখা যায় না। এই দুটো ঘটনার মধ্যে সব সময়ে একটা সময়ের ব্যবধান থাকে—ঢেউগুলো বস্তুটা পর্যন্ত পৌঁছতে যে সময় লাগে।

প্রত্যেক ঘটনা থেকে আলোর সংকেতও অনেকটা এইভাবেই চর্তুমাত্রিক দেশ-কালে একটা ত্রিমাত্রিক শঙ্কুর আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই আলোক শঙ্কুর মধ্যে অতীত থেকে ভবিষ্যত ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ দ্রষ্ঠানিরপেক্ষ কোন ঘটনা অন্য কোন ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে তা নিয়ে দ্রষ্টাদের মধ্যে মতান্তরের কোনো অবকাশ নেই।

কোনো একটা ঘটনার অতীত ও ভবিষ্যত আলোক-শঙ্কুর বাইরে যে প্রদেশ, সেখানকার ঘটনাগুলো এই ঘটনাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। ধরা যাক ঠিক এই মুহূর্তে কোনো কারণে সূর্য হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। এতে এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে কোনো ঘটনাকেই (সূর্যের ম্লান হওয়া) প্রভাবিত করতে পারবে না, কারণ এই মুহূর্তে সব পার্থিব ঘটনাগুলোই সূর্যের এই দুর্ঘটনার ভবিষ্যত আলোক শঙ্কুর বাইরে রয়েছে। আট মিনিট বাদে যখন সূর্য থেকে পৃথিবীতে আর আলো এসে পৌঁছবে না, তখন আমরা জানতে পারব কী ঘটে গেছে; পৃথিবী তখন সেই দুর্ঘটনার ভবিষ্যত আলোক-শঙ্কুর মধ্যে গিয়ে ঢুকবে।

ঠিক তেমনি, মহান বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় এই মুহূর্তে কী ঘটছে তা আমাদের জানবার কোনো উপায় নেই। বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলো থেকে যে আলো এখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে, তার যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল বহু কোটি বছর আগে। তাই আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন যা দেখি তা আজকের সত্য নয়, তা মহাবিশ্বের অতীতের নানা অধ্যায়ের ছবি।

১৮.২ : আইনস্টাইনের সময় : সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কাল

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগক্ষেত্রে যে কিছুটা সীমিত ছিল তা দশ বছর পরিশ্রম করে ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন দূর করেন। তিনি আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগক্ষেত্রকে হ্রাস-বৃদ্ধিহীন গতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত তাকে সব রকম গতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হলেন। পাওয়া গেল এক নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব। নিউটনের মহাকর্ষের তত্ত্বের সঙ্গে এর একটা বিরোধ আছে।

আমরা জানি যে দুটো বস্তুর মধ্যে নিউটনের মহাকর্ষীয় বল তাদের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। কাজেই এদের একটাকে সরালেই তৎক্ষণাৎ অন্যটার ওপর তার মহাকর্ষীয় প্রভাব এসে পড়ে অর্থাৎ, মহাকর্ষীয় প্রভাব মুহূর্তের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বলবে তা সম্ভব নয়—কোনো বাস্তব সংকেতই আলোর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি চলতে পারে না।

www.pathagar.com

অবশেষে আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের পরিধিকে আরো প্রসারিত করে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এসে পৌঁছলেন। ইউক্লেডীয় জ্যামিতিকে ত্যাগ করে রীমান কল্পিত জ্যামিতির বা দেশ-বোধ তত্ত্বের আশ্রয় নিলেন আইনস্টাইন। এই অভিনবতত্ত্বে জড়ের গতি বৈচিত্র্যের কারণ নিউটনীয় বল নয়, দেশ কালরূপী পটভূমির অসমতা ও বর্তুলতাই দায়ী।

পদার্থ ও শক্তির উপস্থিতিতে দেশ-কাল আর সমতল থাকে না—বেঁকে যায়। সূর্যের চারপাশে এই কারণে দেশ-কাল বর্তুলাকার ধারন করে। এই বাঁকা (দেশ-কালে) পথে গ্রহরা সব থেকে কম সময় সাপেক্ষ পথ (সোজা পথ) ধরে চলে। যেমন, পৃথিবী গোলাকার বলে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সবচেয়ে কম সময়সাপেক্ষ পথ হল বৃত্তের একটা অংশ। পৃথিবীর বুকে এটাই সব থেকে 'সোজা' পথ।

চর্তুমাত্রিক দেশ-কালে এই ধরনের 'সোজা' পথগুলো ত্রিমাত্রিক সাধারণ দেশে বক্রাকার ধারন করে। হকিং এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। ত্রিমাত্রিক আকাশ দিয়ে যখন একটা প্লেন সোজা পথে তড়ে যায়। তখন অসমতল দ্বিমাত্রিক জমিতে তার ছায়াটা কিন্তু আকাঁ-বাঁকা পথে চলে।

অসমতল দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আলোর গতিপথ ও বেঁকে যায় কারণ এর উপর অসমতা ও বর্তুলতার প্রভাব আছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অন্য একটা সিদ্ধান্ত হল যে, পৃথিবীর মতো বিরাট বস্তুর সান্নিধ্যে কালের গতি মন্থর হয়ে আসে। তার কারণ শক্তির সঙ্গে তার কম্পনাঙ্কের (এক সেকেন্ডে আলোর ঢেউ-এর সংখ্যা) একটা সমন্ধ আছে।

বস্তুর শক্তি যত বেশি, আলোর কম্পনাঙ্ক তত বেশি। পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে যখন আলো ওপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন তার শক্তি কমে আসে, ফলে তার কম্পনাঙ্ক ও যায় কমে। আলোর রং তখন কালের দিকে ঢলে পড়ে। তাই বহু ওপর থেকে যদি কেউ পৃথিবীর দিকে তাকায় তাহলে সে দেখবে যে নিচে সব কিছু মন্থর বেগে ঘটছে। পৃথিবী থেকে দূরে সরে গেলে কালের গতির এই যে তফাৎটা হয় আজকাল তার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে সংকেত পাঠানোর সময় সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সুক্ষ্ম হিসাব অগ্রাহ্য করলে জাহাজের স্থান নির্ধারণে কয়েক মাইলের ভুল হয়ে যেতে পারে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আরো একটা চমৎকার ফল আছে। দুই যমজ ভায়ের একজন যদি উচুঁ পাহাড়ের ওপর বাস করতে চলে যায় আর অন্যজন থেকে যায় সমুদ্রের ধারে। তাহলে প্রথমজন দ্বিতীয়জনেরর তুলানায় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে। যমজদের একজন যদি রকেটে করে প্রায় আলোর বেগে বিশ্ব ভ্রমণ শেষে ১ বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে, সে দেখবে তার তাই যে পৃথিবীতে থেকে গেছিল সে বুড়ো হয়ে গেছে। তাই এই থিয়োরী অনুসারে বিশ্বজুড়ে সমকালীনতা বলে কিছু নেই, অর্থাৎ মহাবিশ্বের দেয়ালে একটা ঘড়ি বা Universal Clook বলতে কোন কিছু টাঙ্গানো নেই। সব আপেক্ষিক ঘড়ি।

১৯১৫ সাল পর্যন্ত দেশ ও কালের বৈজ্ঞানিক ধারণাটা ছিল একটা রঙ্গমঞ্চের মতন। সেই মঞ্চে ঘটে চলে সব রকমের নাটক, কিন্তু নাটকগুলো মঞ্চটাকে পালটে ফেলে না।

www.pathagar.com

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদেও এই ধারণাই বহাল ছিলো। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এই ধারণাকে একেবারে পাল্টে দিল। এখন আর দেশ-কালকে স্বত:প্রতিষ্ট রঙ্গমঞ্চ হিসেবে ভাবা যায় না।

জানা গেছে যে সমস্ত গঠনাতেই দেশ-কালের একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকে। বস্তু ও শক্তি যেমন দেশ-কালকে অসমতল করে তোলে, তেমনি অসমতল চক্র দেশ-কাল ও আবার বস্তুর গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেশ-কালের এই নতুন থিয়োরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। আদি-অন্তহীন, পরিবর্তনহীন বিশ্বের ছবির বদলে এসেছে নতুন ছবি-সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব যার শুরু হয়েছিল পনেরশ কোটি বছর আগে।

১৮.৩ : যেখানে সময় উড়ে চলে

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের একটি 'সিদ্ধান্ত হলো এ' রকম : স্থানকালে দুটি ঘটনার মধ্যে তফাৎ সকল দশকের কাছে তা এক হতে পারে না; আলো যতদূর যায় তা সময় পরিমাপ করে; স্থান-কালে একটি 'ওয়ারলড লাইন' বা 'লাইট-কোন' (আলোক শঙ্কু) বস্তুর ইতিহাস রচনা করে; ত্বরণ এবং মাধ্যাকর্ষণ এই লাইন বা লাইট-কোণকে বাঁকিয়ে ফেলে; সবশেষে—স্থান শুন্য ও নয় পূর্ণও নয়।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আলো যত দূরত্বে যাবে, এখানে সময়কে স্থানেরই অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে ভাবা হয়। ব্যাপারটি কিন্তু তা ঠিক নয়। গতিকের সুবিধার জন্য সময়কে অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে ভাবা হয়। স্থান ও কাল স্বতন্ত্র দুটি জিনিস। এ সত্ত্বেও সময় ও স্থান পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিয়ার ফল খুবই চমকপ্রদ।

স্থান-কালে কোন বস্তুর যাত্রাপথই হলো ওয়ারলড্ লাইন। স্থান-কাল যদি আলোর শঙ্কুর মধ্যে না থাকে তবে কোন তথ্যই মানুষের কাছে এসে পৌঁছুতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি আন্ড্রোমিডার একটি গ্রহের খবর পেতে হলে আরও ২০ লক্ষ বছর যাবে সেখানে সিগনাল পৌঁছাতে। আর তাদের জবাব পেতে আরও ২০ লক্ষ বছর।

এ যেন কল্প বিজ্ঞান কাহিনীর কথা : পুত্র মাত্র ১ দিন তোকে দেখিনি বাছা আমার। অথচ কেটে গেছে ত্রিশ লক্ষ বছর! এর কারণ হলো "এখন" মুহূর্তটি আলোর শঙ্কুর বাইরে ২০ লক্ষ বছর আলোকবর্ষ দূরে আছে। আলোর গতিবেগে সময় স্থির হয়ে যায়। যাত্রীর গতিবেগ যত বেশি হবে তত তার ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ি সাপেক্ষে ধীর বা মন্থর হয়ে যাবে।

হাইজেনবার্গের (কোয়ান্টাম) অনিশ্চয়তার নীতি দেখিয়েছে একটি সিস্টেম বা তন্ত্রের অবস্থা নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। সুতরাং ভবিষতে সে কি করবে সে সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। করা যেতে পারে শুধু বিভিন্ন পরিণতির সম্ভাব্যতার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী। এই element of chance অর্থাৎ নিয়মহীনতাই আইনটাইনকে ১৯২৭ সনে খুব বিচলিত করেছিল। ভৌত নিয়মগুলো ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট, নিশ্চিত সুনিয়মিত ভবিষ্যৎবাণী করতে পারা যাবে না এ কথা বিশ্বাস করতে তিনি অস্বীকার

www.pathagar.com

করেন। কোয়ান্টাম অভিক্রিয়া যে অনিশ্চয়তার কথা বলে তা ক্ষুদ্র জগত (ক্ষুদ্রমানের) তথা ইলেকট্রন, কণিকার বেলায় খাটে অথচ ব্যাপক অপেক্ষাবাদের ক্রিয়াকর্ম বিরাটমানের গ্যালাক্সি তারা নিয়ে।

একটি তন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট নিশ্চিত ইতিহাস আছে—সাধারণ বুদ্ধিজাত সংস্কার এই দৃষ্টিভঙ্গী আইনস্টাইন গ্রহণ করেছিলেন। সেটা কখনোই অর্ধেক এক জায়গায় এবং বাকি অর্ধেক অন্য জায়গায় হতে পারে না। আপনি একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত (অন্য জায়গায়) হতে পারেন না। অনিশ্চিয়তার নীতির ফলে নানা রকম স্ববিরোধিতা বা Pasadox উপস্থিত হয়। এই জাতীয় স্ববিরোধগুলো আইনস্টাইনকে খুবই কষ্ট দিয়েছে।

এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সুস্থ উপায় বাতলে দিয়েছিলেন রিচার্ড ফাইনম্যান (১৯৬৫ সালের নোবেলজয়ী-আলোর কণা)। ইতিহাসের যোগফল সম্পর্কীয় হাইপোথিসিস বা কল্পনে তিনি বললেন : চিরাযত অ-কোয়ন্টামতত্ত্বে যে রকম স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা হয়—একটি সিস্টেমের স্থানকালে সেইরকম একটিমাত্র ইতিহাস ছিল না। বরং তার ছিল সম্ভাব্য সবরকম ইতিহাস। যেমন A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে যেতে চাইলে আপনি অসংখ্য রকম পথে যেতে পারেন। যেমন সোজা সরল (সংক্ষিপ্ত) রেখা ধরে বা একে বেকে বহুদূর দিয়ে, বিভিন্ন কোনা ধরে, শেষ পর্যন্ত আপনি B বিন্দুতে পৌছতে পারেন। এটা আপনার বিবেক-বিবেচনার স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করে। যে পথগুলো কণিকাটিকে বা আপনাকে A থেকে B কে নিয়ে যায় তার সবগুলোর সঙ্গে জড়িত সংখ্যাগুলোকে যোগ করে গমনের সম্ভাব্যতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ কণিকাগুলো স্থান-কালের ভিতর দিয়ে যে কোনও পথ গ্রহণ করতে পারে।

১৮.৪ : কাল্পনিক কাল (Imaginary Time)

বিশ্ব একদিন বিরাট ধ্বসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণগহবরের সিঙ্গুলারিটি বা অনন্য বিন্দুতে শেষ হয়ে যাবে নাকি চিরকাল প্রসারিতই হতে থাকবে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া অনেক বেশি কঠিন কারণ এর সঙ্গে জড়িত স্থান-কালের পশ্চাৎপটে কণিকাটির গমনপথই নয়, তার সঙ্গে জড়িত আছে স্থান-কালের নিজেদের গঠনের ওপর কোয়ান্টাম নীতি প্রয়োগ করা। যেটা প্রয়োজন সেটা শুধু কণিকাগুলোর ক্ষেত্রেই ইতিহাসের যোগফল বার করা নয়, স্থান-কালের সার্বিক গঠনেরও যোগফল বার করা। আমরা এখনও এই যোগ ঠিক কি ভাবে করতে হবে তা জানিনা, তবে সেই যোগের শরীরটা কি হবে তার খানিকটা আমরা জানি।

তার একটি হলো : সাধারণ বাস্তব কালের মাধ্যমে করার চাইতে কাল্পনিক কালের মাধ্যমে করা সহজ। এর কল্পন বেশ গঠন-বোঝাই যায় না এমন। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কাল্পনিক কালের সঙ্গে বাস্তব মহাবিশ্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এটা কি? সাধারণ বাস্তব কালকে ভাবা যেতে পারে-বাম থেকে দক্ষিণে গমনকারী একটি অনুভূমিক রেখা। পূর্ববর্তী কাল রয়েছে বাঁদিকে আর পরবর্তী কাল রয়েছে ডাইনে। কিন্তু কালের অন্য অভিমুখও আপনি ভাবতে পারেন পৃষ্ঠার উপরে আর নিচে। এটাই তথাকথিত কাল্পনিক কালের অভিমুখ। এ অভিমুখ বাস্তব কালের সমকোণে।

www.pathagar.com

বাস্তবকালের অভিমুখে সুনিশ্চিতভাবে স্থান-কালের বক্রতার ফল হয় একাধিক সিঙ্গুলারিটি অর্থাৎ এমন কতগুলো জায়গায় যেখানে স্থান-কাল শেষ হয়ে যায়। এই বিন্দুগুলোতে পদার্থবিদ্যার সমীকরণগুলো সংজ্ঞিত করা যায় না। সুতরাং কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাল্পনিককালের অভিমুখ বাস্তব কালের সমকোণে। এর অর্থ : যে তিনটি অভিমুখ স্থানে চলাচলের অনুরুপ, এর আচরণ তার সমরূপ। মহাবিশ্বের পদার্থের জন্য স্থান-কালের বক্রতা তাহলে স্থানের তিনটি অভিমুখের পথ দেখাতে পারে এবং কালের অভিমুখ তার পশ্চাতে মিলিত হতে পারে। তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো একটি বদ্ধ পৃষ্ঠ তৈরি করবে। তিনটি স্থানিক অভিমুখ এবং কাল্পনিক কাল এমন একটি স্থান-কাল তৈরি করবে যেটা নিজের উপরেই বদ্ধ তবে তার কোনও কিনারা কিংবা সীমানা থাকবে না। শুরু কিংবা শেষ বলা যায় এরকম কোনও বিন্দু তার থাকবে না। ভূ-খণ্ডের যেমন কোনও শুরু কিংবা শেষ নেই অন্ততঃ তার চাইতে বেশি কিছু এর থাকবে না।

কাল্পনিক ইতিহাস জানা থাকলে বাস্তবকালে এর আচরণ গণনা করতে পারা যায়। এভাবে একটি পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারা যাবে যে তত্ত্ব মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারবে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ইতিহাসের যোগফল কি করে সঠিকভাবে করতে হয় সেটা এখনও আমরা জানি না। তবে এটি নিশ্চিত যে কাল্পনিক কাল এবং স্থান-কালের নিজের উপর বদ্ধ থাকার প্রকল্পন এর সঙ্গে জড়িত থাকবে। স্টিফেন হকিং 'কাল্পনিক কাল' ধারণাটির প্রবক্তা ও জনক।

কাল্পনিক কাল বৈজ্ঞানিক কল্প কল্পকাহিনীতে আজকাল খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই কল্পন বা হাইপোথিসিস এমন জিনিস যা আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি সেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে। স্রষ্টার মনের গভীর কোণে সঙ্গোপনে সৃষ্টি যে গোপন ইচ্ছে লুকায়িত ছিল, যার বহিঃপ্রকাশ এই বিশ্বজগত এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, আপনি, আমি, পৃথিবী, গৃহ তারা সব কিছু এর পুরোটাই স্রষ্টার কল্পন যার সৃষ্টি হয়েছিল কাল্পনিক সময়ে।

তারপর তিনি বললেন 'কুন', 'হও' অমনি সব হয়ে গোল। 'আলোকিত হউক। বিশ্ব আলোকে ভরে গেল। বললেন 'শব্দ', আওয়াজ, বাক্য হয়ে গেল। অর্থাৎ বাস্তব বিশ্বের জন্মের আগে কাল্পনিক দেশ-কাল্পনিককালের অস্তিত্ব ছিল। সেটা ছিল নূরের জগতে। পাঠক। এ সম্পর্কে গভীর গুপ্তধারণাগুলো পরবর্তী বই **"নূর ও আলোর রহস্য"**-তে আলোচিত হবে। হতে পারে কাল্পনিক সময় হচ্ছে আসলের চাইতে বেশি বাস্তব; আর বাস্তব সময় হচ্ছে শুধুমাত্র একটি ধারণা যার সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের বর্ণনা দেয়ার সুবিধার্থে। কাল্পনিক কাল সম্পর্কে পল ডেভিসের "এবাউট টাইম" শীর্ষক বইয়ের ১৮৮-১৯৫ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলো পড়ে দেখবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

মহাকাশ-মহাকাল : সময় থেকে মুক্তি

১৯.১ প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের ধারণায় দেশ-কালের চিত্র

ফ্রিটজফ কাপরা তার বিখ্যাত 'Tao of Physics' বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেন : আমরা পড়ি যে কোরান শিক্ষার্থীরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মনের এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে তার মনে হয় সমস্ত পৃথিবী যেন এক বিশাল সমস্যা ও প্রশ্ন জর্জরিত বস্তুবিশেষ। কোয়ান্টাম থিয়োরী ঠিক একই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল পদার্থবিদদের দ্বারা এর জন্মের সময়। প্রকৃতি কি এতই নিষ্ঠুর ও অসম্ভব হতে পারে? পরমার্থবাদীরা এই বিষয় সবসময়ে মেনে নিয়েছেন কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে এ ধরনের সমস্যা সবে শুরু হয়েছে। বিংশ শতকে বিজ্ঞান পরমাণুর গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। যতই আমরা প্রকৃতি রহস্যের গভীরে যাব ততই আমাদের সাধারণ ভাষা, প্রতিচ্ছবি ও ধারণাকে ত্যাগ করতে হয়। দার্শনিক মতে, আমাদের এই পরমাণু জগতের পথে অণুর আকৃতি প্রকৃতি জানতে হলে ইন্দ্রিয়াণুভূতির সীমা ছাড়িয়ে যেতে হয়। এর পরে বিজ্ঞান নেই, যুক্তি বা বুদ্ধির প্রয়োগ এখানে অচল। অধ্যাত্মাবাদের মতো এখন পদার্থবিদেরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নিয়েই চিন্তা করেন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মডেল ও সূত্রগুলি প্রাচ্য দর্শনের ধারণার সমভাবাপন্ন হয়েছে।

বর্তমানে প্রাচীন মতবাদগুলো, যেমন কণার মৌলিকত্ব, জাগতিক পদার্থ ও বিচ্ছিন্ন পদার্থ, এসবের আর কোন অর্থ হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মনে হয় এক গতিশীল মাকড়শার জালের মত অবিচ্ছিন্ন শক্তির প্রতীক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক গতিশীল অবিচ্ছেদ্য পূর্ণবস্তুর স্বরূপ বলে মনে করা হয় যাতে পর্যবেক্ষক ও বিশেষভাবে যুক্ত। এই লব্দ অভিজ্ঞতায় মহাকাল ও সময়, বিচ্ছিন্ন একক বস্তু এবং কার্যকারণের প্রচলিত ধারণার অর্থ মূল্যহীন হয়ে যায়। এইরূপ অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদীদের অভিজ্ঞতার অত্যন্ত সমান্তরাল।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের একটি মৌলিক ধারণাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন করছে। সেটি এই যে, প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের সব ধারণাই সীমিত বা অসম্পূর্ণ। যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি বটে তবে তা প্রকৃতির সত্য চিত্র নয়, আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। ঠিক মানচিত্রের মত কিন্তু দেশ নয়। যখনই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াই, যুক্তিবিচারে সমাচ্ছন্ন আমাদের মন তার সীমাবদ্ধতা দেখতে পায়। আমরা তখন এর সংশোধন করি, প্রয়োজনে কিছু বর্জন করি।

মহাকাশ ও মহাকালের ধারণা প্রকৃত সত্য চিত্রের ধারণাতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলি আমাদের পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ঘটনাগুলিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখে।

www.pathagar.com

এইজন্য এগুলি শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই নয়, আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টাতেও প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র বা নিয়ম-শৃঙ্খলা মহাকাশ ও সময়ের ধারণার সাহায্যে তার ফর্মুলা তৈরি করে।

আদি পদার্থবিজ্ঞানে এক অখণ্ড ত্রিমাত্রিক মহাকাশ যা এর পার্থিব পদার্থ থেকে স্বাধীন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুশাসন সম্মত এবং সময় যা পৃথক মাত্রা এবং এটা ও অখন্ড পার্থিব জগত থেকে স্বাধীন ও সমভাবে প্রবহমান এমনটি মনে করা হত (১৯০৫ সন পর্যন্ত)। জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব যে প্রকৃতিকে বর্ণনার পরিকাঠামো নয়, বরং প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত সত্য, এই বিশ্বাসের ভিত্তি গ্রীক দর্শন। জ্যামিতিক আকারগুলি প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রকাশ। জ্যামিতিকে মনে করা হত যুক্তি ও সৌন্দর্যের যথার্থ সংযোগ। এইজন্য একে ঐশী উপাদান মনে করা হত। আইনস্টাইনই প্রথম বুঝালেন যে (১৯১৫ সালে) জ্যামিতি প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত নয়, বরং আমাদের মনের কল্পনীয় প্রতিফলন। প্রাচ্য দর্শন গ্রীকদের থেকে পৃথকভাবে সবসময় অন্য ধারণা পোষণ করত যে, মহাকাল ও সময়ের ধারণা মনেরই কল্পনা, এসব পরস্পর সম্বন্ধিত, সীমাবদ্ধ ও মায়া। বুদ্ধ শিখিয়েছিলেন, হে ভিক্ষুরা অতীত, ভবিষ্যত পার্থিব মহাকাশ এবং ব্যক্তি এ সবই নাম চিন্তার অভিব্যক্তির আকার, সাধারণ ব্যবহারের ভাষা কেবল বাহ্যিক প্রকৃতি।

আজকে কোনও অবস্থাতেই এই বিশাল পার্থিব জগতের কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও পর্যবেক্ষকের নিকট কোনও দূরবর্তী ঘটনা, যা কোন বিশেষ সময়ে ঘটেছিল, তা অন্য পর্যবেক্ষকের নিকট মনে হবে আগে বা পরে ঘটেছিল। কাজেই কোন বিশেষ মুহূর্তে জগতের অসীম ধারণার কথা বলা যায় না। একজন পর্যবেক্ষকের নিকট যা স্পেস অন্য পর্যবেক্ষকের নিকট তা স্পেস ও টাইমের মিশ্রণ। জ্যোর্তিবিদরা স্পেস ও সময়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপযোগিতার সঙ্গে পরিচিত। ধাবমান বস্তুর স্থির চিত্র বা গতিবিরত বস্তুর চিত্র থেকে পৃথক এবং গতিময় ঘড়ি বিভিন্ন গতিতে চলে। এই সব ফলাফল ধাঁধার মত মনে হবে, যদিনা আমরা বুঝি যে, এসব চর্তুমাত্রিক ঘটনার অবস্থার প্রতিফলন, যেমন ছায়া হচ্ছে ত্রিমাত্রিক অবস্থার প্রতিফলন।

যদি আমরা চর্তুমাত্রিক স্পেস-টাইমের অবস্থাকে মনশচক্ষুতে সত্য বলে অনুভব করতে পারি, তাহলে এসব কিছু আর ধাঁধা মনে হবে না। আমরা আপেক্ষিকতত্ত্বে যে ধরনের চেতনার বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বলি, এই অভিজ্ঞতা প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীদের স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করার কথা বলে। বৌদ্ধ ধর্মের 'অবতংসক' সূত্রে, আনন্দ বা চৈতন্য লাভের পর, এই জগতের অবস্থা সাধকের নিকটে কিরূপে প্রতিভাত হয়, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এই চৈতন্য সমস্ত স্পেস ও টাইমের সীমার বাইরে। স্পেস ও টাইমের যথার্থ বর্ণনা বার বার উক্ত সূত্রে বলা হয়েছে এবং চৈতন্যানুভূতির এক বিশেষ অবস্থা হিসাবে এই আনন্দকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'অবতংসক এবং এর দর্শনের তাৎপর্য দুর্বোধ্য মনে হবে, যদি না আমরা একবার মৃত্যুর অনুরূপ সেই অবস্থা অনুভব করি, যে অবস্থা সবকিছুর উর্ধ্বে। যেখানে কোনও কিছুর পৃথক অস্তিত্ব নেই, শরীর বা মনের কার্য ও কারণের। সর্বত্র প্রতিটি বস্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, শুধু মহাশূন্যে নয় পার্থিব জগতেও। প্রকৃত অনুভূতির অভিজ্ঞতা বলে—সময় ছাড়া আকাশ নয় এবং আকাশ ছাড়া সময় নয়—তারা পরস্পর সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

স্পেস ও টাইমের এই পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে এর থেকে পরিষ্কার ও ভাল বক্তব্য আর হয় না। আধ্যাত্মিক জগতে সময়ের কোনও পরিমাপ বা বিভাজন নেই যেমন, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। কারণ এগুলি সঙ্কুচিত হয়ে বর্তমানের একটি মুহূর্তে এসে দাড়িয়েছে, যেখানে জীবন তার প্রকৃত অর্থে স্পন্দিত হচ্ছে। অতীত এবং ভবিষ্যত গুটিয়ে গিয়ে (স্বপ্নে এমনটি হয়) বর্তমানের আনন্দলাভের মুহূর্তে তার সব কিছু নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, বরং অবিরাম অতীতে বয়ে চলেছে। সীমাহীন বর্তমানের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ সীমাহীন বর্তমান, অতীত মুহূর্ত প্রভৃতি শব্দগুলি সব বর্তমান কালের সাধারণ ধারণার প্রকাশ। স্পেস টাইমে, যা আমাদের প্রত্যেকের নিকট অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত সবকিছুই এক সঙ্গে বলে মনে হয়। প্রত্যেক পর্যবেক্ষক, তার সময় যেমন চলে যায়, বলতে গেলে স্পেস টাইমের এক এক অংশকে আবিষ্কার করে, যা তার নিকট এই পার্থিব জগতের পর্যায়ক্রমিক আকৃতি মনে হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে যে ঘটনাবলী বা উপাদানের সাহায্যে স্পেস-টাইমের সৃষ্টি, তা তার জানার আগে থেকেই বর্তমান ছিল।

রিলেটিভিস্টিক পদার্থবিজ্ঞান, স্পেস-টাইমের এটিই পূর্ণ ব্যাখ্যা। স্পেস বা মহাকাশ এবং টাইম বা সময় উভয়ই তুল্যমূল্য। এগুলি চর্তুমাত্রিক অবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত, যাতে কণাগুলির আন্তঃক্রিয়া যেকোনও দিকে বিস্তৃত হতে পারে। রিলেটিভিস্টিক কণার জগতের প্রকৃত ধারণা অনুভব করতে হলে আমাদের সময় অতীত হওয়া এই ধারণা ভুলে যেতে হবে। যদি আমরা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্পেসের বা মহাকাশের অনুভূতির কথা বলতে চাই তখন এই অনুভূতিতে ঐহিক ঘটনাবলীর পর্যায়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। মনে হয় সব বস্তুই একাকার এবং একসঙ্গে এক অব্যয়, অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হয়েছে, এবং এই অবস্থায় তা কিন্তু থেমে নেই, বরং এক চৈতন্যময় অবিচ্ছিন্ন গতি, যাতে সময় এবং আকাশ একসঙ্গে গ্রথিত। অধ্যাত্মবাদীরা আরও বলেন যে তাদের অনুভূতিতে সময় স্তব্ধ হয়ে যায় বা সময়ের গতি থেমে যায় এবং স্পেস টাইমের পূর্ণ অণুভূতি তাঁরা লাভ করেন। অনেকে বিশ্বাস করেন সময় চলে যায়, প্রকৃতপক্ষে এটি যেখানকার সেখানেই থাকে। চলে যাওয়ার ধারণাকে সময় বলা হয় কিন্তু এটি ভুল। কারণ মানুষ দেখে যে এটি চলে যাচ্ছে বা অতিবাহিত হচ্ছে—বুঝতে পারে না যে এটি যেখানকার সেখানেই আছে।

অনেক অধ্যাত্মবাদী গুরু বলেন যে, সময়ে চিন্তার অভিব্যক্তির প্রকাশ হয়, কিন্তু দৃষ্টি একে অতিক্রম করতে পারে। লামা গোবিন্দ বলেন, দৃষ্টি উচ্চমাত্রিক আকাশের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং সেজন্য সময়ের অতীত। রিলেটিভিস্টিক পদার্থবিজ্ঞানে 'স্পেস-টাইম', অনুরূপ উচ্চমাত্রিক অবস্থার 'সময়ের অতীত' এক অবস্থা। এর মধ্যে সব ঘটনাই পরস্পর সম্পৃক্ত কিন্তু সংযোগগুলি কার্যকারণ বশীভূত নয়। কারণ কণাগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কার্যের কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে। যখন স্পেস-টাইম ডায়াগ্রামের দিক নির্ণয় নির্দিষ্টভাবে দেখানো হবে অর্থাৎ তলদেশ থেকে উপরে; যখন তাদের চর্তুমাত্রিক অবস্থার প্যাটার্ন হিসাবে ধরা হবে, তাদের সময়ের কোনও নির্দেশ ছাড়া, তখন কোন 'আগে' বা 'পরে' বা কোনও কারণও নেই।

প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীরাও অনুরূপভাবে বলেন যে সময়ের গভীর বাইরে তারা (কার্যকারণ বা জগতের ও বাইরে) তাদের অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "সময়, আকাশ এবং কার্যকারণ, ঠিক যেন একটি কাঁচের আবরণ,—যার মধ্যদিয়ে আমরা

www.pathagar.com

সেই অসীম অব্যয় পরমপুরুষকে দেখি। সেই অব্যয় পুরুষের মধ্যে সময় নেই, আকাশ নেই, কার্যকারণও নেই।" প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীপরম্পরা তাদের অনুগামীদের এই শিক্ষাই দেন যাতে তারা দৈনন্দিন জীবনের সময় বা কার্যকারণভিত্তিক অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারেন। একে বলা হয় কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি বা কর্মের সঞ্চালন, হিন্দু বা বৌদ্ধরা উভয়েই একথা বলেন। তবে হিন্দুরা চান মোক্ষ বা ব্রহ্ম সাযুজ্য, বৌদ্ধরা চান নির্বান বা চরমানন্দ লাভ। তাই প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে সময় থেকে মুক্তি। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য রিলেটিভিস্টিক পদার্থবিজ্ঞানও এই কথা বলা হয়।

১৯.২ : ধর্ম অনন্ত-এর ইতিহাস নেই; সময় চিরন্তন-কালের করাল গ্রাসে

পশ্চিমের সব ধর্মে যেগুলি ইহুদি পরম্পরা থেকে জন্মেছে তা খ্রীষ্ট ধর্ম হোক বা ইসলাম, তাদের ধারণামতে একটি জন্ম এবং একটি মৃত্যুতে সব সমাপ্ত হয়ে যায়। পরে কোনো জন্ম হয় না। হবে শেষ বিচার মহাপ্রলয়ের পরে। কিন্তু পূর্বের দেশের লোকেরা এই জেনেছে যে এই জন্ম এবং মৃত্যু বারবার হয়। আসা-যাওয়া অনন্ত।

পার্থক্য রয়েছে সমাধিস্থ আর অসমাধিস্থ অবস্থার মাঝে। সমাধির সঙ্গে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সময়ের অনুভূতি যেখানে শেষ, সমাধি সেখান থেকে আরম্ভ। সময়ের সঙ্গেও সমাধির সম্পর্ক যেহেতু নেই তাই সেটা কালাতীত। সমাধির অর্থই হচ্ছে সময়ের বাইরে যাওয়া। যেখানে সময় শেষ হয়ে যায় সেখানে পরিবর্তন শেষ হয়ে যায়। সেখানে কেবল তাই রয়ে যায় যা সদা সর্বদা রয়েছে। সেখানে অতীত নেই, ভবিষ্যত নেই, কেবল বর্তমান। যেখানে ঘড়ির কাঁটা একেবারে থেমে যায় এবং আগে চলে না। সমাধি, ক্ষণের বা সময়ের ঘটনা নয়, ক্ষণের বাইরে ঘটে। সমাধিস্থ ব্যক্তি বলে যে কিছু আসছেও না, আবার কিছু যাচ্ছেও না। যা যেখানে তা সেখানে। সব থেমে আছে। যাওয়া আসার ধারণা সময়ের সাপেক্ষে এটাই অসমাধিস্থ মনের ধারণা। মন, সময়ের জনক। মনের ওপারে গেলেই কোন সময়বোধ থাকে না।

সময় মনের থেকে উৎপত্তি হয়। সুখে থাকলে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, দুঃখে থাকলে তা দীর্ঘ হয়। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় খুব দ্রুত কাটে। ঘড়ি নিজের মতনই চলে, কিন্তু মনে হয় যেন আজকে ঘড়ি চলছেনা বা দ্রুত চলছে। আসলে ঘড়ি শীঘ্র চলছে না। ঘড়ি নিজের হিসেবেই এবং স্বীয় গতিতেই চলছে। কিন্তু মনের অবস্থার সঙ্গে সময়ের পরিমাপের অনুভব নির্ভর করে।

সমাধি সুখ এবং দুঃখের বাইরে। সমাধি আনন্দের অবস্থা। যেখানে সময়ের কোন মাপ থাকে না। সেখানে সময় বাচেঁ না। সমাধিস্থ অবস্থায় সব কিছুকে শাশ্বত দেখায়। স্বপ্নে সময়ের পরিমাপ জাগ্রত অবস্থার তুলনায় একেবারে ভিন্ন হয়ে যায়। এক মুহূর্তের তন্দ্রায় এতবড় স্বপ্ন দেখতে পারা যায় যা দেখতে জাগ্রত অবস্থায় বছর লেগে যাবে। এত দীর্ঘ (অনেক বছরের) স্বপ্ন এত অল্প সময়ে কি করে দেখতে পারা যায়? স্বপ্নে মন বদলে যায়। তাই সময়ের ধারণা বদলে যায়। গভীর নিদ্রায় সময় থাকে না। সুষুপ্তিতে চেতনা লীন হয়ে যায়। তাই সেখানেও কোন বোধ থাকে না। সমাধিতে চিহ্ন থাকে না, শেষ হয়ে যায়। সমাধি সময়েরও পরের অবস্থা।

ধর্ম ইতিহাস নয়। ইতিবৃত্তি আরম্ভ হয়, শেষ হয়। আদি হয় অন্ত হয়। ধর্ম সনাতন। সনাতনের অর্থ যা সব সময়ে রয়েছে। সবসময়ই আমরা সময়ের হিসাব রাখি, ভোর হয়,

www.pathagar.com

সন্ধ্যা হয়। সময় চলে যায়। আমাদের সময়ের দেয়াল রয়েছে। আমাদের কাছে সময়ের মাপদণ্ড রয়েছে তাই দিয়ে মাপি। এটা স্বাভাবিক কিন্তু সত্য নয়। আমাদের যা বোধ তাই মাপ। আমাদের মাপ ঐ কুয়োর ব্যাঙের মতই। আকাশ ও কুয়োর সমান। কুয়োর ব্যাঙ যখন আকাশের দিকে তাকায় আকাশকেও সে কুয়োর আকারেই দেখে। আমরাও সময়ের কুয়োয় বাঁচি। সব কিছু আসে এবং চলে যায়। সব জিনিসের ভাগাভাগি। কিছু যা অতীত হয়ে গেছে এবং কিছু যা ভবিষ্যতে রয়েছে। বর্তমানের একটি ক্ষণ আসার আগেই চলে যায়। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কে, কবে এবং কখন, কি হয়েছে? আমরা সব সময় নিজেদের কুয়োয় বন্দীত্ব অনুভব করি। তাই জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোন কুয়োয় ছিলেন? কোন সময়ের সীমায় ছিলেন? মহাপুরুষ সময়ের সীমায় বাঁধা থাকেন না। আমরা বাঁচতে চাই, সেটা আমাদের সীমার আগ্রহ। আমরা কুয়োর মাপকাঠি দিয়েই সবকিছু মাপি। বলি সাগর হচ্ছে কোটি কুয়োর সমান। সংখ্যা একটা থাকবেই। সময়ের গজ-ফুটের। যারা কুয়োর বাইরের জগতের লোক, তারা এসব মাপদণ্ড মানে না। এ ধরনের হিসাবই করে না। সব হিসাবের বাইরে তাদের বিচরণ। সমাধিস্থ পুরুষের কাছে সব কিছুই কালাতীত।

সনাতন ধর্মে যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে সেই নিরাকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই হলেন এই 'মহাকাশ' এবং 'মহাকাল'। বলা হয় 'Space is God', 'Time is God' নিরাকার ব্রহ্ম যখন মায়াযুক্ত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠলেন, ঠিক তখনি তার সাকার রূপের বিকাশ ঘটল 'বিগব্যাঙ' হিসাবে। সাকার রূপাটি হল শক্তিসত্তা বা শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ এবং এই শক্তিই হল সৃষ্টির শক্তিসত্তা বা উৎস শক্তি। বিগব্যাঙের বিস্ফোরণের তিন মিনিটের মধ্যেই সৃষ্টির কণাসমূহ নির্গত হয়েছিল; অর্থাৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির লীলাখেলা শুরু হয়েছিল। আর তারই চূড়ান্ত পরিণতি হল জীব-জড় সহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—অর্থাৎ স্রষ্টার লীলাক্ষেত্র। উপনিষদে বলে বিগব্যাঙের বিস্ফোরণের মধ্যে ছিল দুটি জিনিস : শব্দ এবং আলো।

বেদে বলা হয়েছে, "শব্দ এব ব্রহ্ম । জ্যোতিরেব ব্রহ্ম"। এদিকে সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে। অক্ষর ব্রহ্ম! 'নাদ ব্রহ্ম', শব্দ ব্রহ্ম'। অর্থাৎ শব্দের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত রয়েছে। শব্দব্রহ্ম বা পাদব্রহ্ম বলতে সর্বাতীত পরমেশ্বরকে বুঝানো হয়েছে। শব্দব্রহ্ম হতেই জগতের উদ্ভব। ঈশ্বরকে জ্যোর্তিময় বলা হয়। জরাথুস্ত্রা বলেছেন 'God is light'। হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকা কালে তাঁর ভিতরে বাইরে কেবল নূর-অর্থাৎ জ্যোতিঃ দর্শন করতেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/১) বলা আছে, কোনো কোনো বিদ্ধান ব্যক্তি মোহবশত পদার্থের নিজস্ব শক্তিকে জগতের কারণ বলে থাকেন, আবার কেউ কেউ কালকে কারণ বলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বচক্রের আবর্তন আমরা যে দেখতে পাই, তা পরমেশ্বরেরই মহিমা।

দার্শনিকরা বস্তু, শক্তি বা কালকে নাকচ করলেও আমাদের কিন্তু বিজ্ঞানের পথেই জানতে হবে পরমেশ্বরের স্বরূপ।

ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায় হচ্ছে "বিশ্বরূপ"—অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। এতে ৫৫টি সূত্র রয়েছে। এটি মূলত 'কালের করাল গ্রাস' বিষয়ক অধ্যায়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, অন্যথায় ভ্রাতৃঘাতী মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন বীতশ্রদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। কৃষ্ণ তখন বাধ্য হয়ে তার ভক্ত ও সুহৃদ বীর অর্জুনকে মহাবিশ্বের স্বরূপ দেখালেন মায়া বলে। কৃষ্ণের বুকের দিকে তাকানো মাত্র অর্জুনের মাথা ঘুরে

www.pathagar.com

গেল। তিনি সম্মোহিত হয়ে দেখলেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলন্ত রূপ। জীবন শুরু হচ্ছে, মৃত্যুতে তা শেষ হচ্ছে। অর্জুন আরও দেখলেন, যুদ্ধ হউক আর না হউক, তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, শত্রুপক্ষীয় কর্ণ, দুর্যোধন সবাই কিছুদিন পরে মারা যাবে। অন্য কারণে কৃষ্ণের দাঁতের (করাল গ্রাসে) ভেতরে তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গভীরে অন্ধকারে (কৃষ্ণ গহ্বরে বা Black hole-এ) ৩২নং সূত্রে 'শ্রী ভগবান উবাচা : "কালি স্মী লোকক্ষয়াকৃত প্রবৃদ্ধি; লোকান সমাহারতীম ইহা প্রবৃত্ত।" অর্থাৎ শ্রী ভগবান কৃষ্ণ বললেন : "আমিই হচ্ছি সময়, বিশ্ব ধ্বংসকারী। ধরাধামে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, মানবকূল বিলোপ করতে। পাণ্ডবরা ছাড়া দু'পক্ষের সব যোদ্ধারাই হত হবে।"

এখানে কৃষ্ণ সর্বভূক সময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সময়—এটা ধ্বংস, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত সৃষ্টিকূল অবশ্যই অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রকৃতির এই হচ্ছে নিয়ম।

১৯.৩ : ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মার কাল-প্রসরণ নেই

ইহুদী নবী জেরেমিয়া ছিলেন ৬০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের লোক। তিনি একদিন আবিমেলেককে আঙুর নিয়ে আসতে পার্বত্য এলাকায় জমিতে পাঠালেন। জমিতে আবিমেলেকের মাথাটা ঘুরে উঠাতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ভাঙলো। পথে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করেছে ভেবে সে তাড়াতাড়ি জেরুজালেমের দিকে পা বাড়ালো। শহরে এসে মনে হল শহরটা যেন ঠিক আগের মত নয়, বিলকুল বদলে গেছে। তার পরিচিতিদের কাউকে সে খুঁজে পেল না। এক বুড়োকে প্রশ্ন করে জানতে পারল ৬৬ বছর আগে জেরেমিয়াসহ ইহুদীদের সবাইকে বন্দি করে সম্রাট নেবুচাদনজর ব্যবিলনে নিয়ে গেছিলেন। আবিমেলেক ঘুমিয়ে পড়েছিল অথচ কেটে গেছে ইতোবশরে ৬৬ বৎসর। আর তার গাধাটির হাঁড়ও পড়েছিল তার আশে অথচ আঙ্গুরগুলি ছিল টসটসে। ওই কাল-ঘুমে তার কাছে সামান্য সময় অতিবাহিত হলেও পৃথিবীর এত দীর্ঘ সময় পার হলো কিভাবে?

কোরানে রয়েছে এই কাহিনী। কোরানের অন্য কাহিনীতে এশিয়া মাইনর তথা আজকের তুরস্কে "আসহাবে কাহাফের" অধিবাসী সত্যসন্ধানীরা তাদের কুকুরসহ ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল মাত্র ৩০৯ বছর। কি এর ব্যাখ্যা?

জাপানের প্রাচীন কাহিনী "তাঙ্গোফুদোকিতে আছে এমনি এক বিবরণ। জোসা জেলার হেকির এক গ্রামের ছেলে মাছ ধরতে গেল সমুদ্রে। নৌকার দাঁড় বেয়ে ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এক মৎস্য সুন্দরী এসে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে প্রেম নিবেদন করল। তারপর তাকে নিয়ে চোখ বন্ধকরে এক অত্যাশ্চর্য দ্বীপে রাজপ্রাসাদে উঠল। ঝকমকে প্রসাদ থেকে বেরিয়ে এলো সাতটি মেয়ে। তাদের নাম সপ্তকন্যা কৃত্তিকা (Pleiades)। কৃত্তিকা নক্ষত্র পুঞ্জের মূল তারাও সাতটি। এরপর এলো ৮ জন। তাদের নাম রোহিনী (Hyades)। বৃষ রাশির মাথার উপর এদের অবস্থান। মেয়েটার বাপ-মায়ের সঙ্গে পরিচিত হল ছেলেটা। তারা বুঝিয়ে দিলেন পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের তফাৎ। সেই স্বর্গ-সুন্দরীকে বিয়ে করলো সে। তিন বছর কেটে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল গায়ে তার ঘরের কথা, মা-বাবার কথা। স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে চোখ বুজে অল্পক্ষণ পরেই পৌঁছে গেল তার বাড়ির দোরগোড়ায়। বাড়িতে সে কাউকে চিনতে পারলনা। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারল তিনশ বছর পূর্বে একটি ছেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সে

www.pathagar.com

অবাক হলো। স্বর্গের তিন বছরে পৃথিবীতে তিনশ বছর কী করে কাটল সে বুঝে উঠতে পারলোনা কিছুতেই।

কাহিনীটা প্রাচীন পৃথিবীর মানুষের কাল প্রসরণের (time-dilation) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রকম কাহিনী আরও আছে নানা দেশের প্রাচীন কাহিনীতে। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে এমনি অনেক উদাহরণ আছে। একটি বলছি : অনর্তের পুত্র রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশাস্থলী নামে এক নগর বানিয়ে আনর্ত নামের একটা দেশ পালন করতেন। তার পুত্র রৈবতক বককুদমীর একমাত্র কন্যা রেবতীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনি হাজির হলেন মুক্তদ্বার ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোকে তখন গান হচ্ছিল হাহা-হুহু গর্ন্ধবের। কিছুক্ষণ পরে গান শেষ হলো। তিনি ব্রহ্মাকে তার অভিলাষের কথা জানালেন। সে কথা শুনে ব্রহ্মা উচ্চহাস্য করে বললেন, "হেরাজন, পৃথিবীতে তোমার মেয়ের জন্য তুমি পাত্র হিসাবে মনে মনে যাদের নাম ভেবেছ তারা সবাই কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে (এই গান শুনতে শুনতে) ২৭টি চর্তুযুগ কাল (বা ২৭ × ৪৩,২০,০০০ পার্থিব বৎসর) বা ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪০ হাজার বছর? কেটে গেছে। ব্রহ্মার ওখানে গান হয়েছিল মোটে ১৯.৪৪ ব্রহ্ম-মিনিট। বিষ্ণু পুরানেও এই কাহিনী রয়েছে। ব্রহ্মলোকের ঐ ২০ মিনিট পৃথিবীর সাড়ে ১১ কোটি বছরেরও বেশি। একেই বলে কাল-প্রসরণ।

তিব্বতী লামা ধর্মের পবিত্র কথা কাঞ্জুরে লিপিবদ্ধ। আর তাঞ্জুর হলো কাঞ্জুরেরই টীকা। কাঞ্জুরের Collection of the Six Voices গ্রন্থে "দেববাসী' পরিচ্ছেদে রয়েছে এই কথা : মহাবিশ্বে নানা স্বর্গ আছে। সব স্বর্গ সব দেবতার কাছে অবারিত দ্বার নয়। বিভিন্ন স্বর্গের দেবতাদের কাল বিধির পরিমাণও বিভিন্ন রকম। তাদের আয়ুষ্কাল ও বিভিন্ন। আর পার্থিব সময়ের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন এই বিভিন্ন স্বর্গের সময়ের তুলনায়। এই গোলমালের সমাধান একমাত্র কাল-প্রসরণ তত্ত্ব দিয়েই সম্ভব। দেবতাদের স্বর্গ হচ্ছে পৃথিবীর তুলনায় দ্রুততরভাবে গতিশীল কোন গ্রহ বিশেষ। সেগুলি আমাদের বা তার বাইরের কোন গ্যালাক্সিতে থাকতে পারে। আর সবগুলিই পৃথিবীর চেয়ে বেশি গতিবেগসম্পন্ন বলেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটছে কাল-প্রসারণ।

কাঞ্জুর-মতে দেবতাদের কালবিধির তালিকা

	স্বর্গীয় কাল	পার্থিব বৎসর	স্বর্গীয় আয়ুষ্কাল	মানব-বর্ষ
প্রথম স্বর্গে	১ দিন-রাত্রি	৫০	৫০০ বছর	৯ মিলিয়ন
দ্বিতীয় স্বর্গে	"	১০০	১,০০০ "	৩৬ "
তৃতীয় স্বর্গে	"	২০০	২,০০০ "	১৪৪ "
চতুর্থ স্বর্গে	"	৪০০	৪,০০০ "	৫৭৬ "
পঞ্চম স্বর্গে	"	৮০০	৮,০০০ "	২,৩০৪ "
৬ষ্ঠ বা কামনা রাজ্যের শীর্ষে	"	১,৬০০	১৬,০০০ "	৯,২১৬ "

হিসাব করলে দেখা যায় দেবতারা যে লোকে অবস্থান করেন তা আলোর বেগের ৯৯,৯৯৯৬১% গতি সম্পন্ন। এই দেবতাদের এক বৎসর হয় ৩৬০ পার্থিব বৎসরে। এদের পরমায়ু আয়ু ১০০ বছর অর্থাৎ ৩৬০০ মানব-বৎসর। বিষ্ণু পুরাণে রয়েছে পার্থিব

www.pathagar.com

শরীর বিশিষ্ট ধ্রুবকে এমন এক লোকে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আয়ুষ্কাল বেড়ে পুরো একটি ব্রহ্মদিন বা কল্প বা ৪৩২ কোটি পার্থিব বৎসর। সেই ধ্রুবতারা ২৫,৮০০ বছর পরে পরে পৃথিবীর মেরু তারা হয়। ওখানে যেতে প্রায় ৫০ আলোক বর্ষ লেগে যাবে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেহেতু দেবতাদের স্রষ্টা, তাই তিনি যে লোকে অবস্থান করেন (ব্রহ্মলোক) তা বোধ হয় আরও অনেক বেশি বেগে গতিশীল। অর্থাৎ ৩১১ ট্রিলিয়ন মানব বৎসর। মহাপ্রলয় হয় ১০০ ব্রহ্মবৎসর শেষ হলে, কিন্তু নৈমিত্তিক প্রলয় হয় ১ ব্রহ্মদিন শেষ হলে। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার মৃত্যু ঘটে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে তার একটা দিন কাটে। ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাকে এক ভাবলে ভীষণ ভুল করা হবে।

দর্শন বলছে, ঈশ্বরের দেশ-কাল-নিমিত্ত নেই। 'নিমিত্ত' হলো কার্য-কারণ সম্পর্ক। ঈশ্বর মাত্রাহীন। ব্রহ্মের কোনও সময় নেই তাই তার কাল-প্রসারণ ও থাকে না। চৈতন্য বিজড়িত প্রকৃতিই ঈশ্বর। ভারতীয় দর্শন বলছে, ব্রহ্মার মৃত্যু বা লয় হলে তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। তখন কেবল ঈশ্বরই থাকেন, আর কেউ থাকে না। চৈতন্যময় পুরুষ প্রকৃতি বিজড়িত হয়ে একাই অবস্থান করেন। মহাবিশ্ব তখন তাতেই লীন তাকে। এই পুরুষ যেন জল আর প্রকৃতি হল সে জলের তরঙ্গ। দর্শন সৃষ্টি বলে না, বলে বহিঃপ্রক্ষেপ (Projection)। কোনও কিছুর সৃষ্টিও হয় না। ধ্বংসও হয় না, ঘটে নানা রূপান্তর, নানান বহিঃপ্রক্ষেপ।

১৯.৪ : মৃত্যু কোথায়? সময়ের শেষ প্রান্তে?

জীবদেহের শুরু আছে, জন্ম হলে শেষ হবে, মৃত্যু এসে তার কালো ছায়া দিয়ে ঢেকে দেবে দু'নয়ন। জীবকোষের তরঙ্গে প্রাণ শক্তির অতি প্রাচুর্য থাকে। কোথা থেকে এল সেই প্রাণের শক্তি? যে আগুন সৃষ্টির সমুদ্রের গভীরে। মৃত্যু কোথায়? দুঃখ কোথায়? জীবনের পরম সাধনা কি? পৌরুষকে জয়ী করা? না। জীবন আর মৃত্যুর এই রহস্যের শেষ বিন্দুকে জানা। জন্মের পর থেকে ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা। প্রতি মুহূর্তের বিন্দুতে প্রতি অভিজ্ঞতার বিন্দু। একটি মুহূর্ত পার হয়ে গেলে সে আর থাকে না। তাই কি মৃত্যু? না। এক মুহূর্তের ঘটনা পরের মুহূর্তকে জন্ম দিতে পারে। সেই পূর্বের আর পরের মুহূর্ত ঘটনা আর তার কারণ বুঝতে পারে না মানুষের সীমিত বুদ্ধি (ত্রিমাত্রিক দেশের কাঠামোতে আটকানো বলে)। বলে দৈব। বলে আপতিক। ঘটনাকে নিজের ইচ্ছেয় ঘটাতে চায় মানুষ। কখনো অনুকূল হয় পরিবেশ। পূর্ব মুহূর্ত হয় ফলবান। তখন সে তাকে মনে করে পুরুষকার। কখনো প্রতিকূল অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে এই পুরুষকার। কখনো আবার পারে না। ব্যর্থ হয়। তখন সে শোকাহত হয়। বিলাপ করে বলে দৈব, দৈবই সব, মৃত্যুও তার কাছে পরম দৈব। কারণ মৃত্যু কখন হবে, কেন হবে, কিভাবে হবে, কেউ তা পূর্বে জানে না। পুরুষকার দিয়ে প্রতিহত করা যায় না তাকে। জন্ম যার হয় মৃত্যু তার পরিণতি।

শরীর সৃষ্টির পর থেকেই শরীরে চলে গতির চঞ্চলতা। হতে থাকে শরীরের ক্ষয়। পরম তেজের যে শক্তি অন্ন আর বায়ুতে সেই তেজ ক্ষয়ের আগুনকে রক্ষা করে যায়— জলন্ত রেখে যায়। শরীর যজ্ঞের আগুন। সে আগুন একদিন নিভে যায়। অন্ত হয় শরীরে নিহিত প্রাণের। সে আগুন কোথায় যায়? যেখান থেকে তার উৎপত্তি সেই বিশ্বতেজে। এই তেজের শেষ নেই। আরম্ভ নেই। এ জানাই অমৃত। মৃত্যু কী? আত্মার প্রসাদ।

www.pathagar.com

চেতনার অন্ধকার। অ-মৃত্যু কী? চেতনার আলো। যে মুহূর্তে চেতনায় সে আলো জলে ওঠে সে মুহূর্তে চেতনা হয় অমৃত। তখন দৈব আর পুরুষকারের দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ করে না তাকে। থাকে না সার্থকতা আর ব্যর্থতার বোধ। তুমি কে? আমার পুত্র? আমিই তো তুমি। আমি কে? আমার লক্ষ লক্ষ পূর্বের সত্তা। কত লক্ষ কোটি বছর কত শরীরের অগ্নি সে বেয়ে চলেছে কাল থেকে কালে। অনন্ত ভবিষ্যতে। তোমার শৌর্য, বীর্য, বেদনা, অহঙ্কার, ব্যর্থতা সব মিশে আছে সেই অনন্ত আগুনে- সেই মহাজাগতিক ডিম্বে বিগব্যাঙের অপেক্ষায়।

সেই আলো যার শুরু নেই, শেষ নেই। যে আলো সমস্ত আকাশ জুড়ে, যে আলো জগতের বীজ, যে জ্যোতি দিবালোকের মত ছড়িয়ে আছে সব কিছুর পরম কারণ হয়ে। সব অন্ধকার ছাড়িয়ে জ্বলছে সেই জ্যোতি, সেই পরম জ্যোতি পরম আলোকে।

১৯.৫ : সময়ের অনুভূতি আপনার কেমন?

সময় হলো সৃষ্টিকূলের জীবনের একটি ফোটা বা অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত বয়ে চলেছে। কিন্তু এর বহতাগতি বিস্ময়কর এ জন্য যে, এর গতি অতি দ্রুত হলেও জীবনে তার দ্রুত গতির অনুভূতি প্রায়ই হয় না। তবে যখন কোন নতুন ঘটনা জীবনের শান্ত নদীর বুকে ঢেউ তোলে, তখন সময় অতিবাহিত হবার কথা কিছুটা অনুমান করা যায় (দুঃখের হলে সময় দীর্ঘ হয়। সুখের সময় তাড়াতাড়ি বুঝায়)।

কুরআন মজীদের সুরা মায়ারেজ এর পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিনের সময়ের পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছর। আবার সুরা সিজদার পাঁচ নম্বর আয়াতে সেদিনের পরিমাণ বলা হয়েছে এক হাজার বছর। এ পার্থক্যটা হবে লোকদের অবস্থার ভিন্নতার জন্য। যারা কঠিন আযাব ভোগ করবে আদের কাছে কেয়ামতের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তাদের কাছে সময় অতিবাহিত হবে অতি ধীর গতিতে। অন্যদিকে যাদের আজাব হবে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাদের নিকট দিনটি হবে এক হাজার বছরের সমান।

এক বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল—দুনিয়ার জীবন আপনার কাছে কেমন লাগলো? তিনি বললেন—জীবন আমার কাছে মনে হয়েছে দু'দরজার মাঝখানের সময়। একটি দিয়ে প্রবেশ করতেই অন্যটি দিয়ে বের হয়ে আসতে হলো।

প্রিয় পাঠক; সময়ের জ্ঞান' সম্পর্কিত বেশ কিছু কথা, বাণী বা আয়াত আমাদের কোরআন শরীফে রয়েছে। যেমন : সুরা বাকারায় ২ পারা ২৪ রুকু ১৮৯ আয়াতে, সুরা আনয়াম (৭(১২) : ৯৬), সুরা ইউনুস (১১(১) : ৫), সুরা রাদ (১৩(১) : ২), সুরা বাণী ইসরাইল (১৫(২) : ১২), সুরা রহমান (২৭(১) : ৫) ইত্যাদি।

আর সুরা মোমিনুন (১৮(৬) : ১১২) এ আল্লাহ বলেন : এই দুনিয়ায় মানুষের অবস্থানকাল অতি অল্প ব্যতীত নহে।'

তাই আসুন এই **অত্যল্পকালে আমরা সময়ের রহস্য সম্পর্কে জেনে যাই, সময়ের মূল্য দিয়ে যাই** (তাহলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি হবে), **যাবার আগে বরাবরের মত জীবনের মূল্য চুকিয়ে যাই।**

স্মরণ করছি সেই গল্পটি।

মৃত্যুশয্যায় ইরানের সম্রাট মালিকশাহ তার দরবারের পণ্ডিত ওমর খৈয়ামকে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে, বিশ্ব বছর রাজত্ব করেও তিনি পৃথিবীর ইতিহাসটা পড়ে

www.pathagar.com

যাবার সময় করে ওঠতে পারলেন না। জ্ঞানী খৈয়াম শাহানশাহকে বল্লেন, সে আপনি জেনে গেছেন হুজুর। পৃথিবীর ইতিহাসটা সংক্ষেপে হলো এই যে, পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নিয়েছে, কিছু কাল এখানে রঙ্গ-তামাসায় কাটিয়েছে, বংশ রক্ষার্থে বিয়ে করেছে, সংসার পালন করতে যেয়ে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারপর একদিন মারা গেছে।

শেষ কাহিনীটি শোনাবার লোভ সংরক্ষণ করতে পারছিনা।

আল-বেরুণীর শেষ সময় এসে গেছে। তখন তার মৃত্যুযন্ত্রণা চলছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল। শরীর নিস্তেজ হয়ে গেছে। জীবনের আটাত্তর বছর অতিক্রমকারী জ্ঞানের পিপাসু এমতাবস্থায়ই প্রশ্ন করলেন শিয়রে অবস্থানরত আবুল হাসান আলী ইবনে ইসাকে—আপনি একদিন নানীর মিরাসের মাছালাটি কেমন বলেছিলেন? আলী ইবনে ইসা বললেন, আপনার এই কষ্টের সময়ও বলবো? আল বেরুণী জবাব দিলেন : নশ্বর দুনিয়া থেকে এ বিষয়ে অজ্ঞ অবস্থায় চলে যাওয়ার চেয়ে মাছালাটির জ্ঞান নিয়ে যাওয়া কি উত্তম নয়?

উপসংহার

সময়ের অসমাপ্ত কাহিনী

সময়ের শুরু নেই, শেষও নেই। হাজার হাজার বছর ধরে কবি, শিল্পী, ভাবুক দার্শনিকেরা এ নিয়ে ভেবেছেন যথেষ্ট, প্রকাশ করেছেন তাদের মনোভাব। তিনশ বছর আগে সময়কে বলা হল এটা 'প্রদত্ত ধারণা', এর বিষয়গত অস্তিত্ব নেই।

১৯০৫ সালে দার্শনিকদের হাত থেকে সময়কে পদার্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলে এনে বসিয়ে দিলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। এই শতাব্দী শেষ হয়ে এল। সময় এখন ভৌত বস্তু, যার চলার সূত্র আছে। সমীকরণ ও আছে এবং যাকে নিয়ে পরীক্ষণও করা যায়।

সময় সম্পর্কে আমরা গত শত বৎসরে অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। এত জানার পরও দেখা গেল সময়ের রহস্যের সমাধান থেকে আমরা এখনও অনেক দূরেই রয়ে গেছি।

সময়ের অসমাপ্ত কাহিনীর পথে জবাব না পাওয়া প্রশ্নগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করব আমাদের ভাবীকালের বংশধরদের জন্য। একবিংশ শতকে তারা এগুলি সমাধান করবে—এগিয়ে যাবে মহাকাশের আরো গভীরে। সময়কে ধরে ফেলে তার রথে চড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্কর লাগাবে মুহূর্তে পরাগতিতে-যে গতিতে সময় সর্বত্র স্থির-ব্যক্তিমানস সর্বত্র একই সময়ে উপস্থিত।

সময়ের অসমাধানকৃত সমস্যাগুলি হচ্ছে :

১. ট্যাকিয়ন

দেখা পাব কি স্রষ্টার মানস গতিকনার? আলোর গতির শেষপ্রান্তের ওপারে ট্যাকিয়নদের দেখতে পারা যাবে কি? আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রে এদের মেনে নেয়া হলেও বাস্তবে এদের আচরণ কেমন হবে? আমরা কি ট্যাকিয়ন যানে চড়ে অতীতে চলে যেতে পারব? কার্য-কারণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে কি? টাইম ট্রাভেল সম্ভব হবে কি?

www.pathagar.com

২. কৃষ্ণ বিবর

জ্যান্ত ধরা চাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্রে ও অন্যান্যস্থানে বহু কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। এখন দরকার প্রত্যক্ষ প্রমাণের। সত্যি কি এদের গহ্বরের অনন্য বিন্দুতে সময় হারিয়ে যায় চিরতরে? ব্ল্যাকহোল কি সুড়ঙ্গ বা পুল দিয়ে অন্য বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সময়কে ফাঁকি দিয়ে? ওয়র্মহোলে বস্তু আপতিত হলে কি ঘটে তখন? শ্বেত বিবর আছে কি?

৩. কোয়ান্টাম জটিলতা

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় সময় অদ্ভূত আচরণ করে, বিশেষ সমীক্ষণে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তায় ফেলে দেয়। সময় এখানে অখণ্ড, নিরবিচ্ছিন্ন নয়, খন্ড খন্ড মাত্র। যুগপৎ পর্যবেক্ষণের বেলায় সময়ের পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেননা ঘড়িগুলো হচ্ছে ভৌতিক বস্তু যা কোয়ান্টাম ফাজীনেস বা অস্পষ্টতার দরুন আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৪. সময় কি কোনকিছুর ধ্বংসাবশেষ?

সমস্যাটা দাড়ায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময়। তখন স্থান-কাল সম্মিলনটা কোয়ান্টাম অস্পষ্টতায় চলে আসে। দরকার হয়ে পড়ে "মাস্টার" টাইমের, এমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পরিমাপকের অন্যথায় সময়কে পুরোপুরি উড়িয়ে দেবার। সময়কে পর পারে পাঠিয়ে দেবার চিন্তা অনেক বিজ্ঞানীই সইতে পারেন না। শেষ কি এমন হবে যে হাজার হাজার বছর পর আমরা এখন বুঝতে পারব সময়ের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই? সময় কি বিগব্যাঙের সময় থেকেই কোনো কোয়ান্টাম অবস্থার ফেলে দেয়া অবশিষ্টাংশ ধ্বংসাবশেষ?

৫. সময়ের উৎস?

সময় কি বিগব্যাঙের সাথে দেশের (স্থান) সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে? তাহলে কেন এর জন্ম হয়েছিল? ঈশ্বর এবং অনন্তকালের ধারণাটি কি? বিগব্যাঙের পূর্বেও সময় বহমান থাকলে আমাদেরকে তা প্রমাণিত করতে হবে। কি ভৌতিক প্রক্রিয়াগুলি এর উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত? মহাবিশ্ব যদি চিরকালই বর্তমান তাহলে সময়ের তীরের ও কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে বিগব্যাঙের সঙ্গেই সময়ের শুরু হয়ে থাকলে এর ধারণাকি স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক। এটি অনন্য ব্যাপার না হলে অসংখ্য মহাবিশ্বের ধারণার সঙ্গে সীমাহীন সময়ের কথা তখন চলে আসে।

৬. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত?

হাবল ধ্রুবক সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেলে মহাবিশ্বের বয়স এখনকার ১৩-১৪ বিলিয়ন বৎসর থেকে বেড়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। তখন নতুন প্রশ্ন এসে যাবে। আসলে সত্যিই এই মহাবিশ্বের বয়স কত? এ রকম আরও অসংখ্য মহাবিশ্ব আছে কি? শুরুর আগে কি ছিল?

www.pathagar.com

৭. আইনস্টাইনের থিয়োরীর বাইরে অন্য থিয়োরী

সময়ের ব্যাপারে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমন্বয়ের অপেক্ষায় আছেন বিজ্ঞানীরা। তবু সন্দেহ থেকে যায় এর সম্মিলনের ফলে কি "সব কিছুর থিয়োরী" আমরা পেয়ে যাব যার সাহায্যে দেশকাল অন্যান্য কিছু পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যাবে? তাই মনে হচ্ছে বিকল্প অন্য থিয়োরী দ্বারা একাধিক সময়ের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৮. সময়ের তীর

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শুরু এবং শেষের সঙ্গে জড়িত সময়ের তীর বিষয়টি। দেশ-কালে সময়ের তীর এখন একমুখী। হয়ত কোন স্থানে তা বিপরীতমুখী? পুরো মহাবিশ্ব সময়-প্রতিসম (time-asymmetric) বা সময়ের চক্রে আবদ্ধ থাকতে পারে। এ ব্যাপারে গবেষনা চলতে পারে। বেহেস্তে সময় স্থির হয়ে পড়বে কেমনে? সমীকরণে মিললেও পরীক্ষাগারে তা দেখতে পারা চাই।

Kaon বা ক্যাওনরা "সময়ের বিপরীতমুখীনতা প্রতিসাম্য" ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। নিউট্রনে ইলেকট্রিক ডিপোলমোমেন্ট খুঁজে পাওয়া দরকার। এর সঙ্গে সময়ের তীরের কি সম্পর্ক, কিভাবে এরা অতীত ভবিষ্যত সিমেট্রিত্র ভেঙ্গে ফেলে।

৯. আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল টার্ম (লাম্বডা) এর পরীক্ষা

এখন সন্দেহ হচ্ছে আইনস্টাইনের "স্বীকৃত ভুল" লাম্বডার ভেতর কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। মহাজাগতিক ধ্রুবকটি কি সত্যিই "শূন্য" না এর কিছু মান রয়েছে। থাকলে পর এটি এন্টিগ্র্যাভিটি প্রকাশ করবে, বিশ্বকে অস্থির করে তুলবে মাধ্যাকর্ষণের টানা হ্যাছড়ার মধ্যে। বিশ্ব কি চিরকাল প্রসারিত হবে (ধ্রুবকের মান শূন্য হলে) নাকি সংকোচিত হয়ে আসবে (কিছু মান থাকলে), এ প্রশ্নটার সমাধান দরকার। কোরান বলে বিশ্ব সংকোচিত হবে। এখন মহাবিশ্ব প্রসরণশীল, তবে যে সব দিকেই একই রকম তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। হয়তো মহাবিশ্ব বিভিন্ন শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। সে রকম একটি শাখায় আমাদের অবস্থান। এ শাখা থেকে আমাদের পক্ষে মহাবিশ্বের অন্যান্য শাখা দেখা সম্ভব নয়।

১০. সময়ের প্রবাহ : মন নাকি বস্তু?

ভৌত সময় আর মানসিক সময়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অনুভূতিতে সময় বিভিন্ন হয়। মস্তিষ্কের কোথায়ও সময় কি শুরু হয় ধারণায়? এটা কি বস্তুনিরপেক্ষভাবেই সেখানে টিকে থাকে? নাকি মনের খামখেয়ালীর অংশ সময়। আলোর কণিকার মত তরঙ্গ এবং কণার দ্বৈত রূপে বিরাজিছে কি মহাকাল? এ প্রশ্নটার সমাধান দরকার।

www.pathagar.com

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

১. আইনস্টাইনের বিশ্ব; নিগেল ক্যালডার; অনু : ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত, বেষ্টবুকস, ১৯১৪, ১৪৩ পৃ:
২. আপেক্ষিকতা তত্ত্ব; রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পবরাপুপ)
৩. স্থান কাল মহাকর্ষ ও অপেক্ষাবাদ; বিশ্বরঞ্জন নাগ, পবরাপুপ, ১৯৯৬, ১৩৬ পৃ :
৪. দেশকাল ও আপেক্ষিকতা; সাধন দাশগুপ্ত, ঈস্টার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৮৪, ১৫১ পৃ:
৫. অপেক্ষাবাদের অআকখ; বার্ট্রাণ্ড রাসেল; অনুঃ শক্রজিত দাশগুপ্ত, বাউলমন, ১৯৯৪, ১৩৬ পৃ.
৬. কালের ইতিবৃত্ত; স্টিফেন হকিং; অনু; প্রণব দাশগুপ্ত, স্টুডেন্টস ল্যান্ড, ১৯৯৭, ১৬৭ পৃ:
৭ কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; স্টিফেন হকিং; অনু : শক্রজিত দাশগুপ্ত, বাউলমন, ১৯৯৩, ২০১ পৃ:
৮. কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা; স্টিফেন হকিং, অনু : শক্রজিত দাশগুপ্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৫, ১৬৭ পৃ:
৯. অপেক্ষাবাদ; অ্যালবার্ট আইস্টাইন; অনু : শক্রজিত দাশগুপ্ত
১০. সময়ের বিচিত্র কথা; হ্যারী জার্চি; অনু : বেলায়েত হোসেন, বুক সিন্ডিকেট, ১৯৬৩, ১২০ পৃ.
১১. ঘড়ির কাহিনী; সৈয়দ নজমুল আবদাল, মুক্তধারা, ১৯৮৫ , ৫৯ পৃ:
১২. আপেক্ষিক তত্ত্বের সহজ পরিচয়; জেমস্ কোলম্যান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, ১০৮ পৃ:
১৩. আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতত্ত্ব; হারুন অর রশীদ, বা. এ. ১৯৮৪, ১৩১ পৃ:
১৪. কৃষ্ণ বিবর; জামাল নজরুল, বা. এ. ১৯৮৫, ৭৯ পৃ:
১৫. রিলেটিভিটির মজা ও আশ্চর্য সায়েন্স ফ্যান্টাসী; পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাব. ১৯৯১, ১২১ পৃ:
১৬. মহাসময়ের ইতিবৃত্ত; প্রশান্ত প্রামানিক; দেজ পাব, ১৯৯৩, ৩২০ পৃ:
১৭. অভিযাত্রা শূন্য সময়ে; আহমেদ শিবলী নোমান; দিনরাত্রি প্রকাশনী, ১৯৯৮, ১১২ পৃ:
১৮. সময়ের মূল্য ও জীবন সাধনা; মাওলানা লিয়াকত আলী; আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮, ১২৭ পৃ:
১৯. বিশ্ব ও সৌরজগত; আব্দুল জব্বার, বুয়েট, ১৯৮৬, ২৬৬ পৃ:
২০. মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ; শঙ্কর চক্রবর্তী, ১৯৮০, ২১০ পৃ:
২১. মহাবিশ্বে ভ্রমণ; জয়ন্ত নারলিকার; ১৯৯৫, ৬২ পৃ:
২২. জিজ্ঞাসা : বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে বৃহৎ সঙ্কোচন; সহিদুর রহমান, ১৯৯৮, ১৩৪ পৃ:
২৩. আকাশ ও পৃথিবী; মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ; ১৯৯৮, ৪০০ পৃ:
২৪. নক্ষত্র-নীহারিকার রোমাঞ্চলোকে; গৌরী প্রসাদ ঘোষ; বাউলমন, ১৯৯৮, ১২৪ পৃ:
২৫. বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষ : আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা; পার্থ ঘোষ; থীমা, ১৯৯২, ১১৮ পৃ:
২৬. আণবিক বিজ্ঞান ও প্রাচী অতীন্দ্রিয়বাদ; ফ্রিটজফ কাপরার টাও অফ ফিজিক্স; অনুবাদ : হরিপদ চক্রবর্তী, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৮, ১৭৬ পৃ:
২৭. পদার্থবিদ্যার বিবর্তন; আইনস্টাইন এবং লিওপোল্ড ইনফেল্ড; অনু : শক্রজিত দাশগুপ্ত, বাউলমন, ১৯৯১, ২৭২ পৃ:
২৮. বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব; শঙ্কর সেনগুপ্ত, বেষ্টবুক্স; ১৯৯৮, ২৪৩ পৃ:
২৯. বাংলা বিশ্বকোষ, (৪র্থ খণ্ড) ফ্রাঙ্কলিন পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৯৭৬, ৮৫০ পৃ:
৩০. ভারত কোষ (৫ম খণ্ড); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; কলকাতা, ১৯৭৩, ৬৮৪ পৃ:
31. Physics in the 20th century : Curt Suplee; Abrams, P–5 32, ISBN 081 0943646
32. About Time : Paul Davies; Penguin, 1995, 316 pp.
33. Time in History : G. J. Whitrow; Oxford, 1989, 217 pp.
34. Wher Time Began : Zecharia Sitchin, 1993, 410 pp.
35. Beyond The Time Barrier : Andrew Tomas; Compton Russell, 1974, 160 pp.
36. The Arrow of Time : Peter Coveney & Roger Highfield; Flamingo, 1991, 378 pp.
37. Time's Arrows : R. Morris; Touchstone Bks; 1986. 239 pp.
38. Parallel Universes : Fred Alan Woef; Paladin; 1991. 351 pp.
39. The Nature of Time : R Flood & M. Lockwood, Basil Black well; 1987. 187 pp.
40. The Enigma of Time : P. T. Landsberg; Adam Hilger; 1982. 239

www.pathagar.com

41. Time : S. A. Goudsmit: Time-Life Books; 1969, 200 pp.
42. Eaternal God : A Study of God Without Time: Paul Helm, Clarendon Pr. 1988. 230 pp.
43. Time Journeys : Paul Halpern; Mcgraw-Hill, 1990. 154 pp.
44. Time : A Trevelle's Guide: Clifford Pickover: Oxford; 1998, 282 pp.
45. Nature of Space & Time : Stephen Hawking & Roger Penrose: Oxford. 1997. 150 pp.
46. Brief History of Time : Stephen Hawking, Bantam: 1988, 212 pp.
47. The Myth of the Eternal Return : Eliade M.. Routledge & Kegan Paul.
48. The Emperor's New Mind : Roger Penrose. Vintage. 1990. 602 pp.
49. Shadows of the Mind : Roger Penrose: Vintage, 1995. 460 pp.
50. The Life of the Cosmos : Lee Smolin: Oxford. 1997. 358 pp.
51. The Fire in the Equations : Science. Religion & the Search for God: Kitty Ferguson. Bantam. 1994. 320 pp.
52. Impossiblity : The Limits of Science : John Barrow, Vintage, 1998. 280 pp.
53. The God Particle : Leon Lederman: Delta, 1993. 434 pp.
54. Cosmos : Carl Sagan. Ballantire BKs. 1980. 324 pp.
55. Cosmic Coincidences : John Gribbin. Black Swan. 1991, 302 pp.
56. In Search of Schrodingers Cat John Gribbin Black Swan. 1991. 302 pp.
57. In Search of the Big Bang : J. Gribbin. Corgi Bks. 1991. 413 pp.
58. The Big Bang Never Happened : Eric Lerner. Vintage. 1992. 466 pp.
59. The World within the World : John Barrow. Oxford. 1988. 398 pp.
60. The Cosmic Code : Pagels H, Simon Schuster. 1982. 333 pp.
61. Space & Time in the Modern Universe Paul Davies. Cambridge. 1977.
62. Stardom : P. Davies: Fontana. 1978. 220 pp.
63. God and the New Physics : P. Davies. Dent & Sons: 1983. 255 pp.
64. The Mind of God : P. Davies. Penguin. 1992. 255 pp.
65. The Edge of Infinity : ibid. Dent & Sons. 1981. 195 pp.
66. Other Worlds : ibid, Dent & Son. 1980. 207 pp.
67. The Cosmic Blueprint: ibid: Simon & Schuster. 1988. 223 pp.
68. The Matter Myth: ibid & Gribbin J: Penguin. 1991. 313 pp.
69. The Accidental Universe: ibid: Cambridge. 1982. 139 pp.
70. Mind. Brain & the Quantum : Michael Lockwood. Basil Black well. 1991, 370 pp.
71. Superforce : Paul Davies : Penguin. 1995.
72. Superstrings : A Theory of Everything. 1988.
73. Nine Tommorrows : Issac Asimov.
74. Universe. Life & Intelligence : I Sklovsky (Russian). 1980.
75. Encyclopedia Britannica. Vol. 19. (1980). pp. 410-421
76. Bio-rhythm for Health Design : Tatai H. Iapan Pub. 1977. 160pp.
77. This Fascinating Astronomy : V. N. Komarov. Mir. 1985.
78. Metaphysics : Richard Taylor: Prentice-Hall. 1992. 150 pp.
79. Meditation Oneness and Physics : Glen P. Kezwer. 1997. 192 pp.
80. National Geographic : Enigma of Time. Vol. 177. No. 3. March 1990. 109-132 pp.
81. Concepts of Time : Ancient & Modern (Proceeddings) : ed. by Kapila Batsyayan. Indira Gandhi National Centre for the Arts: Sterling Pub. 1996. 562 pp.

www.pathagar.com

82. Science in the Quran (3 Vols) : Akbar Ali, 1972-1976. Malik lib.
83. Scientific Indications in the Holy Quran : Islamic Foundation, 1990; 572 pp.
84. Doomsday and Life After Death : Bashiruddin Mahmood, Pakistan, 1991.
85. In the Light of the universe : Meraj (space travel to meet God in Heaven & Science): 1993. 160 pp.
86. Essays on Islamic Topics (Science & Quran) : Ebrahim Kazim, Trinidad, 1993. 151 pp.
87. The Physics of Immortality : Frank Tipler, Anchor Bks, 1994, London.
88. Mechanics of the Doomsday and Life after Death : Bashiruddin Mahmood. Delhi. 1997, 180 pp.
89. Verses from the Holy Quran and the Facts of Science : Haluk Nurbaki; Turkish Foundation for Religion, 1998, 392 pp.
90. Man and Universe : Zakaria Kamal, BIIT, 1998, 224 pp.
91. God. Universe and Man : The Holy Quran and Hereafter : Fateullah Khan, Pakistan, 1999, 284 pp.
92. Quran, Sicence & Muslim : Prof. A Salam, Unesco.
93. Quranic Sciences : Afzalur Rahman. Muslim Trust London, 1981, 332 pp.
94. The Holy Quran and the Science of Nature : Mehdi Golshani, Tehran, 1986. pp 204.
95. Phenomena of Nature and the Quran : S. A. Wadud; 1971. 252 pp.
96. The Physics of Star Trek : Lawrence Krauss; Harper Coleins. 1995.
97. Beyond Star Trek : ibid; Basic Bks. 1997.
98. More Physics of Star Trek : ibid, 1998.
99. The Meaning of Star Trek : Thomas Richards; Doubleday, 1997.
100. The Metaphysics of Star Trek : Richard Hanley; Basic Bks, 1997.
101. Story of the Origin and Destiny of Man : Edgar Cayce (Lytle Robinson) Berkley pub, 1972, 224 pp.
102. Edgar Cayce : The Sleeping Prophet : Jess Stearn, 1971, 287 pp.
103. The Third Eye : Lobsang Rampa, Corgi, 1966. 250 pp.
104. Beyond the Tenth : ibid. 1974, 157 pp.
105. Chapters of Life : ibid, 1976, 223 pp.
106. You Forever : ibid. 1975, 220 pp.
107. Life beyond Planet Earth : Janet Bord, 1992, 240 pp.
108. Vanga : The Seer & Occult : Krasimir Stoyanova (Bulgaria), 1990. 87 pp.
109. Is there Life after Death : Robert Kastenbaum, 1995, 288 pp.
110. Life after Life : Raymond Modi, 1991, 160 pp.
111. Life after Death : Neville Randall, 1989, 188 pp.
112. Tibetan Book of the Dead : Evans-Wenlz, 1990, 250 pp.
113. After Life : Colin Wilson, 1988, 301 pp.
114. Afterdeath Experience : Ian Wilson. 1987, 235 pp.
115. The Quran Inteperted : Arthur Arberry, 1983, 684 pp.
116. The Meaning of the Glorious Koran : M. Pickthal. 1990. 436 pp.
117. The Demon-haunted World : Carl Sagan. 1998. 436 pp.
118. Biological Clocks : John Brady. 1979. 60 pp.
119. Science. Prophecy & Prediction : Richard Lewinson. 1961, 320 pp.

www.pathagar.com

120. Chaos : James Gleick, 1991, 352 pp.
121. Chaos : A New Science : New Scientist, 1993, 110 pp.
122. Muslim Philosophy : Saidur Rahman, 1979, 300 pp.
123. Srimadvagavad Gita : As it is : Sripadvaktivedanta, 1981, 800 pp.
124. Encyclopedia of Religion : Mircea Eliade (ed.) 1987, 16 vols.
125. The Wisdom of the Overself : Dr. Paul Brunton, 1983, 276 pp.
126. The Frst Three Minutes : Steven Weinberg, 1979, 200 pp.
127. The Last Three Minutes : Paul Davies, Weidenteld & Nicolson, Basic Bks, 1994.
128. New Scientist : Science Jounal, England, 1983-1999.
129. Scientific American : Sc. Journal, USA, 1983-1999.
130. Nature : Science Journal, UK, 1983-1999.

Recommended Literatures

1. Spacetime Physics : Taylor, E & J. Wheeler, Freeman NY, 1992.
2. Time Machines : Nahin P. Woodbury; 1993. (Am. Inst. Phys, NY).
3. Real Time : Mellor H; Cambridge, 1981
4. Faster Than Light : Herbert N., Plume, 1988
5. Time travel and other mathematical bewilderments; Gardner M; Frceman; 1988.
6. Space-Time and Beyond : Fred Alan Wolf & Bob Toben; Bantam, 1983.
7. The Anthropic Cosmological Principle : Barrow J. Tipler F. Oxford, 1986.
8. Time out of Mind : Boulle P; Signet Bks. 1966
9. The Intelligent Universe : Hoyle. Fred; Holt. Rinehart & Winston, 1983.
10. Empires of Time : Aveni A; Basic Bks. 1989.
11. The Concepts of Spacc & Time : Capek M. ed. Reidel, Dordrecht, 1976.
12. The Genesis and Evolution of Time Fraser J. T; Univ. Massachusetts Press, Amherst, 1982.
13. Time : The Familiar Stranger : Fraser J. T. Tempus, 1987.
14. The Voices of Time, ed. Fraser J. T. Brazilier, 1966.
15. The Philosophy of Time : Gale R. M. ed. Macmillan, 1968.
16. The Nature of Time : Gold T. ed., Cornell Univ., 1967.
17. Time's Arrow, Time's cycle : Gould S. J. Penguin, 1988.
18. Time warps : Gribbin J. Delacorte, 1979.
19. Philosophical Problems in Space and Time : Grunbaum A : Knopf, 1963.
20. Physical Origins of Time Asymmetry Halliwell J J, etc. eds, Cambridge, 1994.
21. Black Holes : Luminet J. P; Cambridge; 1992.
22. God and Timelessness : Pike N. Routledge & Kegan Paul, 1970.
23. Man and Time : Priestley J. B.; Aldus Bks. 1964.
24. From Being to Becoming : Prigogine I., Freeman, 1980.
25. The Direction of Time : Reichenbach H. Univ. California, 1956.
26. The Physics of Time Reversal : Sachs R., Univ. Chicago Pr. 1987.
27. On Time : Shallis M. Schocken, NY, 1983.
28. Problems of Space and Time : Smart JJC. ed. Macmillan, 1964.
29. Black Hoees & Time Warps : Thorne K. S. Norton, 1994.

www.pathagar.com

30. Space, Time & Gravity : Wald R. M. Univ. Chicago Pr. 1977.
31. Frontiers of Time : Wheeler J. A., North Holland, 1979.
32. What is Time? Whitrow G. J., Thames & Hudson, 1972.
33. The Natural Philosophy of Time : Whitrow G. J., Oxford, 1980.
34. The Timing of Biological Clocks : Winfree A, Freeman, 1987.
35. The Timelessness of God : Yates J. C. Univ. Pr. Amer. Lanham, Md. 1990.
36. The Physical Basis of the Direction of Time : Zeh H. D. Springer Verlag, Berlin, 1989.
37. The Abyss of Time : Albritton Claude; Freeman, Cooper & Co, 1980.
38. The Triumph of Time : Buckley J. H. Cambridge, 1966.
39. Four Views of Time in Ancient Philosophy : Callahan J. F. Greenwood press, 1979.
40. Man and Time : Campbell, Joseph, ed. Princeton Univ. Pr. 1983.
41. Clocks & Culture : Cipolla. Carlo; Walker, 1967.
42. The Firmament of Time : Eisley, Loren; Atheneum NY. 1980.
43. The Psychology of Time : Fraisse Paul; Harper & Row, 1963.
44. Of Time, Passion and Knowledge : Fraser J. T. Braziller. 1975.
45. The Philosophy of Time : Gale, Richard : Macmillan, 1968 500 pp.
46. Time, Work a Culture in the Middle Ages : Le Goff, Jacques, Univ. Chicago Pr. 1982.
47. Time in Literature : Meyerhoff, Hans : Univ. California, 1955.
48. The Philosophy of Spacc & Time : Reichenbach Hans. Dover, 1957.
49. Space, Time & Space-Time : Sklar Lawrence. Univ. California, 1977.
50. The Discovery of Time : Toulmin Stephen & Goodfield June, Univ Chicago Pr. 1982.
51. The Philosophy of Time : Freeman E & Sellars N., Open Court, La Salle, 1971.
52. A Treatise on Time & Space : Lucas John; Methuen, 1973.
53. An Introduction to the Philosophy of Time & Space : Van Fraasen, Bas C. Random House, 1970.
54. Space and Time : Swinburne R. G. Macmillan. 1969.
55. The Structure of Time : Newton-Smith: Routledge & Kegan Paul. 1980.
56. Space. Time and Causality : Lucas, John. Oxford. 1984.
57. Time and Space Traveller : Marder L, George Allen & Unwin, 1971.
58. The Seeds of Time : Wyndham John, Penguin, 1969.
59. Timescape : Benford Gregory; Pocket Bks, 1981.
60. Space & Time : Bore Emile : Dover, 1080.
61. Time's Arrow and Evolution : Blum, H. F. Harper, 1961.
62. The Physiological Clock : Bunning Erwin. Academic. 1964.
63. Time and the Physical World : Schlegel Richard; Michigan State. 1961.
64. Man. Time and Society : Moore Wilbert. John Wiley & Sons. 1963.
65. Time and its Mysteries : Shapley. H. et. al. Collier. 1962.
66. Three Concepts of Time : KG Denbigh: Springer. 1981.
67. The Study of Time : Vol. 1-3: Fraser J. T. et. al. (ed). Springer 1970-78.

www.pathagar.com

68. The Book of Time : C. Wilson (ed.) Westbridge Bks. 1980.
69. Creation and the World of Science : AR Peacocke. Oxford. 1979.
70. The Sciences and Theology in the 20th Century : Peacocke. Stock field. Oriel Pr. 1981.
71. Cosmology. history and Theology : Yourgrau W. & AD Breck (ed.) Ptenum Pr. NY. 1977.
72. Empires of Time : Calendars. ciocks and Cultures : Aveni, A. Basic Bks. 1989.
73. Time, The Familiar Stranger : Frasen J. Tempus, 1957.
74. Asymmetries in Time : Horwich P. Cambridge. 1987.
75. The Anthropic Principle : Bertola. F. and Curi V. (eds.). Cambridge. 1989.
76. The Physics of Time Reversal : Sachs R. Univ Chicago Pr. 1987.
77. The Blind Watchmaker : Dawkins R. Longman. 1986.
78. From Clocks to Chaos : The Rhythm of Life : Glass L. & Mackey M. Princeton Univ Pr. 1988.
79. God and the New Biology : Peacocke A. Dent. 1986.
80. The Geometry of Biological Time : Winfree A. Springer. 1980.
81. When Time Breaks Down : Winfree A., Prrincetion Univ Pr. 1988.
82. Biological Clocks : Their Functions in Nature : Cloudsley Thompson, Weidenfeld & Nicolson. 1980.
83. The Child's Conception of Time : J. Piaget. tr. A. J. Pomerans, Routledge & Kegan Paul. 1969.
84. The Personal Experience of Time : AE Wessmann & B. S. Gorman, Plenum Pr. 1977.
85. Time & Mankind : SGF Brandon. Hutchinson. 1951.
86. Time and its Mysteries : J. H. Breasted. NewYork Univ. Pr. 1936.
87. Political Philosophy of Time : J. G. Gunnell: Wesleyan Univ. Pr. 1968.
88. Christ and Time : O. Cullmann. trans. F. V. Filson. London. SCM, 1951.
89. The Concept of Time in Late Neoplatonism : S. Sambursky and S. Pines. Israel Acad. Sci. 1971.
90. Man and Time : Papers from the Eranos Yearbooks : Routlodge & Kegan Paul. 1985.
91. Time in French Life & thought : R. Glasser. trans. C. G. Pearson. Manchester Univ. 1972.
92. Medieval Reckonings of Time : R. L. Poole. London : SPCK. 1918.
93. The Renaissance Discovery of Time : F J. Quinones. Cambridge, 1973.
94. A Study of Time in Indian Philosophy : A. N. Balslev. atto Harruasswitz. Wiesbaden. 1983.
95. Time and Eastern Man : J. Needham (Heury Myers Lecture) (London : Royal Anthropological Insfifut. 1965). Occsional Paper no. 21.
96. Time and Reality in the thought of the Maya : M. Leon Portilla; trans. C.L. Boiles and F. Horcasitas (Bostin : Beacon Press) : 1973.
97. Time in Rousseau and Kant. M. J. Temmer. Droz : Minard. 1958.
98. The Culture of Time and Space : 1880-1918 : S. Kern: Weidenfeld & Nicolson 1983.
99. Studies in Human Time : G. Poulet Trans. E. Coleman. Harper. 1959.

www.pathagar.com

100. Theories of Everything : John Barrow. Vintage. 1995. P-S 7.
101. World Enough and Space-Time : John Earman, Cambridge, 1989.
102. Before the Begining : Cosmology Explained : George Ellis, Borealean Press. 1993.
103. In the Begining : After COBE and before the Big Bang : John Gribbin. Little Brown. NY. 1993.
104. Ages of Gaia : James Lovelock; W. W. Norton. 1988.
105. A Brief History of Eternity : Peacock RE: Monarch Pub. 1989.
106. Time, Space and Philosophy : Ray, Christopher, Routudge. 1991.
107. A Journey into Gravity and Spacetime : Wheeler, John A. Freeman. 1990.
108. Beyond Einstein : Kaku Michio: Bantam, 1987.
109. Black holes and warped Space-Time : Kaufmann, Freeman, 1979.
110. Perfect Symmetry : Search for Begining of Time : Pagels H. Bantam. 1985.
111. This Time : Anthony Barnett, Vintage. 1998.
112. The End of Time : Domian Thompson: Vintage. 1998.
113. Order out of Chaos : Prigogine Ilya. Bantam. 1984.
114. The Ash Wednessday Supper : Bruno G. tr. Stanley Jaki. Morton. 1975.
115. Time, Creation and the Conticnuum : Sorabji R. Duckworth. 1983.
116. The Fabric of Reality : David Deutsch: Penguin. 1998.
117. Times Arrow and Archimedis Point Huw Price. Oxford. 1996.
118. The River of Time : Igor D. Novikov. Cambridge. 1998. 298 pp.
119. Prisons of Light–Blackholes : Kitty Ferguson, 1998. 224 pp.
120. Time and Space : John & Marry Gribbin.
121. Belief in God in an Age of Science : John Polkinghorne, Yale Univ. Pr, 1999. 160 pp.
122. The Elegant Universe-Superstrings Hidden Dimensions and the Quest for the Ultimate Theory : Brian Greene, Jonathon Cape. 1999.
123. Einsteins Bridge (Black hole-worm hole) : John Cramer, Avon. 1999.
124. Meaning of It All : Feynman R. Allen Lane. Helix. 1998.
125. Large, Small & Human Mind : Roger Penrose. Cambridge, 1998.
126. The Calendar : David Duncan: Fourth Estate. 1997.
127. Mapping Time : Calendar and Its History : E. G. Richards. 1998. 336 pp.
128. Visions : Michio Kaku: Oxford. 1998. 432 pp.
129. The Last Word (New Scientist) : ed. Mick O'Hare. Oxford. 1998.
130. The End of Time : Julian Barbour: Weidenfeld Nicholson. 1999. P-S. 20.
131. The Five Ages of the Universe : Inside the Physics of Eternity. Fred Adams and Greg Laughlin. Free Press. 1999.
132. A Century in Physics : Philip & Phylis Morrison. Am. Phys. Soc. 1999.
133. How we believe : The Search for God in an age of Science. Michael Sherman. Freeman. 1999.
134. Shapes of Time : Kenneth McNamara. J. Hopkins Uni. Pr. 1999.
135. In Search of Lost Time : Derek York. IOP. 1999.

www.pathagar.com

লেখকের পরবর্তী বই

১। নূর ও আলোর রহস্য
২। মিরাজ ও বিজ্ঞান
৩। কুন-কোয়ান্টাম বিজ্ঞান রহস্য
৪। মজার আপেক্ষিক তত্ত্ব
৫। জাল-ভেজাল-প্রতারণা
৬। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান
৭। অভিনব বিজ্ঞান রহস্য
৮। বিজ্ঞানের ধাঁধা ও হেয়ালি
৯। বিজ্ঞান কোষ (বিজ্ঞান বিশ্বকোষ)
১০। কোরআনে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ
১১। পরিবেশ বিজ্ঞান
১২। মৃত্যু পরবর্তী জীবন
১৩। বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ
১৪। বাঙালির গণিত চর্চা ও শুভঙ্কর
১৫। সুন্দরবন (জীব ও উদ্ভিদ বিচিত্রা)
১৬। বাংলার রাজকীয় বাঘ
১৭। শিয়াল চরিত
১৮। বিপন্ন বাঙালি প্রজাতি
১৯। আবহাওয়া বিভ্রাট
২০। বাংলাদেশের নদ-নদী
২১। মহাপ্রলয়, কোরান ও বিজ্ঞান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com